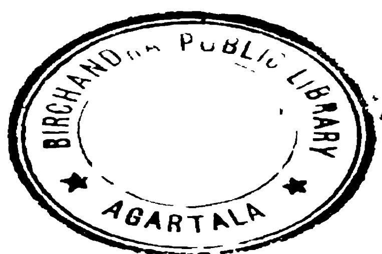
স্মর-গরল-খণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং
দেহি-পদ-পল্লবমুদারম্

যেতে যেতে

বারীন মৈত্র



জয়দীপ প্রকাশনী
৮।১বি, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ :
কার্তিক ১৩৫২

প্রকাশক :
নির্মল কুমার সরকার
৮।১ বি শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

প্রচ্ছদশিল্পী :
সুধাময় দাশগুপ্ত

অঙ্গসজ্জা :
রঘুনাথ গোস্বামী
বারীন মৈত্র

মুদ্রাকর :
শ্রীধনঞ্জয় রায়
মুদ্রণশ্রী প্রেস
১৫।১ ঈশ্বর মিল লেন
কলিকাতা-৬

মূল্য :
সাত টাকা

বাবা ও মাকে

"নড়ে চড়ে হাতের কাছে
খুঁজলে জনম ভোর মেলে না।

হাতের কাছে হয় না খবর
কি দেখতে যাও দিল্লী লাহোর
সিরাজ সাঁই কয় লালন রে তোর
সদাই মনের ভ্রম যায় না ॥"

এ বই-এ ইতিহাসও আছে ভূগোলও আছে যথাযত ; যা নেই তা হচ্ছে এ কাহিনীর চলমান চরিত্র-গুলো। ভ্রমণ করতে গিয়ে যাদের পথের মধ্যে পাওয়া গেছে—তাদের দরকার মত সাজে সাজিয়ে নিতে হয়েছে।

বই-এর ৬৪ পৃষ্ঠার শেষের আগের লাইনটিতে ১৮০০ সালের বদলে ১৭৭৯ সাল পড়তে হবে।

গল্প উপন্যাস হলে বোধ হয় এতটা কৃতজ্ঞতা স্বীকারের কোন প্রয়োজন থাকত না ; কিন্তু এখানে সে কর্তব্য সযত্নে এড়িয়ে গেলে—আর কারও কাছে না হোক, নিজের কাছে কোন কৈফিয়ৎ দিতে পারতাম না। কারণ, এ ভ্রমণ-কাহিনীতে যা আছে—তার বেশিটা অংশই কোন না কোন ভাবে অন্যের সঙ্গে যুক্ত।

প্রথমে ধরা যাক 'মানসী' সম্পাদকের কথা। জানিনা, বন্ধুবর সমর সোম কেন একরকম জোর করেই এর বিষয়গুলি আমার কাছ থেকে মাসে মাসে টান মেরে নিজের কাগজে পত্রস্থ করেছেন ; এবং সেই সূত্রে 'দেশে দেশে মোর ঘর আছে', একে একে গোটা কুড়ি লেখা হয়ে গেল ।

মনে তবুও সংশয় ছিল—গল্প উপন্যাসের বাজারে কি জানি কি লিখে যাচ্ছি! তবু এর মধ্যে আর একটা মন ছিল—ঝুলি ঝোলা, সমেত সে কেবল এখানে ওখানে সেখানে টেনে টেনে নিয়ে যেত আমায়। আবার বেরিয়ে পড়তুম। আবার এক নতুন দেশ। তারই সাক্ষী স্বরূপ আরও কিছু রচনা 'যুগান্তরের' দক্ষিণারঞ্জনবাবু, 'অমৃত' পত্রিকার মণীন্দ্রবাবু, 'দৈনিক বসুমতীর' রবিবাসরীয় বিভাগ পত্রস্থ কবে সে সাহস দুঃসাহসে পরিণত হতে দিলেন।

বই আকারে এরই অন্য নাম 'যেতে যেতে।'

এখানে সেখানে যেতে যেতে সত্যই দেখলাম, 'দেশে দেশে মোর ঘর আছে,' আর 'ঘরে ঘরে আছে পরমাত্মীয়।' সেই সব নতুন ঘর আর পরম আত্মীয়দের কথা কাহিনীব সঙ্গে যুক্ত করেছি।

আজ কৃতজ্ঞতা জানতে হবে এর প্রকাশক অগ্রজপ্রতিম শ্রীনির্মল

কুমার সরকার ও 'পুস্তকের' সন্তোষ ভট্টাচার্য ও সলিল নন্দীকে। প্রকাশ ব্যাপারে এরা যতখানি করলেন, মনে হল গ্রন্থ রচয়িতা হিসেবে আমি অতিরিক্ত সম্মান পাচ্ছি।

এর পর আর এক দল সাহায্যকারী বন্ধুর কথা স্মরণ করি। কতকগুলি আলোকচিত্র ব্যবহার করতে দিয়ে সেই সমীর চট্টোপাধ্যায় অমিয় চক্রবর্তী ও রবীন চক্রবর্তী আমার কৃতজ্ঞতা ভাজন হয়েছেন।

এই সঙ্গে শুধু কৃতজ্ঞতা জানানো নয়, রীতিমত বন্দনা করে যাদের সস্ত্রীক কোন কোন জায়গায় সহযাত্রী হিসেবে পেয়েছি সেই ভূপেন, অমিয়, দেবেন এবং বিশু ও সীমা, রেবেকা, উমা ও দু'নম্বর উমাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

একান্ত কর্তব্যের মত জাতীয় গ্রন্থাগারের কর্মী শ্রীমতী কল্যাণী মৈত্র ও রাইটার্স বিল্ডিং লাইব্রেরীর শ্রীমতী কমলা মিত্রের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি আজ! এঁরা প্রয়োজনীয় গ্রন্থ দিয়ে আমার সাহায্য না করলে এতটা এগিয়ে আসা সহজ হত না।

আমার সহকর্মী শ্রীশুকদেব ভট্টাচার্য, শংকর গুপ্ত, অনিল লাহিড়ী ও নিত্যানন্দ মৈত্র নানা সাহায্যে এবং প্রুফ সংশোধন করে রানা বসু আমায় কৃতজ্ঞ করেছেন।

পরিশেষে শ্রীমতী কৃষ্ণা মৈত্রকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। পাণ্ডুলিপি আদ্যোপান্ত কপি করে ইনি যথেষ্ট সাহায্য করেছেন আমায়।

সাঁত্রাগাছি, হাওড়া

বারীন মৈত্র

দেশের লোকের মনে 'ইতিহাস' সম্বন্ধে একটা নতুন ধারণা ধীরে ধীরে জাগছে মনে হয়। 'ইতিহাস' যে নীরেট নির্বিকার তথ্যের স্তরিত শিলা নয়, একথা ক্রমেই আমরা বুঝতে পারছি। যে বিষয়ের আকর্ষণ প্রত্যেকটি মানুষের কাছে দুর্নিবার হওয়া উচিত, তার বিকর্ষণ কেন এত বাড়লো এবং ক্রমে একটি আতঙ্কে পরিণত হ'ল, তাও ভাববার বিষয়। তার কারণ, রাজশক্তির উত্থান-পতনের যান্ত্রিক ইতিবৃত্তকে আমরা 'ইতিহাস' আখ্যা দিয়েছি, যা প্রকৃত ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গবিশেষ মাত্র। তাকে কঙ্কালও বলা যায় না। দেশের সাধারণ মানুষের বিচিত্র জীবনের বহুমুখী প্রবাহ যদি ইতিহাসের ধারায় প্রতিফলিত না হয়, তাহলে তার সর্বাঙ্গ সৌন্দর্য ক্ষুণ্ণ তো হয়ই, পরিপূর্ণতাও খণ্ডিত হয়। ইতিহাসের এই অখণ্ডতাবোধ আজ শুধু আমাদের দেশে নয়, পৃথিবীর সকল দেশের মানুষের মনে জাগছে। গণতান্ত্রিক চেতনার ক্রমবিস্তারের ফলে সাধারণ মানুষ সম্বন্ধে উপরতলার গতানুগতিক ধারণা যেমন পরিবর্তিত হচ্ছে, মানুষ সম্বন্ধে একটা মূল্যবোধের বিকাশ হচ্ছে, তেমনি মানুষের জীবনযাত্রার ধরন, ধ্যান-ধারণা ও সামাজিক আচরণ ইতিহাসের অপরিহার্য উপাদান হিসেবে স্বীকৃত হচ্ছে। এই নতুন ইতিহাসচেতনাকে এক নবজাগরণের সূচনা বলা যায়। স্বাধীনতা লাভের পর আমাদের দেশেও ইতিহাসের এই নবচেতনা ক্রমেই প্রখর হচ্ছে দেখা যাচ্ছে। বোঝা যায়, জাতির পুনরুজ্জীবন হচ্ছে।

ইতিহাসের এই সমগ্রতাবোধ সম্বন্ধে যাঁরা সজাগ, তাঁরা ইতিহাস রচনায় অভিনব 'আরোহণ-রীতির' পক্ষপাতী, অর্থাৎ সমাজের নিচতলা থেকে ধাপে ধাপে উপরতলা পর্যন্ত অগ্রসর হওয়া উচিত বলে মনে করেন। এই রীতিকেই বলা হয়—"the process of writing

history 'from the bottom up,' through the use of local materials and a local focus."একেই আমরা আরোহণ-রীতি বলছি। এতকালের রীতি ছিল 'অবরোহণ রীতি,' অর্থাৎ উপরতলা থেকে নিচতলার দিকে নেমে আসার রীতি। কিন্তু আসলে শেষ পর্যন্ত নেমে আসা হত না, উপরতলার অতিনাটকীয় ঘটনার প্রতিবেশের মধ্যেই ঐতিহাসিকের অনুসন্ধিৎসা প্রতিনিবৃত্ত হত। জনজীবনেব বিচিত্রগামী স্রোত অন্তঃসলিলার মতো চিরকাল দৃষ্টির অগোচরে প্রবাহিত হয়েছে, মনেব আনন্দে আমরা ঘটনার জমা-খরচ হিসেব কবেছি ইতিহাসের পাতায় এবং মুদির দোকানেব হিসেবের খাতার মতো তা সাধারণ মানুষের কাছে হিজিবিজি আচড়ের তুর্বোধ্য ও অপাঠ্য আলেখ্য বলে মনে হয়েছে।

সাধারণ মানুষের কণ্ঠ যদি ইতিহাসের প্রাণ হয় এবং সেই প্রাণেব স্পন্দন যদি আমরা অনুভব করতে চাই, তাহলে পাঠাগার ও মহাফেজখানাব বদ্ধ কক্ষ থেকে মধ্যে মধ্যে বেরিয়ে এসে বাইরের লোকসমাজেব মুক্ত আলোবাতাসে চলাফেরা করতে হয়। নিছক বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণার দায়ে একাজ করা এবং অন্তবেব স্বাভাবিক অনুবাগ ও আকর্ষণ থেকে লোকসমাজে মেলামেশা করাব মধ্যে পার্থক্য অনেক। মানুষের সঙ্গে মানুষের মতো না মিশতে পারলে তাদের জীবনের অনেক অজ্ঞাত দিকের খবর অজানা থেকে যায়। আমার নিজেব কাজের সামান্য অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি যে যদি মানুষের আস্থা ও ভালবাসা কোন সংস্কৃতিকর্মী সরজমিনে না অর্জন করতে পারেন তাহলে অনেক সম্পদই তাঁকে হাবাতে হয়। বাংলা-দেশের উৎসব বা মেলার কথাই ধরা যাক। বাইবে থেকে ট্যুরিস্টের দৃষ্টি দিয়ে যে-কোন মেলা বা উৎসব দেখা যায়, ইদানীং অনেক দেশী-বিদেশী ট্যুরিস্ট তা দেখতেও যান ও আসেন, কিন্তু প্রত্যেকটি মেলা ও উৎসবের মধ্যে এমন অনেক কিছু তলিয়ে দেখবাব, জানবার ও বুঝবার মতো থাকে যে শতাধিকবার বাইরে থেকে তার রূপ দেখলেও

কিছু বোঝা যায় না। মেলার ভিড়ের মধ্যে মানুষ খুঁজে খুঁজে অনেক গোপন ও অজানা রহস্যের সন্ধান করতে হয় এবং সেই সন্ধান সার্থক হবার কোন সম্ভাবনা থাকে না যদি না সেই সব মানুষের কাছে ঠিক তাদের নিজেদের মনের মানুষটি হওয়া যায়। তা হতে পারা যে কত কঠিন, বিশেষ করে মানুষের নানারকমের চরিত্রের কথা মনে করলে, তা অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রই জানেন।

এই গ্রন্থের লেখক শ্রীবারীন মৈত্রকে আমি চিনি ও জানি। প্রথমে তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয় চিঠিতে ও টেলিফোনে। সকাল নেই, দুপুর নেই, রাতবেরাত নেই, টেলিফোন আসে 'ওমুক মেলাতে যাব, উৎসব দেখব ওমুক গ্রামে,' তার নানরকমেব আলাপ পরামর্শ। আমার খুব ভাল লাগত যে আমি যখন বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে, বছর দশ-বারো আগে ঘুরে বেড়িয়েছি, তখনও বেশ কয়েকজন উৎসাহী তরুণকে আমার পরিদর্শনের সঙ্গী হিসেবে পেয়েছি। গ্রামের সাধারণ মানুষের মধ্যে যে গভীর উৎসাহ ও জানবার আগ্রহ দেখেছি তা বাস্তবিকই স্বচক্ষে না দেখলে বুঝিয়ে বলা যায় না। শ্রীমৈত্রের মতো আরও কয়েকজন উৎসাহী কর্মীর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে, এবং আজকে বাংলাদেশের ইতিহাসকে এইভাবে দেখবার ও জানবার যে নতুন আগ্রহ জেগেছে তা পথিকৃৎদের কাছে আনন্দের ও গৌরবের কথা। দেশের দিক থেকেও এটা যে জাতীয় শুভলক্ষণ তা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

শ্রীমৈত্র বাংলাদেশের কয়েকটি উৎসব ও মেলা পরিদর্শনের কাহিনী বর্ণনা করেছেন এবং তা সঙ্গে কয়েকটি স্থানের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের বিবরণও দিয়েছেন। গঙ্গাসাগর মেলা, দক্ষিণবঙ্গের দক্ষিণ রায়, মহিষাদল ও তমলুক, ঝাড়গ্রাম, বিষ্ণুপুব, কামারপুকুর, আমতার মেলাই চণ্ডী উৎসব, বাঁকুড়া বেলেতোড়ের ধর্মঠাকুরের উৎসব, বীরভূমের বক্রেশ্বর ও জয়দেব কেঁদুলির মেলা, চণ্ডীদাস-নান্নুর ইত্যাদি বিষয় লেখক প্রত্যক্ষ সন্ধানীর দৃষ্টি দিয়ে আলোচনা করেছেন।

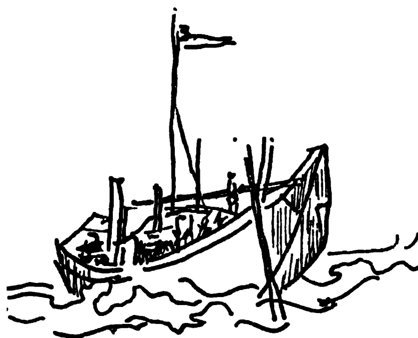
আলোচনার মধ্যে তিনি সংস্কৃতিবিজ্ঞানের অথবা লৌকিক ইতিহাসের অন্তঃস্থল পর্যন্ত প্রবেশ করতে চাননি। কোন ঐতিহাসিক বিষয়ের পণ্ডিতী ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণেও তাঁর বিমুখতা লক্ষ্য করা যায়। মনে হয় এটা ইচ্ছাকৃত। লেখকের উদ্দেশ্য ভিন্ন। তিনি বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনের কয়েকটি বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্যের প্রতি সাধারণ মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চান। তাঁর পরিবেশনের ভঙ্গি হল গল্পকারের ভঙ্গি। এই ভঙ্গি থেকেই বোঝা যায়, গল্পের ভিতর দিয়ে নিঃশব্দে পাঠক-চিত্তকে তিনি বাংলার জনকৃতির যাদুপুরীতে নিয়ে যেতে চান এবং সেখানকার বিরাট রহস্যের আভাস দিয়ে বলতে চান, 'যদি রহস্যের গভীরে প্রবেশ করতে চাও তাহলে নিজের চোখে ঘুরে ঘুরে দেশকে ও মানুষকে ছাখো।' অবশ্য নিছক গল্পাকারে এই সমস্ত বিষয় বুঝিয়ে বলার একটা দায়িত্বও আছে। হৃদয়গ্রাহী রচনার প্রকাশভঙ্গি যে গল্পানুগামী হবে, এমন কোন কথা নেই। তাই বলে আমি শ্রীমৈত্রের লিখনভঙ্গি অসঙ্গত বলছি না, আমি শুধু আমার নিজের সন্দেহটুকু প্রকাশ করছি। বাংলাদেশের সাধারণ লোক যদি এই ধরনের গল্পের ভিতর দিয়ে বাংলার জনজীবনের সাংস্কৃতিক মাধুর্যের কথা কিছু জানতে পারে, এবং আরও বেশি করে জানবার জন্য কৌতূহলী হয়, তাহলে নিশ্চয়ই এর সার্থকতা আছে স্বীকার করতে হবে।

বাংলাদেশে খাঁটি বৈদিক উৎসব নেই বললেই হয়, প্রচলিত উৎসবের মধ্যে পৌরাণিক ও তান্ত্রিক উৎসবেরই প্রাধান্য দেখা যায়। এগুলিকে মোটামুটি বৈষ্ণব শৈব ও শাক্ত এই তিনভাগে ভাগ করা যেতে পারে। বিষ্ণু ও কৃষ্ণ এবং তাঁদের শক্তি লক্ষ্মী সরস্বতী ও রাধাকে অবলম্বন করে যে-সব উৎসব সেগুলি 'বৈষ্ণব' বলা যায়। শৈব উৎসবের মধ্যে শিবরাত্রি শ্রেষ্ঠ এবং সাধারণের সবচেয়ে জনপ্রিয় 'চড়কের গাজন'। শাক্ত উৎসবের সংখ্যা সর্বাধিক, কারণ বাংলাদেশ শাক্তপ্রধান দেশ। এছাড়া নানারকমের লৌকিক দেবদেবীর উৎসব

তো আছেই। 'যেতে যেতে' বইতে লেখক বিশেষ স্থানকেন্দ্রিক কয়েকটি মাত্র উৎসবের বর্ণনা করেছেন। যদি 'যেতে যেতে' তিনি না থেমে যান, যদি চলার ও ঘোরার নেশা তাঁর স্তিমিত হয়ে না আসে, তাহলে আশা করব বাংলাদেশের উৎসবগুলিকে তিনি ভাল করে দেখবেন এবং এর পরে উৎসবের উৎস সন্ধানে আবার নতুন করে চলতে আরম্ভ করবেন। বিশেষ করে যখন তাঁর চোখ ও মন দুই-ই আছে, তখন চলার কষ্টটুকু তিনি সানন্দে বহন করবেন আশা করি।

বিনয় ঘোষ

'সরসিজ'
৪৭।৪ যাদবপুর সেণ্ট্রাল রোড
কলিকাতা-৩২



এক

কোথায় পাব তারে
আমার মনের মানুষ যে রে।

ডাক হরকরা গগনের মত কথাগুলো আমারও মনে হয়; মনের মানুষটি তবু মনের মধ্যে স্পষ্ট হয়ে ধরা দিলনা আজও! 'হারায়ে সেই মানুষে, তার উদ্দেশে দেশ বিদেশে বেড়াই ঘুরে।' ঘোরাও শেষ হল না—খোঁজারও না। পড়শীদের ঘরের আশেপাশে, বারোয়ারী তলার ধার দিয়ে নোনাপুকুর পেরিয়ে গেলেই অন্ধকার বাঁশবন। তার স্যাঁতসেঁতে অন্ধকার তল দিয়ে কোথায় না কোথায় চলে যেতুম আমি! বাড়ীর সামনে চৌধুরীদের জলা। শ্রাবণ-ভাদ্দরে তার ওপর একগলা জল! পূর্ণিমা রাতে চাঁদ তার ওপর দিয়ে ভেসে বেড়ায়। ভেসে বেড়ায় বুড়ো রতন জেলের ছোট্ট ডিঙ্গিখানা শরবনের মধ্যে দিয়ে। বার তিনেক পাক মেরে ফিবে এসে মাচার আস্তানায় বসে বুড়ো ভুড়ুক ভুড়ুক তামাক খেতে খেতে বলত: কি জানি কি বলত! হয়তো মাছ-চোরের বাস্তব গল্পই করত। কিন্তু আজ মনে হচ্ছে—সে সব রূপকথা। সে সব রূপকথা হয়ে বুকের মধ্যে বেঁচে আছে।

রূপকথা না স্বপ্ন? গগনের স্বপ্নের মনের মানুষের মতন এ-ও বোধহয় স্বপ্ন। নইলে কোনদিন না কোনদিন তো কোথাও থামত মনটা! থেমে বলত, পেয়েছি! আমার মনের মানুষটিকে পেয়েছি।

এমনি এক মানসিক চাঞ্চল্যের নিবৃত্তি হয়েছিল সেদিন কলকাতা

ময়দানের মনুমেণ্টের পাশে জানুয়ারীর এক নির্জন সকালে! নিষ্পত্র জিউলী গাছটার ডালে একটা জবুথবু কাক দার্শনিকের মত প্রাজ্ঞ দৃষ্টিতে দেখতে দেখতে ভাবছিল, নীচে উঁচু হোয়ে বসা লোকটার এক হাতে চায়ের ভাঁড়—অন্য হাতে তিন নয়ার নোনতা বিস্কুটখানা সে ছোঁ মারতে পারবে কিনা! ভাবছিল, আর ভাবনা শেষ হবার আগেই সে দেখল, বিস্কুটখানা ক্রমশই মুখের মধ্যে অদৃশ্য কোরে দিয়ে এক চুমুকে ভাঁড়ের চা নিঃশেষ কোরে লোকটা একখানা অতি লজঝড়ে খড়কাটা মেশিনের মতন চোয়াল নাচাতে নাচাতে উঠে দাঁড়াচ্ছে! কাকটা তখন আরও চিন্তাশীলের মতন তাকাল তার দিকে! লোকটা সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করল না। গলার কম্ফাটারটা মাথার ওপর দিয়ে জুৎসই কোরে পেঁচিয়ে নেবার জন্যে সে নিজের গায়েই হাতের মোটা বেতের লাঠিটাকে ঠেসিয়ে রাখল! কম্ফাটারটা জড়াতে, লোকটার শনের মতন উড়ন্ত সাদা চুল—আব তামাটে মুখখানার ওপর আকামানো সাদা দাড়ি ঢাকা পড়ে গেল; তখন মোটা মোটা কাচের তলে সজীব দুটো চোখ নাচাতে নাচাতে লোকটা মাটি থেকে শতরঞ্চি-মোড়া বিছানার বাণ্ডিলটা বাঁ বগলে তুলে ডান হাতের বেতের লাঠি নাচাতে নাচাতে এগিয়ে এলো বাসটার দিকে।

রিজার্ভ করা বাস দুটো তখনও ছাড়ার অপেক্ষায়। ছাদের ওপর বোঝাই হোয়ে উঠছে পর্বতপ্রমাণ বাক্সপ্যাঁটরার বোঝা। লোকটা সদর্পে বাসে উঠে বসল জানলার কাছে একটা সীট দখল করে! আড়চোখে তাকিয়ে দেখি মুখের বিস্কুটকে তখনও সজোরে চর্বণ কোরে চলেছে! বিস্ময় লাগছিল; সঙ্গে সঙ্গে আনন্দও! বিস্ময়, কারণ আমার ধারণা ছিলনা বাসের কণ্ডাক্‌টেড্‌ ট্যুরে তাঁর মতন বৃদ্ধকে সহযাত্রী পাব; আনন্দ হচ্ছিল, লোকটার এনার্জির কথা ভেবে।

আমার চোখে চোখ পড়তেই প্রশ্ন হল, 'কি, সব রেডি তো?'

বুঝলুম তিনি যাত্রার প্রস্তুতির কথাই বলছেন। বললুম, 'মনে তো হচ্ছে। আপনিও যাচ্ছেন নাকি?'

টুরিষ্ট এসোসিয়েশনের বিমল সেন এবার ওদিক থেকে বলে উঠল, 'কে, ষষ্ঠীদার কথা বলছেন? ষষ্ঠীদা না থাকলে বাস যাবে কিনা তাই জিজ্ঞেস করুন।'

ষষ্ঠীদা ওরফে ষষ্ঠীপদ বন্দোপাধ্যায় তার অপরিষ্কৃত কদম ফুল মুখখানায় সামান্য একটু হাসির আভাষ ফুটিয়ে তুললেন। আমি আকাশ থেকে পড়লুম 'বলেন কি?' শুনেছি এই টুরিষ্ট এসোসিয়েশনের পাকা শিকারীরা ক্যালেণ্ডারে লাল কালির দাগ দেখেই বোহেমিয়ন ট্যুরিজ্‌ম্‌-এর ব্যবস্থা করেন আফিস ছুটির অবকাশে ; আগে থেকে বন্দোবস্ত থাকে পাকা হোয়ে ; আর পঞ্চাশ পঁচাত্তর বা শ'খানেক লোক লোটা কম্বল সম্বল কোরে একসঙ্গে এসে জোটে ! অতঃপর এসোসিয়েশনের লাল শালুর কাপড়ের উপর নাম ধামের বিবরণী উড়িয়ে বেরিয়ে পড়ে বাস। ধকল আছে বেশ। ভেবে পেলুম না এই ধকল সয়ে ষষ্ঠীপদবাবুদের মতন যষ্টিধারীরা যাত্রা-সহচর হন কি উপায়ে! এর পরে বক্তব্য আরও স্পষ্ট কোঁরে ষষ্ঠীপদবাবু বললেন, 'অমরনাথ, পশুপতিনাথ, কামরূপ-কামাখ্যা, ওদিকে ওখা পোর্ট আর এদিকে কন্যাকুমারিকা অবধি হোয়ে গেছে।' আবার সেই লেডিকেনি রংএর মুখখানি স্মিত হাস্যে ভরিয়ে বক্তব্য শেষ হল। এই প্রাতঃকালে প্রাতঃপ্রণাম করবার উপযুক্ত আদমিই বটে। বললুম, 'চলুন গল্প করতে করতে যাওয়া যাবে।

কোনদিকে কোন আসন খালি নেই। মাঝখানে মেঝেতে পুরু খড় বিছিয়ে তার উপর শতরঞ্জি পেতে ঢালাও বিছানা। জুতা-জোড়াটিকে পূর্ণ মর্যাদায় তুলে এনে নিজের পাশে গুছিয়ে রেখে সীট ছেড়ে মেঝেতেই বসলেন ষষ্ঠীদা! পা মেলে আরামের নিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'আসুন, আপনি নতুন লোক। আপনার ব্যবস্থাটা পাকা কোরে দিই আগে।'

একপাশে গিয়ে বসলুম ষষ্ঠীপদবাবুর কাছে।

১৯৩৩ সালের বিলিতি ক্যালেণ্ডারে প্রথম দিন।

নিস্তব্ধ ছবিতে আঁকা মনুমেণ্টের কাছে নিষ্পত্র জিউলী গাছটা আজও নিশ্চয়ই আছে। সেদিনকার বেলা সাতটার কাকটা ওর ডালে বসে বসে দার্শনিকের দৃষ্টিতে আমাদের মত বিপথগামী কাউকে আজও শিবাস্তে সন্তু পন্থানঃ বলে আশীর্বাদ করে কিনা জানিনা—কিন্তু আজ কেবলই মনে হয় ওই বায়স-কুল-তিলক যেন আমাদের জীবনের নিরাপত্তাহীনতারই এক মূর্ত প্রতীক!

'তত্ত্ব কথা যতই থাক না কেন প্রিয়-বিচ্ছেদকাতর মানুষের চোখের জলের কারণ হিসেবে,—আমাদের জীবনে বিদায়লগ্ন যে দুঃসহ দুঃখ-ভার বহে আনে, তার কারণ বোধহয় আমাদের জীবনের নিরাপত্তা-হীনতা। না ঘরে না বাইরে কোথাও নিরাপত্তা নেই আমাদের দেশের মানুষের। আমাদের মূল্য পরিমাপ হয়, আর্থিক অবস্থার মাপকাঠিতে। এ দেশে মানুষের চিরবিচ্ছেদ সর্বাগ্রে আনে নির্ভরশীল উত্তরপুরুষের মনে আর্থিক অসহায়তা। এখানে স্বামীর অকস্মাৎ মৃত্যুতে হতবাক সদ্যবিধবাকে প্রতিবেশীর হাত ধরে অন্নদাতার স্মরণাপন্ন হতে হয় আগামীকালের অন্নসংগ্রহের তদ্বিরে।

তাই বলছি, বিদায়যাত্রা, আমাদের শ্মশানযাত্রার সমার্থক! কারণ ওই একই; নিরাপত্তাহীনতা! এর সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে যুক্ত হয় মায়া আর মোহ! অতএব আঙ্কিক নিয়মে এর পরিমাণ হয় দ্বিগুণ।

সেদিন বাস যাত্রা সুরু করল গঙ্গাসাগরের উদ্দেশে। আগে এই গঙ্গা-যাত্রাই ছিল বিয়োগব্যথা জর্জর। তখন এ তীর্থ পরিক্রমা করে যাত্রী কদাচিৎ ঘরে ফিরতেন। আজ আমরা কালের বিধানে মহানন্দে এতগুলো লোক পাড়ি দিচ্ছি ১লা জানুয়ারীর ছুটি কাটাতে। ভাবতেও রোমাঞ্চ হয়। হঠাৎ চলন্ত বাসের মধ্যে কে একজন সোল্লাসে চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, 'কপিল মুনি-কী—' বাস শুদ্ধ লোক সমস্বরে বলল, 'জ-য়।'

তবু আমি ভাবছি, সেই আদি অকৃত্রিম ভুষণ্ডির কাকটার কথা। সে বসে বসে এতক্ষণ ওই সব কথাই ভাবছে বোধহয় !—বলছে, 'তার বসত কোথায় না জেনে তায় গগন কেঁদে মরে।'

একটা প্রচণ্ড ঝাঁকানি দিয়ে উত্তরপাড়ার বাস মোড় ফিরে চিন্তাস্রোত ঘুলিয়ে দিল আমার।

কলকাতা থেকে ডায়মণ্ডহারবার রোড ধরে ডায়মণ্ডহারবার। সেখান থেকে কাকদ্বীপ পেরিয়ে বাস পৌঁছল নামখানা! সব শুদ্ধ প্রায় ষাট মাইলের মতন রাস্তা ; সোজা কালো অজগরের মতন রাস্তা যে কোন ড্রাইভারকে এক্সিলারেটরে চাপ দিতে প্রলুব্ধ করবে। তবু নামখানার স্কুলে দ্বিপ্রাহরিক আহারে বসতেই দুটো বেজে গেল। ষষ্ঠীপদবাবু এসোসিয়েশনের বহুল পরিচিত এবং বয়োজ্যেষ্ঠ। অতএব নতুন যাত্রী হিসেবে আমার তদারকীর ভার স্বহস্তে নিজের কাঁধে চাপিয়ে নিলেন ষষ্ঠীপদবাবু। কে কার বারণ শোনে। আটাত্তর বছরের যুবক দন্তহীন মুখগহ্বর বিকশিত করতঃ হাসতে হাসতে আমার সঙ্গ আকড়ে রইলেন অনুক্ষণ।

প্রোগ্রাম ছিল পড়ন্ত বেলায় নামখানা ঘাট থেকে স্টীমার নিয়ে যাওয়া হবে ফ্রেজারগঞ্জ। ঘাটে এসে প্রোগ্রাম দেখি বেমালুম পাল্টে গেল! যাত্রীরা অকস্মাৎ পূণ্যকামী হোয়ে সত্যাগ্রহ করবেন ঠিক করলেন। ফ্রেজারগঞ্জ নয়—যাবেন সাগরদ্বীপ। রবীন্দ্রনাথের মৈত্র মহাশয়দের কাছে যাই-হোক আমার কাছে ও দুটোর সমান মর্যাদা। সেদিন তীর্থস্থানের দিনও নয় এবং সন্ধ্যাও সমাগত। শেষ পর্য্যন্ত তবু সাগরদ্বীপের পথেই স্টীমার চলল।—জয় বাবা কপিলমুনি। আবার সমস্বরে সকলে বলল, 'জয়—।'

দু'খানা স্টীমার নামখানার ফেরীঘাট ছাড়ল প্রায় শ'খানেক যাত্রী নিয়ে। এসোসিয়েশনের ব্যাটারী মাইকে হঠাৎ বেজে উঠল, 'আমাদের যাত্রা হোল সুরু এখন ওগো কর্ণধার।'...কিন্তু কর্ণধারকে

নমস্কার করবো কি, ছাদের উপর দাঁড়িয়ে উঠতেই ভাড়াটে কর্ণধার-মশাই বেরসিকের মতন বেঁকে বসলো। ষ্টিয়ারিং হুইল ধরে সামনের পথটা নাকি তার দেখা চাই ; অতএব জড়ো সড়ো হোয়ে ষষ্ঠীপদবাবুর কোলের নাতিটির মত তার পাশে বসে পড়লুম।

ওঠার সময় দেখা গিয়েছিল স্টীমারে কয়েকজন মহিলা যাত্রীও আছেন। গ্যাংওয়ের লম্বা মই-এর মতন সিঁড়িটায় সার্কাসের সার্কাস-গার্লদের তারের উপর দিয়ে হাঁটার ব্যালান্সের কসরৎ দেখাতে দেখাতে মহিলারা স্টীমারের খোলের মধ্যে একে একে ঢুকে পড়লেন ! শোনা গেল, এসোসিয়েশনের কোন পদমর্যাদাধারী সদস্যের পরিবার বর্গ এঁরা। অতএব গোটা একটা বাঙালী পরিবার। মানে, বৃদ্ধা মাতা, বাতে পঙ্গু মাসী, উদারউদরা সহধর্মিনী থেকে আলট্রা মডার্ণ পুত্রবধু মায় এনামেল-মুখ-অনূঢ়া কন্যা সমভিব্যহারে তাঁদের সাগরদ্বীপ যাত্রা, ব্র্যাকেটে প্রমোদভ্রমণ। শুনেছি সাপিনী নাকি খোলস ত্যাগ করলে খানিক নিস্তেজ হয়ে পড়ে। এবার বিশ্বাস হল কথাটা সত্যি ! তেজ যতটুকু আছে ওই শেষোক্ত অবলা তুটির, তা কেবলমাত্র অঙ্গে অঙ্গে ওদের স্বরচিত খোলসের অলঙ্কারের জন্যেই ; নইলে—

নইলে আমরা সত্যিই যে অথৈ জলে পড়তাম সেটা খানিক পরেই বোঝা গেল।

চার-চত্বরে আকাশ তখন ম্লান হয়ে আসছে আসন্ন সন্ধ্যায়। যতদূর দেখা যায় দূরবিস্তৃত উদার গাঙ্গেয় জলধারা। জল আর জল-কল্লোল ; হালকা উত্তুরে বাতাসে ঝড়ের পূর্বাভাষ। এক অজানা অচেনা জগতের আদিমতম পটভূমিকা পেছনে। আচ্ছন্ন রয়েছে কোটি জীবনের প্রাণস্পন্দনের মত অফুরান জীবন্ত জলকল্লোল। বাঁয়ে চিতিয়ে ওঠা বিরাট একটা ভূখণ্ড। সেখানে যুগসঞ্চিত অন্ধকারের অরণ্য কুহেলিতে হরিণের চির রাজত্ব। জন নেই ; জীবন দেখা যায় না। নীল-সিন্ধুজল-ধৌত-চরণতল-বাংলার প্রত্যন্ত সীমার একটা ক্ষুদ্রতম অংশভাগ।

বাংলা দেশের দক্ষিণাংশ জুড়ে জালের মত পাতা রয়েছে নিবিড় অরণ্য অঞ্চল। জল আর জঙ্গল; পূর্বাংশ জুড়ে আদিম হিংস্রতায় বিচরণ করছে জলে কুমীর আর ডাঙ্গায় বাঘ। আর পূর্ব ঘিরে আছে পাকিস্থানের হিংস্র প্রাচীর—বাঙ্গালীর ছেলের শৈশব স্মৃতিতে ভূগোলের অপরিবর্তনীয় ছবিটি। কিন্তু এখানে ঘোরা-ফেরা করলে সদাজাগ্রত মনের ওপর জীবন্ত জলের যে উচ্ছ্বাস শোনা যায়—সুন্দরবন যাদের অদেখা তাদের বোধহয় সেকথা বোঝান যাবেনা! মাটির সঙ্গে, প্রাণের সঙ্গে, গাছের সঙ্গে আর অগাধ জলরাশির হৃদস্পন্দনের জোয়ারে ভাঁটায়, বর্ষার ঘনশ্যাম আকাশের মিলন যে না দেখেছে, তাকে কল্পনা কোরে নিতে হবে সে রূপ! কিন্তু যাক সে কথা।

তখন কারও মুখে কোন কথা নাই! স্টীমার চলেছে। সামনে দুজন সারেঙ দাঁড়িয়ে লগি দিয়ে জল মাপছে ড্রাইভারের নির্দেশ মত! চারদিকে ধূসর গঙ্গাভূমি। তবু ভাঁটায় কোথাও কোথাও জল এত অগভীর যে স্টীমারের পথ বন্ধ! কখনও ডাইনে কখনও বামে বাঁক নিয়ে দুচার কদম এগোতে পেছোতে স্টীমার একবার চমকে থেমে গেল! ইঞ্জিনের ধ্বকধ্বকানি থামিয়ে একেবারে নিঃশব্দ হয়ে গেল জলযানটা! সকলে সমস্বরে চিৎকার কোরে উঠল, 'থামালে কেন, থামালে কেন'। কর্ণধার নিরুদ্বেগে ঘোষণা করল,—জোয়ার এলে ছাড়বে'!

এ জলের চরিত্র যাদের জানা নেই, তারা কথাটা শুনে প্রমাদ গণল। কিন্তু স্টীমার তখন সকলের বেদনাকে নস্যাৎ করে দিয়ে বালিতে থেবড়ে বসেছে, ওদিকে চোখের সামনে জোর কদমে নেমে যাচ্ছে সূর্য। তারপরেই অতি নাটক। জানা নেই শোনা নেই পাশের ভদ্রলোকের গ্লাডস্টোন-ব্যাগ ফুঁড়ে গান বেরিয়ে এল। একবারে হিন্দী ফিলমের রোমাঞ্চকর পরিবেশ। প্রসঙ্গ বটে; বেতারকিন্নরী সান্ধ্যকালীন ভাওয়াইয়া ধরেছেন। গানের কথায় আমাদের কর্ণধারের

জবানীতে বললেই পারত, 'মনরে আমি আর বাইতে পারলাম না।' তা না বলে, বলছে 'এই দেহতরী কি দিয়ে বানালে গুরুধন।' তবুও লোকগীতির বিস্তার অংশ পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে এমন মিলে গেছে পরে আবিষ্কার করলাম আমি কেন অনেকেই বেশ মৌন হয়ে শুনছে তা। কলকাতার দুশ্চিন্তার বিচিত্র কোলাহলের মধ্যে মানুষ গান শুনবে কি, প্রাণ পাখী খাঁচা ছাড়া হবার উপক্রম ; এখানে তো এমন হবেই। প্রথম গানটি শেষ হতেই ষষ্ঠীপদবাবু মোলায়েম সুরে বললেন, 'ভায়া হে বড় ভাল গাইলে।'

তাব দিকে চেয়ে বললুম, 'শেষ হয়নি, শুনুন!'

মেয়েটি আবার গান ধরলো, 'এবার হরি হরি বলে সবে বন্ধু মিলে জাহ্নবীর কূলে চলে যাই।'

কে একজন বলে উঠল, 'হরি বল মন।'

সবাই সমস্বরে হরিবোল দিয়ে উঠল।

ঘড়িতে তখন পাঁচটা বেজে দশ। প্রচণ্ড বেগে ঘুরতে ঘুরতে থ্যাবড়া সূর্যটা জলের মধ্যে টুপ করে মুহূর্তের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল একেবারে··।

নিস্তব্ধ সকলে। স্টীমারের ডিজেল ইঞ্জিন নিশ্চুপ। ষষ্ঠীপদবাবু হঠাং কানের কাছে মুখ এনে বললেন, 'এবার কি হবে জানো ভায়া, ওই যে সূর্য্যটা জলে ডুবল এবার আর্কিমিডিসের থিয়োরী অনুযায়ী জল ফেঁপে উঠবে আর আমাদের স্টীমারটা চলতে শুরু করবে আবাব।'

স্টীমার শুদ্ধু সকলে চেঁচিয়ে উঠল, 'জয় বাবা কপিলমুনি কি—' অনেকগুলো লোক ধুয়ো ধরে বলল, 'জয়।'

অনেকক্ষণ সময় কেটে গেল। জলমাপা সারেঙ একসময় লগি তুলে চাটগেঁয়ে উচ্চারণে কি একটা বলল। মিনিট দুই পরে ডিজেল ইঞ্জিন আবার গর্জন করে উঠতেই যাত্রীরা সমস্বরে চিৎকার জুড়ে দিল। দাদুব মুখে হাসি, 'দেখলে তো আমার কথাটা সত্যি কিনা?'

এমনি অনিয়মিত ও অনিয়ন্ত্রিত চিন্তাকল্লোলে মাথার মধ্যে যখন তোলপাড় হচ্ছে সেই মুহূর্ত্তে অতি বাস্তব ষষ্ঠীপদবাবু সহস্তে মাটির ভাড়ে ধূমায়িত চা এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'ভায়া ধরো।'

ধরবো কি।

ভেবেই পাইনি এই দিশাহারা জলযানে ধূমায়িত চা এলো কোথা থেকে। সশব্দে চায়ে চুমুক দিয়ে দাদু বললেন, 'বুঝলে, গঙ্গাসাগরটা এখানেই সেরে ফেল। ইচ্ছে ছিল সাগরের জল মাথায় দিয়ে আহ্নিক করবো।' এবার প্যাকেটে মোড়া 'ফেরাজিনির' কেক পরিবেশিত হল। বোঝা গেল দাদু এতক্ষণ কোন কথা বলেন নি কেন। খেয়াল করিনি, কোনসময় উঠে গিয়ে কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে চায়ের ব্যবস্থা করে এসেছেন। আফিমখোর মানুষ। সাগরের শীতের সন্ধ্যা সব ঠাণ্ডা কোরে দিয়েছিল। এবার প্রফুল্ল চিত্তে অহিফেন বটিকা উষ্ণ চা সহযোগে গলধঃকরণ করে বললেন, 'ভায়া হে, প্রাণ এতক্ষণ আই-ঢাই করছিল। তা' গঙ্গাসাগর আর কতদূর?'

দূর অস্ত।....

স্টীমার অবশ্য চলেছে। দূরে অন্ধকার আকাশের পটে সাগরদ্বীপের আবছায়া চেহারাটা চোখে পড়ছে। দু একটা ছাড়া ছাড়া আলো, চলন্ত মানুষের অস্তিত্ব বোঝা যাচ্ছে; ম্লান কণ্ঠস্বরও কানে আসছে। কিন্তু স্টীমার এগিয়ে পেছিয়ে, হেলে দুলে, ডাইনে বাঁয়ে মোড় ফিরে কোনরকমেই এগিয়ে যাবার রাস্তা পাচ্ছে না।...

মহিলা যাত্রীরা প্রমাদ গণলেন।

এ দেশের রীতি অনুযায়ী প্রত্যেক হিন্দু ললনার সুবিধামত ধর্মপ্রাণা হবার নিয়ম আছে। গঙ্গাসাগরে এসে স্নান পূর্ণ হলনা দেখে প্রিমিটিভ্ মানুষের মত তারা ধরে নিলেন তাঁদের আয়ু অন্তত বছর দশেক কমে গেল কপিলমুনির কোপদৃষ্টিতে। কিন্তু বিংশশতাব্দীর দেবতার এমনি আকর্ষণ—কেউ প্রাণের মায়া ত্যাগ করে সাগর

ডিঙ্গিয়ে দ্বীপে উঠতে রাজী হলেন না। যে যতটা পারলেন অন্ধকারের মধ্যে নির্নিমেষে সাগরদ্বীপকে সশ্রদ্ধ নমস্কার জানালেন। সব তীর্থ বার বার গঙ্গাসাগর একবার।

ইতিমধ্যে দেখি স্টীমারের ওপর কুটুরী থেকে কে বা কারা একটি ফ্লাস্কের গলায় দড়ি জড়িয়ে গঙ্গোদক সংগ্রহের কাজে ব্যস্ত। আহা পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গে।

দাদু চোখ বুঁজে বললেন : 'বুঝলে ভায়া সব তীর্থ বার বার কিন্তু গঙ্গাসাগর একবার ; আবহমানকাল ধরে লোকে এই কথা বলে আসছে। কথা কি জানো, পূর্বকালে এখানে এলে বড় একটা কেউ ফিরত না, বার বার যাওয়া তো দূরের কথা। সব তীর্থই অবশ্য বিপদ-সংকুল ছিল ; কিন্তু গঙ্গাসাগরের বিপদ আরও কিছু বেশি। কপালকুণ্ডলার নবকুমারের কথাই ধরো না কেন।'

'—প্রায় সার্দ্ধদ্বিশত বৎসর পূর্বে গঙ্গাসাগর হইতে একখানি যাত্রী বোঝাই নৌকা ফিরিতেছিল।'—অতদিন আগেই লোকে গঙ্গাসাগর আসত!

দাদু জুত কোরে বসলেন ভাল কোরে মাথা মুখ ঢেকে। তারপর সুরু করলেন, 'দুশো আড়াইশো বছর কিরে বাবু—মহাভারতের বনপর্বেই তো গঙ্গাসাগরের নামডাক রয়েছে।'

আরও কেউ কেউ বোধহয় শুনছিল ; তারা একবাক্যে বিস্ময় মানল, 'বলেন কি ?' কে একজন অন্ধকার থেকে বলে উঠল, 'দাদু অহিফেন প্রসাদাৎ নয় তো ?'

চক্ষু উন্মীলন না করেই দাদু কৃত্রিম কুপিত হোয়ে বললেন, 'প্রসন্ন বেশি ঘাটাসনি—নেশা কেটে যাবে। খানিক নির্বাক থেকে পুনরপি আরম্ভ করলেন, 'ভারতবর্ষের স্বর্ণযুগ গুপ্তযুগেরও আগে ইতিহাসে গঙ্গাসাগরের নাম পাওয়া যায়। অনেক দিনের বনেদীয়ানা রে প্রসন্ন। গ্রীসের ভৌগলিক ক্লডিয়াস টলেমির নাম শুনেছিস ? তার লেখায় দেখবি গঙ্গার মুখের সমস্ত অঞ্চল জুড়ে একটা জাতির বাস ছিল সে

সময়—তাদের নাম 'গঙ্গারিডি'। আর তাদের রাজধানীর নাম 'গাঙ্গী'। রাজধানীর যে অক্ষাংশ দ্রাঘিমাংশের নির্দেশ তিনি দিয়েছেন তাতে তার ভৌগলিক অবস্থান সম্বন্ধে ধারণা করা যায় যে এই গঙ্গাসাগরই সেই গঙ্গাসাগর ছিল। সেখানে লোকবসতি ছিল। এই টলেমি কবেকার লোক জানিস ? টু সেঞ্চুরী বি. সি. ।....'

এতক্ষণে বোঝা গেল দাতুর কথাগুলি কেবল অহিফেন প্রসূত নয়। এর মধ্যে সত্যই ঐতিহাসিকতা আছে। পণ্ডিতদের মতে আদি মহাভারতের রচনাকাল খ্রীষ্টপূর্ব ১৪০০ অব্দ ; অতএব তার মধ্যে সগর রাজার যে উপাখ্যানটুকু পাঠক জানেন,—তার কাল অবশ্যই আরও প্রাচীন। এই শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ভারতবর্ষের একপ্রান্তে অবস্থিত এই গঙ্গাসাগর তীর্থ জনমানসের একটা জীবন্ত রূপ নিয়ে অস্তিত্ব রক্ষা করে আসছে। পশ্চিমবাংলার অন্তর্গত এই সর্বতীর্থ-সার, সারা ভারতের মানুষকে দীর্ঘ অতীত হতে আকর্ষণ করে আসছে। তীর্থের কষ্ট আছে দুঃখ আছে। আছে জীবন সংশয়ের আশংকা। তবু কি একটা অপার্থিব আকর্ষণ হাজার হাজার বছর ধরে মানুষকে টানছে! এর মধ্যে চিরকালীন ভারতীয় চিন্তাধারা ও ঐতিহ্যের রূপ চোখে পড়ে। আধ্যাত্ম চিন্তা এদের ধমনীতে এমনভাবে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রবাহিত—যে কোনকালের কোন কৃচ্ছ্রসাধনের দুঃখ ভারতের মানুষকে পেছিয়ে দিতে পারেনি। তীর্থে মানুষ বিভেদ ভুলে আসে, ভৌগলিক অবস্থানের কথা স্মরণে রাখে না—রাজনীতির হীনতা থেকে অনেক দূরে থেকে যায়।

দীর্ঘ পথের গ্লানি, দিনযাপনের কষ্ট—এর পরে গঙ্গাসাগরে উপনীত হয়ে তীর্থযাত্রী কি দেখে ? আমি দেখে গেছি সেবার। দেখেছি, অতি দীনহীন মন্দিরের বারান্দায় সগর রাজার বংশাবতংস রাজা ভগীরথকে কোলে নিয়ে মা-গঙ্গার পাষাণ মূর্তি। দেখে, অতি জঘন্য ভাস্কর্যে খোদিত মহামুনি কপিল ও সগর রাজার শিলামূর্তি। নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর প্রাকৃতিক পরিবেশের বৈচিত্র্যের মধ্যে নির্জন বালির

ওপর অনেকখানি জায়গা জুড়ে অগণিত হোগলার ছাউনির দোকান-পাট, যাত্রীদের আশ্রয়। পা-ডুবোনো বালির ওপর সাময়িক আস্তানা পেতে আজই সেখানে ডাকঘর থানা হাসপাতাল দমকল, অ্যাম্বুলেন্সের বন্দোবস্ত হয়েছে, সরকারী তৎপরতায় যাতায়াতের পথ সুগম হয়েছে ; কিন্তু তার আকর্ষণই তো টানছে না হাজার হাজার দেহাতি, জ্ঞানহীন জনসাধারণকে। কে তাদের বোঝাবে গঙ্গাসাগরের জলে পৌষের শেষ দিনে স্নান তর্পণ করলে জন্মজন্মান্তরের পাপ ধুয়ে যাবে না। সারা বছরের অবজ্ঞাত সৈকতে মাত্র কটা দিনের জন্যে দিনরাত্রিব্যাপী মাতনে মুখর করে রাখার চেয়ে সারা বছরের স্বাস্থ্যাবাস করার দিকে নজর দেওয়া ভাল।

১৮৪১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত গঙ্গাসাগরে কপিলমুনির মন্দির এক অতি প্রাচীন স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন হিসেবে বেঁচে ছিল অত্যন্ত জীর্ণ অবস্থায়। ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়ায় এর বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছে। "The temple is the last remnant of what has evidently been a large monastic institution for devotees, the ruins of which may be walked over at low water. These shew that the building must have been massy. Temple itself was built of the concha stone brought from Orissa but such is the encroachment at the sea that the last relic of this evidently once exten-sive building if not efficiently repaired will soon moulder away and be among the things that were...."

এরও আগে ১৮২১ সালে Christian Advocate এর Mr, Chamberlain এর প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণীতে দেখা যাচ্ছে,—'লক্ষ লক্ষ মানুষের দল দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে এখানে ছুটে আসছে। নৌকার সঙ্গে নৌকা লেগে ডুবি হচ্ছে কত নৌকা। কত লোক স্বেচ্ছায় তরঙ্গের মধ্যে জীবন উৎসর্গ করছেন। ঝাঁপিয়ে পড়ছেন জলের

কুমির হাঙ্গর, ডাঙ্গায় বাঘের মুখে। তীরে ছোট ছোট আবাসস্থল হয়েছে নৌকার হাল লগি পুঁতে তার ওপর পাল চাপিয়ে। দোকান পড়েছে সার সার। দেখে মনে হচ্ছে একটা সহর বসেছে গঙ্গাসাগরে। বাজার দোকান জমজমাট। কেনা বেচার ভিড়। অন্ধের মত তীর্থযাত্রীরা চাল আর ফলমূল ডাঙ্গার ওপর বিছিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা জলে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে—কখন জোয়ারের জল বেড়ে যাবে—মা গঙ্গা তাদের পূজা উপহার গ্রহণ করবেন নিজের তরঙ্গবাহু দিয়ে। সাগর স্নানে অনন্ত পূণ্য। এমন কি এখানে যার মৃত্যু হয়, তার স্বর্গ-যাত্রা-পথ নিষ্কণ্টক। তাই এখানে মুমুর্ষু আসে মৃত্যুকে শিয়রে নিয়ে। শিশুপুত্র বিসর্জিত হয় গঙ্গাগর্ভে।'

জলযান যখন ফিরে এলো নামখানার ঘাটে তখন সন্ধ্যা সাতটা বেজে গেছে! এতক্ষণ জলের গন্ধের মধ্যে দিয়ে ফিরেছি; চোখ বন্ধ করলে একটা বিরাট ব্যাপ্তি দেখতে পাই। নিঃশ্বাস নিতে পারি প্রাণ ভরে। কলকাতায় এই গঙ্গাকে সহুরে সভ্যতার আবর্জনা-নিকাশী পয়ঃপ্রণালী দেখেছি; কিন্তু কলকাতার পায়ের কাছে সেই গঙ্গাই ভগীরথের ভাগীরথী, মকরবাহিনী পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গে! গঙ্গোত্রীর পূর্ণ পরিণতির পরিসমাপ্তি।

হঠাৎ মনে হয়েছিল সেদিন, মানুষের সমৃদ্ধিই কি এই সংকোচনের কারণ! সভ্যতা দেখছি ব্যাপ্তি পছন্দ করে না। বাইরের ঐশ্বর্য্য চকচক করে চোখ দুটো ধাঁধিয়ে দেয়; অন্তর তার অতি সংগোপনে মৌন হয়ে বসে থাকে নির্বাসনে। হয়ত বা কাঁদেও।





দুই

কতকগুলো ভারাক্রান্ত মন-বোঝাই ট্যুরিং এসোসিয়েশনের ষ্টীমার সাগরদ্বীপের ধার থেকে ফিরে এলো নামখানার ঘাটে। আগামী মৃত্যুর পর অক্ষয় স্বর্গবাস বন্ধ হ'ল বুঝি এই পাপী লোকগুলোর। ঠাণ্ডা শীতের অবসন্ন রাত এসে গেল। কোথায় গেল মনুমেণ্টের মাঠে সেই জিউলী গাছের মরা ডালে দার্শনিক কাকের বিদায় ব্যথাতুর দৃষ্টি-পাত! সারাদিনের একটানা ক্লান্তির সমাপ্তি হল বটে সে রাতের মতন কিন্তু কার ভাগ্যে কতটুকু পুণ্য বোঝাই হল!

হিসেব আমি করিনি! কেউ করেছে কিনা জানিও না!

ঘাটের অন্ধকারে নেমে মাটির স্পর্শ পেয়ে আমাকে সারাদিনের ক্লান্তি যেন আচ্ছন্ন কোরে দিয়েছিল। একটা বড় স্কুল বাড়ীর লম্বা হলঘরে সার সার শোবার আয়োজন কোন দরিদ্র হাসপাতালের ফ্রি-ওয়ার্ডের মত! সেখানে, যে যার কম্বল বিছিয়ে নিজের যায়গাটুকু অধিকার করে রেখে গেছে ইতিমধ্যে; ম্লান হ্যারিকেন জ্বালিয়ে যুদ্ধ-শ্রান্ত সৈনিকরা যে যার গা এলিয়ে দিল। স্থানাভাব, বারোয়ারি নিশি যাপনের ব্যবস্থা পছন্দ হয়নি। সোজা চলে এলাম বাইরে। উন্মুক্ত নামখানা রোডের ধারে নাক-কান-ঢাকা জব্ থব্ বাসের মধ্যে খড়ের বিছানার কথা মনে হল! আর দ্বিরুক্তি না করে আমি আর অরুণ শেঠ পা চালালুম! বাসের মধ্যে ভাল কোরে হাত পা ছড়িয়ে শোয়া গেল কম্বলখানা মুড়ি দিয়ে,—কিন্তু কি জানি কেন ঘুম এলো না। অরুণ

আলাপ করবার চেষ্টা করেছিল ; তাকে আমল না দিয়ে পাশ ফিরে শুলাম। চোখ দুটো বন্ধ করলে কতকগুলো অস্বস্তিকর অশরীরি অপ্রাসঙ্গিক চিন্তা মাথায় আসছে ; তার ওপর ওদিকে ড্রাইভার দুজন ঘুমচ্চে। দুজনের উদ্বেগজনক নাসিকারোল কানের ওপর যেন শব্দের রোলার চালাচ্ছে ! এ-পাশ ও-পাশ করতে করতে অরুণের কৃশকায় শরীর থেকেও বিচিত্র ধ্বনি নির্গত হোতে লাগল নাসা পথে ! একে বাসকে বাসগৃহ করা ভাগ্যে আমাদের জোটে না। তার ওপর এ-হেন বিশেষ সুখকর ব্যবস্থা !

কিছুক্ষণ পরে মনে হল দু'একটা জানলা উঠিয়ে দিই। তাই করলাম। হঠাৎ মুখের ওপর বকের পাখার মতন একরাশ আলো আর বাতাস এসে লাফিয়ে পড়ল। কী মোহময় সুন্দর রাত। কী নিঃস্তব্ধ আর অচঞ্চল পড়ে আছে যুবতী চাঁদের জোয়ার-লাগা সাগর। বাইরে অকাতরে ঘুমচ্ছে পৃথিবী তার কোলের কাছে সন্তানদের নিয়ে ; ঠাণ্ডা বাতাস মাথার মধ্যে লাগছে। কৈ আমার তো বিছানায় ফিরে যেতে ইচ্ছে করছে না। বরং ইচ্ছে করছে অকারণ ওই আলোর নিস্তরঙ্গ সরোবরে ঘুরে আসি ! মনে হচ্ছে আজ যত খুসী দু'হাত ভরে আনি চাঁদের ওই আলো ! কল্পনা কল্পনাই থাকল ! কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই পিচের রাস্তার ওপর জুতোর খটখট আওয়াজ। কে যেন বাসের কাছে এসে ডাকছে, 'ড্রাইভারবাবু—ও ড্রাইভারবাবু।'

ড্রাইভারবাবু আছেন বটে কিন্তু উত্তর দেবার অবস্থাতে নেই। দেশী মদের গন্ধ ছড়িয়ে নাসিকায় প্রবল ধ্বনি তরঙ্গ তুলে মুখে চোখে ঢাকাঢুকি দিয়ে তারা তখন উন্নতমা র্গর যাত্রী। ভাবতে দেরী হল না, আমারই মত কোন উদ্বাস্তু স্থানাভাবে ঘুরে মরছে। মনটা বিগড়ে গেল। অনিচ্ছা সত্বেও হাঁক দিলাম, 'আসুন ভেতরে।'

বাসের ঝুলন্ত চটের পর্দ্দা সরিয়ে যিনি ভেতরে চোখ বাড়ালেন টর্চের আলোয় দেখি—তিনি আদি অকৃত্রিম বাঁড়ুজ্জেমশাই। চোখে না দেখেই বললেন, 'গলাটা যেন চেনা-চেনা মনে হচ্ছে? কে? ভায়া নাকি ?'

ভায়াই বটে।

তারপর দাদুর সেই চিরপরিচিত হাসি। উঠে জায়গা কোরে দিয়ে বললাম, 'কোথায় ছিলেন এই রাত বারোটা অবধি ?'

বাঁড়ুয্যে দাদু মাথার জড়ানো কম্ফাটার খুলতে খুলতে স্মিত হাসি হেসে বললেন : 'আমার কথা আর বোলোনা ভায়া। গিন্নীকে একবার দেখা দিতে গিয়ে ছিলুম। সেখানেই দেরী !'

আমি আকাশ থেকে পড়লাম : 'গিন্নী কোথা পেলেন।'

'সে কি ?', তুমি জানো না ! ইন্‌স্‌পেকশন বাংলোয় তো মেয়েদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। গিন্নীতো সেখানেই !'

'কৈ একবার তো শুনিনি !' সবিস্ময়ে বললাম।

কৈফিয়তের ভঙ্গীতে দাদু বললেন, 'বলবার আর আছেই বা কি ? আলাপ করবে ?'

রসিকতা করে বললুম, 'বুড়ি দিদিমাদের সঙ্গে কি আমরা আলাপ করি দাদু ? হয়ত হবে !'

'তা যা বলেছ ভায়া', দাদু হাসলেন। বললেন, 'তা তুমি কার পথ চেয়ে জেগে আছ ভায়া এত রাত অবধি এই খাসা বাসগৃহে ?'

বললাম, 'বোধ হয় আপনারই।'

দাদু বললেন, 'সত্যি ভায়া। আমি একেবারে তুমিময় হয়ে গেছি। যেখানেই যাই সেখানে তুমি।'

তারপর নিশ্চিন্ত নিরুদ্বিগ্ন হয়ে এসেছে মনটা ! বীরভূমের রাধানগরের বাঁড়ুয্যে মশাই শোননি ! তার গল্প আর থামেনা। আমি অবশ্য থামাতে চাইও না সে কথা আর কাহিনী। বাইরের সেই জনমানবহীন দীর্ঘ নামখানা রোড চাঁদের আলোয় ভাসছে ; বাইরে থেকে ঠাণ্ডা বাতাস ঝির ঝির কোরে বাসের খোলা জানলায় ঢুকছে ! ষষ্ঠীপদ বাঁড়ুয্যে কি ওই গল্পটাই করছে :

নলিনীদলসনাথ সরোবরের ধারে এসে পাণ্ডবাগ্রজ যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে বকরূপী ধর্মের কথোপকথন? ধর্মের প্রশ্নের উত্তরে যুধিষ্ঠির বললেন, এই মহামোহরূপ কটাহে কাল প্রাণী সমূহকে পাক করছে নিরন্তর। মাস ঋতু তার ইন্ধন!—বাঁড়ুয্যে মশায়ের গল্প শুনে ভাবছি এ সেই মহামোহরূপ কটাহের ওপর চিরন্তন পাকশালা। যে দাহনের তীব্রতা ষষ্ঠীপদ বাঁড়ুয্যেকে আজ জীবনের শেষ প্রহর পর্য্যন্ত নিরন্তর পোড়াচ্ছে—তা' যেন সহ্য করে নিয়েছেন দাহু! বুঝতে পেরেছেন, জীবনে কোন দুঃখই পুরাতন নয়—কোন দুঃখই দুঃসহ নয়। তাঁর বিশ্বাস হয়েছে এই পার্থিব দুঃখকে যদি অপার্থিব করে নিতে পার—'তো বুঝলে ভায়া, অনেক শান্তি পাবে। এর মধ্যে কিন্তু আছে; সময় লাগে।' বলে রুমালে চোখ দুটো মুছে স্মিত হাসলেন!

উনিশ-শো ছত্রিশে বারাণসীর হরিশ্চন্দ্র ঘাটে বাঁড়ুয্যে মশায়ের সাতাশ বছরের একমাত্র ছেলে যাবার পর থেকে মাসের পর মাস, ঋতুর পর ঋতু, বছরের পর কত বছরই তো অতিক্রান্ত হোয়েছে; তাহলে এতদিন ধরে বিরাট বাড়বানল অহরহ বুকে জ্বালিয়ে এরা স্বামী-স্ত্রী এতটা পথ পার হয়ে এসেছেন! সংসারে কেবল এই সর্বংসহা বৃদ্ধ আর তার অসহায়া সম্বলহীনা বিকৃত মস্তিষ্ক স্ত্রী। দিনের পর দিন তীর্থের পর তীর্থ পথের পর পথ অতিক্রম করে বেড়াচ্ছেন দু'জনে। বাঁড়ুয্যে মশা' ঘুরছেন কর্তব্যের খাতিরে বৃদ্ধাকে সঙ্গদান করতে। বৃদ্ধা চলেছেন, হারানো সন্তানকে খুঁজে পাবেন বলে। যেখানে যখনই যাচ্ছেন, মনে হচ্ছে সেখানেই অপেক্ষা করে আছে তার ছেলে মণ্টু। মনে হচ্ছে, এ সেই কাশী; কাশীর গঙ্গা। দশাশ্বমেধ মণিকর্ণিকার ঘাট—বিশ্বনাথের মন্দির। বাঁড়ুয্যে মশাই এই দীর্ঘকাল ধরে জীবনের উপার্জিত সঞ্চিত অর্থ ঢালছেন—আর আশাতিরিক্ত উৎসাহে বৃদ্ধা ঢালতে যাচ্ছেন তাঁর ::জন্ম সঞ্চিত মাতৃস্নেহ—কাঙ্গাল হৃদয়ের অন্ধ বাৎসল্যের আবেগ। হায় রে ট্র্যাজেডি।

বসে বসে ভাবছি—

গল্প কবে শেষ করে খড়ের গদীর ওপর কম্বলে মুখ পর্য্যন্ত ঢেকে বাঁড়ুয্যে মশাই অকাতরে ঘুমুচ্ছেন ;—যেন একটা শান্তির প্রকাণ্ড অটল পাহাড়। আমি তখনও দেখছি, চাঁদ ঢলে পড়ছে পশ্চিমে। বাইরে হিমেল রাত শ্রান্ত ! পূর্বের আকাশে নীলচে কুয়াশার স্তরটাকে নিম্নাকাশে আলোর সাগরে যেন মনে হচ্ছে একটা উড়ন্ত মেঘের ছবি।

সকালে ঘুম ভাঙ্গল ড্রাইভারের ডাকে ! 'ঘাটে এসে দেখি সেথা আগেভাগে জুটি' অনেকে স্টীমারে গুছিয়ে বসেছেন। সারা রাত হিম পড়ে জল জমেছে ছাদে। তার ওপর মোটা করে শতরঞ্চ বিছিয়ে যাত্রীরা গালগল্প জুড়ে দিয়েছে।

আবার এমপ্লিফায়ারে বেজে উঠল : 'আমাদের যাত্রা হোল সুরু এখন ওগো কর্ণধার।' স্টীমারের উনুন থেকে নির্গত ধোঁয়া সদর্পে ঘোষণা করল আমাদের প্রাতঃকালীন চা প্রস্তুতির পথে। ষ্টীমার ছেড়ে দিল ফ্রেজারগঞ্জের দিকে।

জানুয়ারীর উপসাগরীয় বাংলায় এবার শীত নামেনি। শিশিরের বৃষ্টি কেবল দক্ষিণ আকাশ মেঘলা করে অস্পষ্ট কুয়াশায় চরাচর আচ্ছন্ন করে রেখেছে। জবাকুসুমসঙ্কাস তার মেঘে-ঢাকা আলোয় উদ্ভাসিত করে দিয়েছে সারাটা জলপথ। শান্ত স্থির স্তব্ধতার মধ্যে একটা জটিল-শব্দসমষ্টি-প্রদায়ক ভাড়াটে এ্যামপ্লিফায়ারের ঘোলাটে সুর প্রকৃতির ভৈরবীকে যেন মুখ ভ্যাঙ্গাতে ভ্যাঙ্গাতে চলেছে। স্টীমারের খোলের মধ্যে জানলায় মাথা রেখে একটা তন্দ্রার আবেশে তারই মধ্যে চোখ দুটো বুঁজে এল।

হঠাৎ এক চেনা কণ্ঠস্বর। নাঃ, বাঁড়ুয্যে মশায় নয়, অরুণ উদিত হয়েছেন। একেবারে পাশে বসে বলল, 'কাল রাত থেকে আপনাকে খুঁজছি ; ছিলেন কোথায় ?'

কোথায় ছিলাম ও জানে। বললুম 'কালিদহে।'

অরুণ আমার মুখ ভাব দেখে কিছু একটা অনুমান করে বলল 'দাত্নর পাল্লায় পড়েছিলেন জানি। সারা রাত জেগে কাটিয়েছেন দেখে সকালে আর ঘুম ভাঙ্গাইনি। কিছু মনে করবেন না।'

অদ্ভুত ছেলে। আন্তরিকতা আছে, কিন্তু বড় বেশি বিনয় আর ভদ্রতা। আমাকে ঘুম ভাঙ্গায়নি বলে আমি কি ওর কাছে কৈফিয়ৎ চাইছি! একসময় বলল, 'আচ্ছা, আপনি ঘুমোন। আমি একটা কাজ সেরে আসি!'—সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে গেল অরুণ।

উনিশ মাইলের জলপথ নামখানা থেকে ফ্রেজারগঞ্জ! ফেরীঘাট পেছনে ফেলে পশ্চিমে এগোলে বড়তলা নদী। তারপর বাঁ হাতে বাঁক নিয়ে মোহনায় দক্ষিণ সমুদ্রের স্বচ্ছ জল মিশেছে যেখানে, সেখানে ফ্রেজারগঞ্জ তস্যার্থে নারায়ণীতলা। তু'টো ঘণ্টায় বেকসুর পার করে দেবে স্টীমার।

ডায়মণ্ডহারবার থেকে কাকদ্বীপ হয়ে কলকাতা থেকে নামখানার দূরত্ব ৬৮ মাইল! বাসে সময় চার সাড়ে চার ঘণ্টা লাগার কথা। তারপর নামখানা থেকে বাস রাস্তায় আরও ১৬ মাইল এগিয়ে ফ্রেজারগঞ্জ পৌঁছতে সময় আরও কিছুক্ষণ লাগবে! এই রাস্তাটিই এখন তৈরীর মুখে। পথে যদিও সেতু করার মত উল্লেখযোগ্য কোন নদী নেই—তবুও সরকারী হিসাবমত ৩০ লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করে নারায়ণীতলা ওরফে ফ্রেজারগঞ্জকে হাতের কাছে আনতে আরও বছর তিনেক অপেক্ষা করতে হবে। তার পূর্বে নামখানা নদীর ওপর সেতু তৈরী হোক। শুনেছি, নামখানা খাল দিয়ে পূর্ববঙ্গের ডেসপ্যাচ স্টীমার যাতায়াত করার ফলে বিশেষ ধরণের উঁচু সেতু করার বদলে সরকার নাকি 'পাওয়ার ফেরীর' ব্যবস্থা করবেন। তাতেও মোটর আরোহী শনিবারের তুপুরে কলকাতা ছেড়ে সন্ধ্যেবেলা স্বাস্থ্যনিবাসে

পৌঁছতে পারবেন ; সেখানে সমুদ্রের হাওয়া খেয়ে রাত কাটিয়ে পরের দিন বিকেলে কলকাতা ফেরা যাবে।

তবে এ সবই ভবিষ্যতের কথা। জানুয়ারীর সকালে যে ফ্রেজারগঞ্জ যাত্রাকে মনে হয়েছিল, আন্টারটিক সাগর পাড়ি দিয়ে মেরু অভিযানে চলেছি—সে রোমাঞ্চ ও অ্যাডভেঞ্চারটুকু সেদিন লুপ্ত হবে। অতএব জিলিপী পথ পরিক্রমা করে দীঘার নেই-মামার চেয়ে ফ্রেজারগঞ্জের কানামামা ভাল লাগবে তখন।

ফ্রেজারগঞ্জের দক্ষিণ মুখী উপকূলডাঙ্গা সেদিন বেলা নটায় একটা সুন্দর স্মৃতি রেখে গেছে আমার মনে। সার সার নারকেল গাছের ধারে, বিরাট বিস্তৃত বালুকাবেলায় সামনে, বিপুল বারিধির উচ্ছ্বাসে বিশ্ব শিল্পীর হাতে গড়া বালিয়াড়ীর পাশে ফণিমনসার ঝোপ—মনে অক্ষয় স্মৃতি এঁকে রেখেছে চিরকালের ! নদীপথের ঘোলা জল পেরিয়ে যখন দেখা দেয় দূর দিকচক্রবাল পর্য্যন্ত অসীম সমুদ্র, তখন যাত্রী পায়ের তলে মাটির স্পর্শের জন্যে লালায়িত হয়ে ওঠে।

ঘাটে সার সার জেলে নৌকা। লোনা জলের হাওয়ায় লালিত জেলেদের কালো কালো ছেলেমেয়েগুলো, টাঙ্গানো জালের পর জাল, সার সার ঝুলিয়ে রাখা শুকনো মাছের জাল-ঢাকা গুদাম—এই সব নিয়ে কলকাতার কাছাকাছি একটা অঞ্চলে কতকগুলো মানুষ জীবন কাটিয়ে যাচ্ছে দিনের পর দিন। সারা অঞ্চলটাতেই মাছ। কলকাতার বাজারে চিতিয়ে ওঠা দূর সমুদ্রের মাছগুলো এখানকার ডাঙ্গায় মাথা রেখে মরে ; তারপর কাঠের বাক্সয় বরফের তলে 'ব্ল্যাকহোল ট্র্যাজেডি'তে কলকাতার মহাজনের পথ চেয়ে দুপুর, সন্ধ্যে, রাত, ভোর পর্য্যন্ত অপেক্ষা করে। জেলেরা চট্টগ্রামের। অতএব মৎস্য সংকটের দিনে অভিমানী মহাজনদের হাতে মৎস্য সঞ্চয় তুলে না দিয়ে বালির ওপর জালের ঘেরাটোপের আড়ালে তারা মাছ শুকিয়ে যাচ্ছে দিনের পর দিন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মৎস্যদপ্তরও আছে। তারা খাদ্য-

অখাদ্য সামুদ্রিক মাছ নিয়ে শুকনো সার তৈরী করে চলেছে। স্থানীয় বাসিন্দা বলতে এরাই। আর কয়েকঘর আছে মাহিষ্য পোদ সম্প্রদায়ের ভাগচাষী।

ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে সারা গ্রামখানির কিছুটা ঘুরে এলাম আমি আর অরুণ। ফ্রেজারগঞ্জের বিখ্যাত নারকেলবাগানে হঠাৎ দেখা কলকাতা দুটি ছেলের সঙ্গে! নামখানা থেকে তারা হাঁটাপথে ষোল মাইল পার হয়ে এসেছে। মরদ বটে! কৃশকায় অরুণ শেঠ কথাটা শুনে চমকে উঠল, 'কি বলছেন? হেঁটে?' রতনলাল কোমরে তোয়ালে জড়াতে জড়াতে বলল, 'উপায় কী বলুন! নৌকায় যাওয়া-আসা দশ টাকা চাইল। নামখানায় এসে ফিরে যাব? নেমে পড়লুম রাস্তায়।'

ছেলে দুটির চোখে মুখে ক্লান্তির ছাপ নেই। পথে আসতে আসতে কোথায় মুড়ি পেয়েছে, দুধ পেয়েছে কোন গেরস্থর ঘরে, নারকোল খেয়েছে, পেয়েছে একজোড়া ডিম—তাই খেতে খেতে অবলীলাক্রমে চলে এসেছে এতটা রাস্তা।

'যাবেন কি করে?' অরুণ জিজ্ঞেস করল।

রতনলাল নির্দ্বিধায় উত্তর দিল, 'কেন হেঁটে। আজ রাত্তিরেই বাড়ী পৌঁছতে হবে তো।'

কোথায় গেল বাংলাদেশের গভর্নর স্যর এণ্ড ফ্রেজারের নারকেল-বীথির ফ্রেজারগঞ্জ। অরুণ শেঠ প্রেস ফটোগ্রাফারের মতন ছেলেদুটির ছবি তুলে খুব বিনয়ের সঙ্গে বলল, 'দাদা আপনারা ধন্য। আপনারা বাংলাদেশের মুখ উজ্জ্বল করছেন?'

এই মেরেছে।

কমবয়সী ছেলে দুটিও লজ্জা পেল। তারা সরে যেতে বললুম, 'আপনার কি কোন জ্ঞানগম্যি নেই' একেক সময় এমন করেন।...

অরুণ সবিনয়ে বলল, 'কি করলুম।'

'কথায় কথায় এমন বেসামাল হয়ে পড়েন কেন?' খুব পরিচিত

নয়—নইলে তার সঙ্গে এতক্ষণ ধস্তাধস্তি হয়ে যেত হয়ত! দুঃসাহসিকতার জন্যে পুরস্কার দাও—তার প্রাপ্য সম্মান দাও। কিন্তু নিজেকে অত ছোট করা কেন কথায় কথায়?

মাত্র ষাট বছর আগে ফ্রেজার সাহেব এই নারায়ণীতলাতেই এক উপনিবেশ পত্তনের চেষ্টা করেছিলেন। বণিকসভার সাহেব বিবিরা তখন অবসর যাপনের জন্যে সাময়িক নিবাসস্থল হিসেবে কলকাতার কাছাকাছি এই সমুদ্রপল্লীকে ভালবেসে ফেলেছিলেন। সস্তায় জমি বিলি হয়েছিল; স্কুল ডিসপেনসারী প্রভৃতি দিয়ে বাসোপযোগী করে সাহেব নারায়ণীতলাতেই মনোনিবেশ করেছিলেন। অরুণ বলল, 'তাহলে উপনিবেশটা গেল কোথায় বলুন তো?'

আছে। উপনিবেশের মধ্যে জীবিত আছে এই নারকেলগাছের বাগিচাটি! তাও সমুদ্রগর্ভে কিছু কিছু খোয়া যাচ্ছে! আর কিছু নেই। কিছু কিছু বাসিন্দা সেদিন জঙ্গলমুক্ত নারায়ণীতলাতে বাস করতে এসেছিল; কিন্তু বাঘের উৎপাতে ক'দিনের মধ্যেই পাততাড়ি গুটিয়ে দে ছুট। পড়ে রইল ফ্রেজার সাহেবের এই বাগান আর বাংলার মানচিত্রে আধুনিক কালের ফ্রেজারগঞ্জ নামটুকু!

অরুণ একটা গাছে ঠেস দিয়েই ঘুমবার চেষ্টা করছিল; চোখ রগড়ে উঠে বসে বলল, 'তারপর।'

আমি বললাম, 'তারপর আপনার চালাকি ধরা পড়ে গেল!" আর একমিনিট গেলেই নাক ডাকতো! আর ঈশপ সাহেবের গল্পের বন্ধুর মতন আমি আপনাকে এখানে ফেলে পালাতাম। ষোল মাইল হাঁটতে পারেন কিনা দেখা যেত!'

শুনে ফ্রেজার সাহেব নারকেলগাছের লম্বা লম্বা পাতার ফাঁক দিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বোধ হয় কিছু একটা বলতে চাইলেন। আমি তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে বললাম 'চলুন স্নান করতে হবে।'

অরুণ ক্যামেরা কাঁধে ঝোলাতে ঝোলাতে বলল, 'আবার চান

কেন বলুন তো? কোথায় কুমীর হাঙ্গর আছে না আছে কে জানে। ছেড়ে দিন কি বলেন?'

'দেখি কি হয়।—'

সমুদ্রের কাছে এসে দেখা গেল দলের অনেকেই ইতিমধ্যে স্নান সেরে উঠে পড়েছেন। অরুণ বলল, 'দেখছেন তো—সময় আর বেশি নেই। নতুন জল,—কি দরকার চান ফানের মধ্যে গিয়ে।'

নিরুত্তরে জামা কাপড় ছাড়তে ছাড়তে বললুম, 'ঠিক আছে, আপনি এখানে এখন দাঁড়ান! আমি তাড়াতাড়িই আসছি।'

অরুণ ক্যামেরা নানারকম ভাবে বাঁকিয়ে এপাশে-ওপাশে চারপাশে ঘুরে মরুভূমির মতন বালির রাজ্যে পরম যত্নে ক্যাকটাসের ছবির জন্যে লেগে রইল।

আশ্চর্য্য! এতক্ষণ বাঁড়ুয্যে মশাই-এর কথা মনে হয়নি। আমার স্বভাবই এমনি! যখন যেখানে থাকি, যার সঙ্গে থাকি, মনের অংশ জুড়ে থাকে সে; তারপর তার অনির্দ্দেশ সব হারিয়ে দেয়। কালকের নিদ্রাহীন রাত ধরে রাজনগরের বাঁড়ুয্যে মশাই আমার মনটাকে ভীষণভাবে নাড়া দিয়ে গেছেন। আজ তারা নেই; স্টীমারে তাদের আসতে দেখিনি; কিন্তু সস্ত্রীক লোকটা গেল কোথায়?

স্নান সেরে তীরে উঠে এসে অরুণের কাছে শুনলাম দাদু আসেন নি। দিদিমার শরীরটা ভাল নেই! অনেকক্ষণ সমুদ্রের তীর ধরে হাঁটতে হাঁটতে ও বলল, 'ওদের কথাই ভাবছেন বুঝি?'

লজ্জার সঙ্গে হাসলাম!···

ওদিকে স্টীমার থেকে মাইকে জরুরী তাগাদা দিচ্ছে ফিরবার; 'আপনারা যে যেখানে আছেন···'

তাড়াতাড়ি দুজনে পা চালালাম স্টীমারের উদ্দেশে।

পেছনে রইল সৃষ্টির আদিতম দিনের স্মৃতি-তরঙ্গ নিয়ে মহাবিশ্বের উত্তাল জল-কল্লোল। ওই বাঁ হাতে দূরে দেখা যাচ্ছে জম্বু দ্বীপ;

দুর সমুদ্রের মধ্যে ঝাপসা হোয়ে আছে কুয়াশায়—স্টীমারে আসবার পথে কালিদাস পতিতুণ্ডি লেনের জনার্দ্দন সেনশর্মা বলছিলেন, ফ্রেজারগঞ্জের চেয়ে নাকি আরও ভাল সমুদ্রতীর আছে সেখানে। থাক। আধুনিক সভ্যতার উন্নয়নের হাত থেকে রক্ষা পাক! স্টীমার চলল সেই জম্বু দ্বীপকে পেছনে ফেলে ;

তাকিয়ে এখনও দেখা যাচ্ছে সমুদ্রের উত্তাল সবুজ জল পথ শেষ হয়নি! অনেক পেছনে রয়েছে ফ্রেজার সাহেবের কোচিন থেকে আনানো সখের নারিকেল বীথি ;

নামখানায় নামতে নামতে দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে গেল।

এখান থেকে ফিরে যেতে হবে কলকাতায়। সেখানে প্রাত্যহিক নগরকীর্ত্তনে গলা মেলাতে হবে আবার। মাঝখানে দুদিনের হাঁফ ফেলবার জন্যে ডুব সাঁতারের মধ্যে থেকে যেন হঠাৎ হাত পা ছেড়ে ভেসে ওঠা। কোথায় থাকবে সহযাত্রী এতগুলো লোক।·· কোথায় জলের অন্ধকারে প্রাচীনতম আবছায়া সাগরদ্বীপ আর সকালের রোদে জ্বলজ্বলে ফ্রেজারগঞ্জের সমুদ্রে জেলে নৌকার সার!

লোনা জল পার হোয়ে নামা গেল নামখানার নোনা মাটিতে! অরুণ বাঁ দিকে ঘাটের মাটিতে নেমেই আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল, 'দেখুন দেখুন নদীব জল এত উঁচু পর্য্যন্ত উঠেছিল! এখনও ফেনা লেগে আছে!'

ফেনা নয়! নোনা মাটির নোনা জল শুকিয়ে অমন নুনের মত জমে আছে ; বললুম, 'ফ্রেজারগঞ্জের গ্রামে দেখলেন তো এই নোনা জল নিয়েই ওদিককার লোক ঘরে কেমন করে নুন তৈরী করে।' অরুণ সেখানে কোড্ডিং ক্যামেরা বাগিয়ে ছবি তুলে ফেলেছে! বললুম, 'নিন, লবণ শিল্পের র' মেটিরিয়্যালের একখানা ছবি নিয়ে নিন।' সরল ছেলে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ বোঝে না। উত্তরে বেশ চিন্তাশীলের মত বলল, 'লাইট-টা ফেল করেছে ;—হবে ?

চড়াই ঠেলে রাস্তার ওপর উঠে চলতে আরম্ভ করলাম আমি।

দেখতে দেখতে ষ্টীমার খালি হোয়ে গেছে। নামখানার ইস্কুল বাড়ীর দিকেই সকলে একটু দ্রুতই চালিয়েছে পা! লোকগুলোর হঠাৎ মনে পড়ে গেছে, ছুটি ফুরিয়েছে। কালকে সকাল থেকে যথারীতি ঝুলতে হবে ট্রামে বাসে! আমার কোন কাজ নেই!

অরুণ ইন্‌স্‌পেকশ্যন বাংলোটাকে দেখিয়ে বলল, 'চলুন, দাদু দিদিমার সঙ্গে দেখা করে আসি।' দাদু ষষ্ঠীপদ বাঁড়ুয্যে ওখানে ওই মেয়েদের আস্তানায় থাকবেন না; তবু অসুস্থ স্ত্রীর হেফাজতিতে হয়ত আছেন! ভেবে চিন্তে ওখানে যাওয়া স্থির করে বললুম, 'চলুন, ওদিকে দোকান রয়েছে দেখছি; একটু চা খাওয়া যাক।'

পর পর কয়েকটা দোকান; কোন কোনটা মনে হল দুপুরে আহারের ব্যবস্থার জন্যে; গোটা দুয়েক পান বিড়ি আর বোধহয় তক্তাপোষ পাতা কোনটা বা মাছের ব্যাপারীদের আস্তানা! চায়ের দোকানে যাওয়া গেল। অরুণ চা স্পর্শ করেনা। পেটে যে যাবতীয় ব্যায়রাম আছে স্বীকারও করেনা। বলল, 'আপনি ততক্ষণ চা খান—আমি একটা দুটো সাবজেক্ট খুঁজি। আপনারও যেমন খালি চা আর চা।' বিরক্তির সঙ্গেই গজগজে ক্যামেরাম্যান সামনের জল কাদার মধ্যে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে এগিয়ে গেল একটা কাৎ হোয়ে পড়া নৌকার দিকে। ক্যামেরাম্যান বটে; ঝড় ঝঞ্ঝা বজ্রপাত, সন্ধ্যের অন্ধকার কিছুই গ্রাহ্য করে না।

ইতিমধ্যে একটা ঘটনা ঘটছে দোকানে। পেছন থেকে দেখে, গলার স্বর শুনে যতদূর মনে হচ্ছে ভদ্রলোক আমাদের দলের নয়! দেখতে দেখতে দোকানদারের সঙ্গে তার বচসা কোলাহলে দাঁড়াল। দোকানের ছেলেটা চা বানাবে কি, ক্রেতাকে কোন মতে সন্তুষ্ট করতে পারছে না।

পাঞ্জাবী-পরা ভদ্রলোকটি তবু নাছোড়বান্দা! বলছেন, 'রাখনা কেন তা'লে?'

ছেলেটা বলছে, 'চারমিনর, প্যাশিং শো, নাম্বর টেন যা হয় নিন না। উইলিস এদিকে মেলেনি।'

ভদ্রলোক খেঁজে উঠে তার কণ্ঠস্বর অনুকরণ করে বললেন মেলেনি। একবারে কেতাত্থ কোরে দিলে।'

কথা কাটাকাটি অনেকক্ষণ চলছে বোঝা গেল। ভদ্রলোক রণে ক্ষান্ত দিয়ে দোকান থেকে নিষ্ক্রান্ত হতে হতে সামনে আমাকে দেখে সাক্ষী মেনে বললেন, 'দেকুন দিকি, কারবার ; তিন দিন ধরে বলছি, আমার জন্যে উইল্‌সের প্যাকেট আনিয়ে রাখবি। ওর বাপটা কথা শুনতো। এ হারামজাদাটা....'

হঠাৎই ভদ্রলোকের মুখখানা চেনা চেনা ঠেকল। আমাদের সঙ্গে বাসযাত্রী ছিলেন না। হয়ত এখানকারই লোক। কিন্তু কোথায় কবে দেখেছি মনে করতে পাচ্ছি না কিছুতে। আগে যা শুনেছিলুম বাগবিতণ্ডা। এখন মুখ দেখে আমার কান দুটোও বন্ধ হবার উপক্রম হল। তারপর চকিতেই কি একটা মনে পড়ে গেল! স্থির নিশ্চয় জেনে হঠাৎ মুখ দিয়ে এবার বেরিয়ে গেল, 'তুমি গদাধর না?'

ভদ্রলোক ততক্ষণে প্রবল একটা বিস্ময়সূচক শব্দ কোরে বললে 'আরে তুমি!' বলে ওই মোটা সোটা দেহের গুরুভার সমেত আমাকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'তুই এখেনে কেন?'

গদার হৃদয় আছে! গলায় জোর আছে সেইরকমই। আস্তে আস্তে তার গদা হাত দুটো সরাতে সরাতে অবাক হয়ে বললুম, 'আমার কথা বলছি। তোর কথা বল। তুই এখানে?'

গদা আমার হাত ধরে হিড় হিড় কোরে টেনে রাস্তায় নামিয়ে আনল। তাকে বাধা দেবার সাধ্য আমার কোথায়; তবু ক্ষীণ আপত্তি জানিয়ে বললুম, 'আরে করিস কি; আমার বেডিং পড়ে আছে। চা-টা খেতে খেতে তোর সঙ্গে কথা কই আয়।'

গদা গাঁক গাঁক করে বলল, 'দূর দূর ওখেনে চা খাবি কি! কোত্থেকে পেঁপে পাতা এনে সেদ্ধ করে খাওয়ায়;— চল।'

অরুণও ততক্ষণে ছবি শিকার অসমাপ্ত রেখে অতর্কিত-বিপর্য্যয়ের থেকে নিজেকে বাঁচাতে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গুটি গুটি নিজের বিছানার বাণ্ডিলটা তুলে নিয়েছে। আমার চোখে চোখ পড়তে ইঙ্গিত করে জানতে চাইল কর্ত্তাব্যাক্তিটি কে।

বললুম, 'আসুন বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দি। এ হচ্ছে আমার ছোট বেলার ইস্কুলের বন্ধু গদাধর নন্দী। আর এ অরুণ শেঠ।' এক হাতে ক্যামেরা বগলে বিছানার বাণ্ডিল সামলে অরুণ নমস্কার করার চেষ্টা করল।

গদা ভারী গলায় বলল, 'ঠি-ক চিনেছি, কি বল। ওঃ প্রায় কুড়ি পঁচিশ বচ্ছর পরে দেখা!'

ক্লাস ফোর ফাইভে গদাধর নন্দীর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়েছিল। তারপর বোধ হয় আর কোনদিন দেখা হয়নি : ঠিক মনে নেই— প্রথম প্রথম তার খোঁজ-খবর নিশ্চয় করেছিলুম ; কিন্তু পরে যা হয়—মন থেকে বেমালুম মিলিয়ে গেল গদাধর! কিন্তু ক্লাস ফোরের কচি ছেলেটাকে আজকে চিনলাম কেমন করে এতদিন পরে?

গদা অক্ষয় হয়ে আছে অন্য কারণে! সে কথা পরে বলছি।

অরুণ সত্যিই ঘাবড়ে গিয়েছিল। গদা ফস কোরে সিগারেট ধরিয়ে দুজনকে দুটো এগিয়ে দিল।—'নাও পানামাই খাবো।' অরুণ সিগারেট খায় না। নিল না। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে গদাধর বলল, 'চঃ।'

অরুণ চুপি চুপি আমায় বলল, 'কোথায়?'

'কোথায় রে?' গদাকে প্রশ্ন করলুম!

গদা নিরুদ্বেগে বলল, 'কেন আমার কলে।'

'কতদূর?'

নামখানা নদীর ওপারে একটা লম্বা চিমনি দেখিয়ে গদাধর বলল, 'ওই তো অন্নপূর্ণা রাইস মিল।'

অরুণে আমাতে মুখ চাওয়াচায়ি হল। এদিকে ফিরবার সময়

হয়ে এসেছে। এমনিতেই দেরী করেছি! এবার হন হন কোরে পা চালাতে হবে বাস ধরতে! রাস্তার মোড়ে এসে অরুণ বলল, 'কিছু মনে করবেন না। আমাকে ফিরতে হবে।'

'আমাকেও', আমি বললাম।

গদা অরুণকে বিশেষ কিছু বলল না। আমার কব্জীটা সজোরে চেপে একটা টান দিল! অরুণ বেগতিক দেখে বলল, 'আপনি না হয় থেকে যান! আপনার তো তেমন তাড়া নেই!' বলে আর দাঁড়াল না; একরকম ছুটতে আরম্ভ কোরে বলল, 'ওখানে কিছু পড়ে আছে কিনা দেখব।'

অরুণ চলে গেল। যেন পালিয়ে বাঁচল বেচারা।

গদা বললে, 'ব্যস। এবার চল শালা!' একটা মোটা কাবলী-ওয়ালা যেন সুদ আদায় করছে বেঁটে পাওনাদারের।

আমি হেসে উঠলাম। ঘরে ফেরার তাড়া সত্যিই আমার নেই। তার ওপর গদার মত মানুষের জবরদস্তি। আমি একরকম গা এলিয়ে দিলাম।

আবার সেই নামখানার ঘাট।

মাঝিটা সম্ভ্রম কোরে গদা আর আমাকে নৌকায় তুলে নিল। গদার দিকে বার বারই তাকিয়ে দেখি। আগেকার সেই রোগা রোগা ছেলেটার সঙ্গে স্থূলকায় আজকের এর তো কোথাও মিল নেই। গায়ে সার্জের পাঞ্জাবীর ওপর শাল জড়িয়ে গদা এখন বেশ গণ্যমান্য সভ্য ব্যাক্তি। অথচ তাকে চিনলাম কি করে।

মাঝির মালিক নিশ্চয়ই গদাধর নন্দী। টাল সামলে বাবু যেমন মাঝির সহায়তায় নৌকায় উঠে উল্টে মাঝিকেই ধমকাল,—যেমন ভাবে ওর মোটা থলথলে ঘাড়ের ওপর থাক্ থাক্ খাঁজ পড়েছে আর মোটা আঙ্গুলে যেমন ভারী ভারী আংটি গোটা তিন তাতে ও মালিক শ্রেণীরই বটে আমি বুঝলুম।

মিনিট দুয়েক হবে। নৌকা শুধু নদীটা পার কোরে দিল।

অতি সাবধানে নৌকাকে এপারে ডাঙ্গার ওপর টানাটানি কোরে মাঝি বাবুকে ধরে ধরে নামিয়ে দিল। গদা আমার বিছানার বাণ্ডিলটা তাকে দিয়ে ভেতরের ঘরে রাখিয়ে দিয়ে ধানকলের সিমেণ্ট বাঁধানো চত্বরটায় ঢোকাল। একপাশে পাকা গাঁথুনির ওপর টিনের চাল। সামনে বাঁধানো বারান্দা। কতকগুলো চেয়ার, ক্যাম্প খাট একটা ছোট টেবিল বসানো। ইতিমধ্যে অনেকগুলো লোক এসে ছোটবাবুকে ঘিরে ফেলেছে। গদা বলল, 'মধুবাবু, এ আমার বন্ধু। এর থাকবার শোবার ব্যবস্থা করে দিন।' আমায় বলল, 'যা।'

একজন যায় আর একজন তুলে নেয় আমায়। দিন গেল; দেখতে দেখতে সন্ধ্যেও নেমে এলো। হু'দিনের জন্যে যাদের পেলাম, দেখলাম—হুদিন পরে হঠাৎ তারা ফাঁকা কোরে দিয়ে চলে গেল; কোনদিন আমি তো ভাবিনি ছোট বেলাকার এই হারিয়ে যাওয়া গদাধর এমন একটা সুবিশাল চেহারা নিয়ে আমার কাছে এসে দাঁড়াবে? ইলেকট্রিক আলো জ্বলা, রেডিও চলা ছোট্ট ঘরখানায় তক্তাপোষে বিছানা পেতে, মশারি টাঙ্গিয়ে সনাতন ছোকরা সব ব্যবস্থা কোরে দিয়ে গেল। খানিকক্ষণের মধ্যে কোথা থেকে চা আর ডিমের মামলেটও এসে গেল। সনাতনকে জিজ্ঞেস করলাম, 'হ্যাঁ রে ছোটবাবু কোথায়?'

সনাতন সবিনয়ে সঙ্গে বললে, 'বাবু ম্যানেজার বাবুর সঙ্গে কথা কইছেন আজ্ঞা।' কথা শোনা যাচ্ছে পাশের দরজা বন্ধ ঘরটায়, ধান চালের, দর দামের হিসেব নিকেশ বিষয় আশয়ের তদারকি।

একসময় ঘরে এল ও।

গল্প করতে করতে শীতের রাত অনেক হোয়ে গেল।

ক্লাস ফাইভে পড়া শেষ করে ওরা সপরিবার উঠে এসেছিল মেদিনীপুরে। মহিষাদলে পৈতৃক বাড়ী গদাদের। সেখানেই অনেক

কষ্ট করে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ক্লাস এইটে উঠে পড়া ছেলে দিল ও। গদা হো হো কোরে হেসে বলল, 'তুদ্দুর ওসব কি বাপ চোদ্দপুরুষ করেছে কোনকালে? বেশ আছি ভাই চাল তেল নিয়ে—কি বল?'

'—সে কথা বলতে। ব্যবসার চেয়ে বড় কি আছে?'

গদাধর সিগারেটে সুখটান দিয়ে পায়ের চেটোতে হাত বোলাতে বোলাতে বলল, 'তোর কথা অনেক দিন মনে হয়েছে। বে থা করেছিস?'

বললুম, 'ওসব কি আমাদের জন্যে? খাওয়াবো কি?'

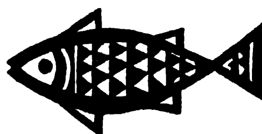
এসবের মধ্যেও গদা বিষয়-আশয়ের কথা শোনাল। মহিষাদলে সর্ষে তেলের ঘানি নিয়ে ব্যবসা আরম্ভ করেছিল ওরা; এখন মহিষাদল, ঘাটালে তুটো অয়েল মিল, এখানে একটা চালকল, আর একটা কিনবার কথাবার্ত্তা চলছে। ভেদিয়াতে একটা চলছে। বেহালার বাড়ীতে ও থাকে বউ আর তিন ছেলে মেয়ে নিয়ে। ওদিকে মহিষাদলে থাকে বুড়ী মা আর বড় দাদা। বেহালার বাড়ী থেকে এখানে আসা-যাওয়া সোজা। গাড়ী রয়েছে ভাবনাও নেই! এখান থেকে তু'একদিনের মধ্যেই ও যাবে মহিষাদল।

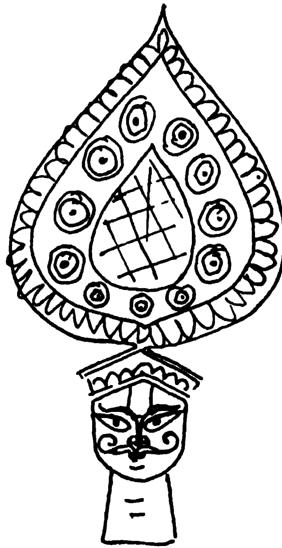
আমি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললুম, 'ওঠ, এবারে শোয়া যাক!'

চওড়া মিশকালো বুকের ওপর গদাধরের ঘন চুল! মাথায় অল্প অল্প টাক পড়ে গেছে! আবার সেই শব্দ কোরে হাসতে হাসতে গদা বেরিয়ে যেতে যেতে বলল, 'আচ্ছা ঠিক আছে। পাশের ঘরে আছি। রাতে দরকার হোলে ডাকিস। টর্চ্চটা মাথার কাছে রাখ।'

ঘরের আলোটা নিভিয়ে দিয়ে চলে গেল গদা। আশ্চর্য্য। পঁচিশ বছরের বন্ধুপ্রীতিটুকু এখনও বেঁচে আছে ওর মধ্যে। তার জোরেই ও একদিন হেড মাষ্টার মশাইয়ের বেত পিঠ পেতে সহ্য করে বাঁচিয়েছিল আমাকে! আজ তাই ভাবি, কালো, নোংরা জামা

কাপড় পরা গরীব সেদিনকার ছেলেটার বুকের মধ্যে কতবড় হৃদয়ই না ছিল। কোনদিন কোন পড়া গদাধর পারে নি; শান্ত ভদ্র হোয়ে একটা দিনও ইস্কুল করেনি। তবু আমার জন্যে একটা দুর্বলতা ছিল ওর সেদিন; বোধহয় আজও আছে। এসব কোনদিন ভাবিনি। আজ ভাবতে গিয়ে আমার ছোটবেলাটা স্পষ্ট যেন চোখের সামনে দেখা দিল। কিন্তু সব ছাড়িয়ে আরও একটা প্রশ্ন মাথা নাড়া দিচ্ছে —ঘরে মেয়েলী গলায় কথা বলে কে এত রাতে?





তিন

ধানকলের আপিসের দাওয়ায় বসে বসে তাই ভাবতাম···

চোখের সামনে বিরাট বাঁধানো চত্বরটায় আদিবাসী ছেলে মেয়েগুলো পা দিয়ে ধান মেলতো ; ধান রোদে শুকতে দিত পা দিয়ে নেড়ে নেড়ে। ছোট একটা ছেলে বাঁখারির তীরধনুক নিয়ে সত্যিকারের বীরের মত সারা চত্বরটায় এদিক থেকে ওদিক ছুটোছুটি করত হাজার হাজার কাক-সেনার পেছনে।

দিনের পর দিন এই নিয়মিত দিনযাপন। আকাশে রোজ সূর্য-ওঠে—অস্ত যায় ; বঙ্গোপসাগরের মেঘ এসে আকাশ ছেয়ে ফেলে। কোন কোনদিন বৃষ্টি এসে যায়। নিমেষের মধ্যে ধান জড়ো করে তার ওপর ঢাকা পড়ে যায় সার সার—পূর্ণিমার রাতে মনে হয় যেন শিবিরে গোপনে অপেক্ষা করছে লক্ষ লক্ষ সৈনিক।

গদা সকালবেলা বেরিয়ে যায় রোজই !

একদিন রাতের বেলা গল্প করতে করতে বললে, 'তা এদ্দিন বলিস নি কেন? আমাদের নৌকা রয়েছে।' কটা লোক দিচ্ছি,

কদিন ঘুরে আয় না ওদিকটায়।'

ওদিকটা মানে সুন্দরবনের দিকটায়।

হাতে স্বর্গ পেলাম যেন। শুয়ে আর বসে তিনদিনে কোমরে ব্যথা ধরে গেছে। ব্যবস্থা তার লোকেরাই করল। নৌকা বোঝাই হল খাবার জল রান্নার আয়োজনে! পরদিন সকাল না হোতেই বেরিয়ে পড়লাম।

একদিন অখণ্ড বাংলার চার হাজার বর্গমাইল সুন্দরবন অঞ্চলের একপ্রান্তে কটা দিন বসেছিলাম। এবার বেরিয়ে পড়লাম আর এক প্রান্তে। প্রাক্-পাকিস্থান যুগে এই বিরাট বিস্তৃত ভূমিখণ্ড পূর্বে মেঘনার কোল থেকে ব্যাপ্ত ছিল হুগলী নদীর মোহনা পর্য্যন্ত। আজ পশ্চিমবঙ্গ ১৬৩০ বর্গমাইল পরিমিত অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট শ্রেণীর অরণ্য সম্পদ নিয়ে বিভক্ত। যাক সে কথা!

ব্যাঘ্র-অধ্যুষিত এই সমুদ্রতট ইতিহাসের আদিপর্বে 'ব্যাঘ্রতটি মণ্ডল' নামে অভিহিত হত। মিঠা জলের নদী পলি বহন করে নিয়ে আসে সমুদ্র মিলনে; সেখানে যুগ যুগ ধরে সঞ্চিত হয় মাটি। তারপর সৃষ্টি হয় অরণ্য। সে অরণ্য-সীমা ক্রমশঃ বিস্তৃত হতে হতে অরণ্য অধিকৃত বাংলার দক্ষিণ অঞ্চল লৌকিক বনদেবতা দক্ষিণরায়ের আপন রাজ্যপাট হোয়ে দেখা দিয়েছে।

শুধু জল আর জঙ্গল। গভীর শ্বাপদ-সংকুল অরণ্য জীবনের আদিম সৌন্দর্য্য নিয়ে এর মধ্যে বাস করে চিতল হরিণ বাঘ আর ভল্লুক, সাপ আর পাখী।—লক্ষ লক্ষ নাম-না-জানা জলপাখী। দেখতে দেখতে নৌকার দিন নৌকার রাত কোথা দিয়ে কেটে যায়।

দূরের অন্ধকার ঝোপের দিকে আঙ্গুল তুলে লক্ষণ বলল, 'বাবু, পূন্নিমের রেতে আমরা এখেনে পাখী ধরতে এসি।'

সে কি কথা, ওখানে বাঘ নেই?

'নাঃ'; বেশ জোরের সঙ্গে বলে অনন্ত,—'খালি পাখী।'

টিম টিমে আলো জ্বেলে জলের মধ্যে নৌকার জীবন চলে। ভয়ে ভয়ে বাইরে দিকে তাকালে অতি কষ্টে বোঝা যায় একটা খণ্ড দ্বীপের মত ভূখণ্ডের পাশ দিয়ে চলেছি।

লক্ষণ একগাল হেসে বলল, 'আজ্ঞে! পাখী আছে। রেতের বেলা দেখতে পায় নে। আস্তে আস্তে গাছে উঠে ডাল নাড়ালে টুপ টুপ করে পড়ে পাকা আঁবের মতন।'

শীতের দিন, নদীতে কখনও জোয়ার কখনও ভাঁটা আসে! হেতাল ধুদল, পাস্থুব গাছের জটিলতার তলে, স্যাঁতসেঁতে মাটিতে, হোগলার লম্বা পাতার আড়ালে দিনের পর দিন সময় যেন ঘুমিয়ে থাকে! ধেনোপাখী আর পানকৌড়ী, কৃষ্ণকণ্ঠ সারস আর পেলিক্যানের দল নির্বিঘ্ন কলকলীতে আহ্বান করে সন্ধ্যা—উদ্বোধন করে উষা! সকালের কুয়াশা মিলিয়ে যায় বেলা পড়লে!

• বড় বিচিত্র ভূগোল ভরেতবর্ষের ; বাংলার সীমান্ত অঞ্চলগুলোও বৈচিত্র্যে ভরা। দক্ষিণেই এর সমুদ্র আশ্লেষে বিরাট এক অরণ্য পটভূমিকা ; জোয়ারের জল ছুটে যায় দশ-বারো ফুট উঁচু হয়ে। চরাচর আচ্ছন্ন হয়ে আসে! জেগে ওঠে ক্রান্তীয় ঝড়ের দৌরাত্ম্য ; বনস্থল একনিমেষে লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে যায়। তপ:নিষ্ঠ সমুদ্রবন গভীর ঐকান্তিকতা আর সহনশীলতা নিয়ে ফল থেকে বীজ, বীজ থেকে অঙ্কুর বাঁচিয়ে, নিজেদের বহুগুণিত করে যায় যুগের পর যুগ ধরে।

রাজনগরের ষষ্ঠীপদ বাঁড়ুয্যে মশাই এর পড়াশুনো ছিল। তার মুখেই শুনেছি, খ্রীষ্টের দু'শ বছর আগে টলেমি গঙ্গাসাগর তীরে উল্লেখ করে গেছেন 'গঙ্গরিডি' নামক এক জাতির অস্তিত্বের কথা। শুধু তাই নয়, এই গঙ্গারিডিদের শৌর্য্যবীর্যের কথা উল্লেখ করেছেন প্রাচীন রোমক কবি ভালেরিয়াস ফ্লাক্কাস তার 'আর্গোনটিকা' কাব্যে। এরা পৌরাণিক বীর জ্যাশনের বিরুদ্ধে নাকি সমবেত হয়েছিল কৃষ্ণসাগরের তীরে। প্রত্নতাত্ত্বিকরা বিশ্বাস করেন, গঙ্গা উপত্যকার অধিবাসীদের

সম্বন্ধে গ্রীক-রোমকদের মধ্যে যে উপকথার সৃষ্টি হয়েছিল তাঁর থেকে অনেকখানি অনুমান করা যায় যে আজ থেকে দু'হাজার বছরেরও আগে ভাগীরথীর মোহনায় অনেক বিদেশী জাহাজ নোঙর করেছে। সমুদ্রপথে ভূমধ্য সাগরীয় অঞ্চল মিশর প্রভৃতির সঙ্গে এই পথে যোগা যোগ ছিল বাংলার! প্রত্নতাত্ত্বিকের কোদালের ঘায়ে জেলার অনেক অঞ্চল থেকে বেরিয়েছে পাথরের মসৃণ কুঠার হাতুড়ী ইত্যাদি— সেগুলো নিঃসংশয়ে মৌর্য্যপূর্ব যুগের সাক্ষ্য বহন করছে। অনেক কিছু আছে। প্রমাণ সাপেক্ষ হলেও, গঙ্গার ধারাপথে বহু বৈদেশিক তরণী আসা যাওয়া করেছে একদিন; তার সাক্ষীই ভাগীরথীর মোহনাপথ। গঙ্গার পশ্চিমকূলে তাম্রলিপ্ত তৎসন্নিহিত বাঁকুড়া, বীরভূম, বর্দ্ধমানের প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যে উদ্ঘাটিত পাণ্ডু রাজার ঢিবির ক্রীটান শীল— ভূমধ্যসাগরীয় মৃৎপাত্র ও লিপি,—এই সব তথ্যের কথা স্মরণ করে আমরা নিঃসন্দেহে প্রাগৈতিহাসিক কালের চব্বিশ পরগণা জেলার অন্তর্গত সমুদ্র বন্দরকে ভারতবর্ষের প্রবেশদ্বার হিসেবে কল্পনা করতে পারি।

যাক বলতে বলতে কোথায় চলে এসেছি। চব্বিশ পরগণা নয় —আমার বক্তব্য, দক্ষিণরায়ের রাজ্য। পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘের মত তার অরণ্য অঞ্চল। দুপুরের রোদে পিঠ পেতে বসে কখনও গল্প করি নীলমনি লক্ষণদের সঙ্গে; কখনও চুপ চাপ পড়ে থাকি মুখ গুঁজে। শীতের বিকেল আসন্ন হো'স আসে। ভাবি এখানকার মানুষদের কথা। যারা কালিন্দী মাতলা হরিণডাঙ্গার সর্পিল গতিপথ ধরে জীবিকার তাড়নায় মাইলের পর ।াইল পার হয় জীবনের মায়া ছেড়ে। এরা বন থেকে কেটে আনে হোগ্লা; কাঠুরে হয়ে ছোটে কাঠের সন্ধানে, মধু সংগ্রহ করে গাছে গাছে; ব্যাঘ্রাধিপতি বনদেবতা দক্ষিণ রায় তাই এদের পূজা পেয়ে আসছেন দিনের পর দিন। এতে জাতি নেই, ধর্ম নেই; দক্ষিণ ় সকলের।

নীলমনি একদিন রাতের বেলা বিস্তারিত গল্প করেছিল এই

দেবতাটির। বড়-খাঁ গাজীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়েছিলেন বাবা দক্ষিণরায়। তার পেছনে এক লাখ বাঘ চলেছিল সৈন্য হয়ে।

তাকে থামিয়ে দিয়ে বললুম; 'ও তো বই-এ অছে! তুমি কি দেখেছ, তাই বল।'

বুড়ো নীলমনি মাঝি তামাক খেতে খেতে ডালে কাঠি নাড়ে আর বলে, 'কত্তা, দেখলাম তো অনেকই! কত বলব!'

কত বলবে! সময় যেন আর কাটতে চায় না। নিঃস্তব্ধ রাতে অজানা অচেনা ভয়ে গা ছমছম করে। দূরের অন্ধকার বন ঝোপ দেখিয়ে অনন্ত আঙ্গুল তুলে বলে, 'উই হ্যাখ্‌চেন—ওখেনে ডাকাত আছে। চলন্ত নৌকার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তারা লুটে পুটে নিয়ে যায় যাত্রীদের সব কিছু!'

শেষ পর্য্যন্ত অভয় দিয়ে বলে, 'ভয় নাই! আমাদের বন্দুক আছে লৌকায়! আমাদের কিছু বলবে না।'

হয়ত ওই জন্যেই এখনও বলেনি কেউ কিছু।

জল জঙ্গলের প্রান্তে একে একে এই ভাবে কয়েকটা দিন কয়েকটা রাত কেটে গেল। কাদা গোলা নদীর জল ফুলে ফুলে যখন জোয়ার আসে, তখন নীলমণি নৌকা ছাড়ে। কখনও অনুকূলে পাল তোলে; কখনও বাতাসের বিরুদ্ধে কোণাকুনি চলে নৌকা। মাইলের পর মাইল গুণ টানতে টানতে ফিরতে হয় কখনও। বেশি রাতে চাঁদ ওঠে; ....লাখ লাখ তারার আলোর তলে হ্যারিকেনের মিটমিটে আলোয় কাঠের উনুনে ভাত ফুটছে। মাঝি আলুভাতের জন্যে পেঁয়াজ কুটছে তো কুটছেই।

গদার তাঁবেদারিতে ফিরে আবার আরম্ভ হল সেই পূর্ব পরিচিত জীবন। বিষয়, আশয়, ধান, চাল আর তুঁষের হিসেব নিকেশ।

এই অজ প্রান্তে কোথা থেকে যে এমন সুখাদ্যের আয়োজন করে গদার লোকেরা ভেবেই পাইনা! চর্ব চোষ্য লেহ্য পেয় কোনটা বাদ

নেই! বলি, 'বামুনের ছেলে গদা—তুই তো দারুণ লোভ দেখিয়ে দিলি। আবার কোনদিন এসে দাঁড়াবো হয়ত।'

গদা নিরুদ্বেগে বলে, 'থাক না চেপে। তুই তো পায়ে পাখনা বেঁধেচিস! যখন ইচ্ছে হবে এসে পড়বি।'

মাছের কাটা চুষতে চুষতে বলি, 'সে কথা বলতে! কিন্তু এবারে তো যেতে হয়!'

গদা বাজখাঁই গলায় বলল, 'চল আমার সঙ্গে চল। আমার যেতে হবে মহিষাদল! গিয়েচিস কোনদিন?'

ভাল কথা! মহিষাদল হোয়ে তমলুক দিয়ে চলে যাওয়া যাবে! চল! তারপর হঠাৎই মনে পড়ে গদাধরের মহিষাদলের ঠিকানা দিয়ে বাড়ীতে চিঠি লিখেছি! কোন চিঠিপত্র থাকলে রি-ডাইরেক্ট করে দেবে। অতএব যেতেই হবে মহিষাদল!

গদা ধমক দিয়ে বলল. 'তাড়াতাড়ির কি আছে। সবুর কর না। আচ্ছা কোরে তেল মালিশ করা রোদে শুয়ে!'

গদা ওই নিয়েই আছে বেশ। ঘণ্টা কতক ধরে এই জানুয়ারীর রোদে কি তেলই না মালিশ করাচ্ছে বুকে পিঠে। গঙ্গার ঘাটে মাড়োয়ারিরা লেংটি পরে অমন করে দেখেছি।'

বলি, 'হ্যাঁরে, তোর সারা শরীর যে লোম ফোড়া হয়ে বিষিয়ে যাবে।'

অফিসঘরের সামনে ব[illegible] কথা হচ্ছিল। হঠাৎ ঘরের মধ্যে থেকে আগের রাতে শোনা সেই রমনীকণ্ঠ কথা বলে উঠল, 'ছোটবাবুর কথা আর বলবেন না। ওইটেই ওর একমাত্তর সখ।' বলে খানিকক্ষণ হেঁ হেঁ হাসি।

আমার সারা শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠল,—কে এ মেয়েটি!

শবাসনের ভঙ্গীতে হাত পা ছড়িয়ে গদা শুয়ে আছে আর ষণ্ডামার্কা দুটো ওঁরাও জোয়ান গদার দেহটাকে কুস্তির আখড়ার মাটির মতন দলাই মলাই করছে। একসময় বিকৃত মুখ খানিকটা

সহজ করার চেষ্টা করে গদা বল্লে, 'তুস্ কিচ্ছু হবে না। করিয়ে দেখিস না—খিদে বাড়বে।'

করব কি! গদাকে দেখেই আমার অন্তরাত্মা আতঙ্কে মরছে। লোকটার হাতে পায়ে বুকে পেটে অত লোম। সত্যিই সরষের তেলে বিষিয়ে বেঘোরে একদিন মারা না যায়।

কিন্তু মরা তো দূরের কথা; গদা যখন খেতে বসে, এটা দাও, ওটা দাও, এটা করনি কেন, ওটা কোথায় গেল বলতো—মনে হত, সামনে একটা ছাগল চরতে দেখলে ও সেটার ওপরেও ঝাঁপিয়ে পড়ে ক্ষিদে মেটাবে! সত্যি, দলাই মলাই এর গুণ আছে বলতে হবে। কালো কষ্ঠিপাথরে গড়া বাবা ভোলানাথের মতন চেহারাটা নইলে এ দুঃখের বাজারেও নাদুস নুদুস রাখতে পারবে কেন।

ঘরের মধ্যে থেকে আবার পরিষ্কার মেয়েলি গলায় হেঁ হেঁ হাসির আওয়াজ। কিন্তু কে এ? গদার চোখের দিকে চোখ পড়তে ইঙ্গিতে জিজ্ঞেস করি, 'কে?'

নিরুদ্বেগে গদা ডাকল, 'ও জানা মশাই; একবার আসুন বাইরে। আমার বন্ধু আপনার সঙ্গে আলাপ করবে।'

মহিলার নাম জানা মশাই!

অনতিবিলম্বেই ঘর থেকে বাইরে পা দিয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রাণিপাত করতে তাকে দেখেই আমার চক্ষুস্থির। মহিলাটির গালে কাঁচাপাকা দাড়ি; সুপুষ্ট গোঁফ। কানের পাতায় থোকা থোকা চুল। কানে একটি পেন্সিল গোঁজা। গায়ে পাঁশুটে রংএর র‍্যাপারেব তল থেকেও ভুঁড়িটি পরিদৃশ্যমান।

জানা মশাই এর পরে আর কি করে অবাক করবেন? একে মনোহারিণী মহিলা ভেবে আমি গত রাতে কত রকম ভাবনাই না ভেবেছি। গদা তেল ডলাতে ডলাতে আলাপ করিয়ে দিল ম্যানেজাব মশাই-এর সঙ্গে।

অবাক কাণ্ড! পুরুষের গলা এমন মেয়েলীও হয়?

পরের দিন সকালে নামখানার ধানকল থেকে আমার চলে যাবার কথা ; গদা আগের রাতে ম্যানেজারবাবুকে সব কাজকর্ম বুঝিয়ে, নিজে কিছু বুঝে, যাবার প্রস্তুতি করে রেখেছে। এবারে আমার ঘরে এসে অন্যদিনের মত পর পর কয়েকটা সিগারেট না ফুঁকে বললে, 'আজ শুয়ে পড়া যাক, কি বল ?' তা'পরে নিজের ঘরে চলে গেল ! দরজাটা বন্ধ করে আলোর সুইচ তুলে আমিও মশারিতে ঢুকলাম।

কনকনে ঠাণ্ডা রাত বাইরে ; চাঁদের আলোয় যেন আরও ঠাণ্ডা মনে হচ্ছে বাইরের ওই চাতালটা। কান পর্য্যন্ত লেপ ঢাকা দিয়ে অন্নপূর্ণা রাইস মিলের রাতে আমি এইসব ভাবছি—ওদিকে গদাদেরই কলের ছিটে বেড়ার ঘরে ছোট ছোট ছেলে মেয়ে নিয়ে গরীব মজুরগুলো কেমন ভাবে রাত কাটাচ্ছে ; পাশের ঘর থেকে হঠাৎ গান ভেসে এল গদার মোটা ভাঙ্গা বেসুরো গলায়—'কে বিদেশী, মন উদাসী, বাঁশের বাঁশী বাজাও বনে !'

অত দুশ্চিন্তার মধ্যেও হেসে উঠলাম হো হো করে। গদা বেটা এখনও তেমনি ছোটই আছে ; বয়েস বাড়লে কি হবে।

পরের দিন সকালে স্নানাহার সেরে যথারীতি কম্বল-মোড়া পোঁটলাটাকে বগলে চেপে গদার সঙ্গে বেরিয়ে এলাম ধানকল থেকে। যাক ওটাকে একবারে খুলতেই হয়নি এখানে। যেমন বাঁধা তেমনিই আছে। অনেকে বিদায় দিতে এলো ঘাটে। সনাতন হাত থেকে বোঝাটা টেনে নিয়ে নামখানার বাসে তুলে দিয়ে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে হাসল। সামন্ত, অনন্ত, নটবর যে যেখানে ছিল কাছে এল। ওরা তো জানেনা, আমি ওদের চেয়ে কত বেশি কৃতজ্ঞ হয়েছি—কত বেশি কৃতার্থ হয়েছি অযাচিত এখানে ক'টা দিন কাটিয়ে যেতে পেরে।

এখান থেকে কাকদ্বীপ। কাকদ্বীপ ফেলে সোজা ডায়মণ্ডহারবার।

আমাদের নামতে হবে তারও পরে—সরিষা, রামকৃষ্ণ মিশনের কাছে। সেখানে বাস বদলে যাব নুরপুর গঙ্গার ঘাটে।

নুরপুরের ঘাটে এসে দেখা গেল ওপারে গেঁওখালির চর।

গদা বলল, 'দেকেচিস, ওপারেই আমাদের বাড়ী—মেদিনীপুর জেলা; গদাকে দেখে মনে হল যেন বাড়ীর কাছাকাছি পৌঁছে ও বেশ আনন্দে মশগুল হোয়ে পড়েছে। ঘাটে হু হু করা বাতাসে শীতের দুপুরের রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে গায়ে যেন শীত ধরে যায়। পারাপারের যাত্রী বিশেষ কেউ নেই। ষ্টীমারটা খানিক আগেই ঘাট খালি কোরে যাত্রী নিয়ে পাড়ি দিয়েছে। গদা মুখ ভাব বিরক্তিতে ভরিয়ে বলল, 'দুস্। কতক্ষণ বসে থাকতে হবে—কে জানে!' বলে পকেট থেকে সিগারেট বার কোরে সাবধানে দেশলাই জ্বালিয়ে মৌজ করে ধোঁয়া ছাড়ল; তারপর চাইল এদিক ওদিক।

দূর থেকে মাথায় কিছু চাপিয়ে কেউ যেন এদিকে আসছে! খানিকক্ষণ সেই দিকে তাকিয়ে থেকে গদা, হঠাৎ-ই লাফিয়ে উঠে বলল,—'ওরে দ্যাখ্, দ্যাখ্, কে আসছে।'

মাথায় মোট চাপিয়ে যে আসছে তাকে দেখে এমন নেচে উঠবার কি আছে আমার মাথায় ঢুকল না। ফ্যাল ফ্যাল করে গদার দিকে তাকালুম! গদা বললে, 'কোনদিন জনার নারকোল ছাপা খেয়েচিস!' বলে মুখভঙ্গী এমন করল যে দেখে বুঝতে একটুকু দেরী হলনা গদার এত উৎসাহ কেন!

হায় রে গদা!—মনে মনেই ভাবলুম,—বৃথাই তুই শার্জের পাঞ্জাবী আর কাশ্মীরি শাল চাপিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিস।

গদা তখন হাসছিল। ওর এই অল্প অল্প খুক খুক হাসিটা বোধ হয় ক্ষুধার উদ্রেক করে।

জনার্দ্দন ওর চেনা লোক; অতএব তার নারকেল ছাপা সন্দেশ তিন টাকার কিনে ত্বরিতে মুখের মধ্যে গোটা চারেক কোরে পুরে

দিয়ে একটা তৃপ্তিসূচক শব্দ করে আমার দিকে ঠোঙাটা এগিয়ে গদা বলল, 'ধর !'

আমি দেখছিলাম নদী ! সত্যিই শীতের দুপুরে আদিগন্ত সেই নির্জনতার রাজ্যে দিশেহারা করার মত বিস্তার সে নদীর। কোনদিকে কুল-কিনারা নেই যেন ধূ ধূ করা জলের প্রান্তরের।

ষ্টীমারে উঠে গদা হাঁটু পর্য্যন্ত কাপড় তুলে সামনের বেঞ্চিতে পা তুলে বসল। তখনও ও সমানে চিবুচ্ছে ; বলল, 'তুই মোটে চারখানা খেলি ? কি রে ? কোলকাতায় থেকে থেকে তোদের পেটের খোল ছোট্ট হয়ে গেছে।' বলে ঠোঙাটা জলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গদা সিগারেট ধরাল। এ পথে অনেক দিনের যাতায়াত ওর। অনেকের মুখই চেনা ! ইতিমধ্যে কার সঙ্গে ওয়াটার-বট্‌ল্ দেখে সেটাও নিঃশেষ করে দিল।

দূরে চোখ পড়ে হাওড়া জেলা।

কে বলে দেবে এটা অমুক—ওটা তমুক ! কে দেখিয়ে দেবে ওটা রূপনারায়ণ আর এটা ভাগীরথীর ধারা ! মধ্যেখানে হাওড়া জেলাকে ত্রিভুজের রূপ দিয়ে এখানে এসে দুজনে হাত ধরাধরি করে চলেছে সাগর অভিমুখে ! অখণ্ড অবসর আমার। মন এক নিমেষে ছন্ন ছাড়ার মত ছুটতে পারে। ওঃ, ভাবতেও অবাক লাগে—কোথায় দেখেছি গোমুখ গঙ্গোত্রীতে অগভীর বরফগলা জলে গঙ্গার উচ্ছ্বসিত উৎস তরঙ্গ। আর এখানে সেই শিশুটির এই রূপ ? এত বিরাট ?

পার হোতে আর কতটুকু সময়। গদা ইতিমধ্যে জোত-জমা ও চাষ আবাদের গল্প জুড়ে দিয়েছে। হাতের বইখানা চোখের সামনে মেলে ধরে, আমি জগদীশচন্দ্রের কথাগুলো যেন পড়ে যাচ্ছি। 'নদী তুমি কোথা হইতে আসিতেছ ? নদী বলিল, মহাদেবের জটা হইতে।'

হঠাৎ ছোঁ মেরে 'ওল্ড ম্যান এণ্ড দি সী' খানা কেড়ে নিয়ে গদা বলল, 'দুত্তোর ! কি ছাই-ভস্ম গিলচিস !'

ওর মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। বাধা গদাকে দেওয়া যাবে না! এর পরবর্তী দৃশ্য—আমার পিঠের ওপর গদার ফুলো ফুলো হাতের প্রীতির সজোর চপেটাঘাতটির অপেক্ষায় দম বন্ধ করে রইলাম।

গেঁওখাঁলির বাজারে চায়ের দোকানে ঢুকতে ঢুকতে গদা বলল, 'চল চা খাওয়া যাক। বাড়ী পৌঁছে আর একবার হয়ে যাবে।' বলে দোকানের বেঞ্চিতে বসে গদা কোন দ্বিধা না করেই বলল, 'দাও তো, দুটো চা আর দুটো দুটো ডিম!'

বৃথা বাধা দেওয়া গদাকে। মামলেট হবে না জেনে যে সেদ্ধ ডিমই খাবে—তাকে আমি নিরস্ত করব কি করে? চায়ে চুমুক দিয়ে গদা দার্শনিকের মত হঠাৎ একসময় বলল, 'হ্যাঁ র‍্যা—আমার দেখে কেমন মনে হল তোর?'

গদার গলার স্বর শুনে মনে হল,—এ যেন সে গদা নয়—যাকে এতদিন এত ঘনিষ্ঠ ভাবে দেখলাম! বললাম, 'কেন তুই তো দিব্যি আছিস আনন্দে? টাকার গদির ওপর বসে আছিস!'

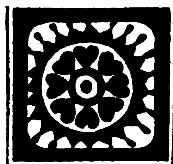
গদা বলল, 'দুস্, টাকা পয়সা বিষয় আশয় বড় খারাপ জিনিষ—জানিস! দু' দিন পরে শিঙ্গে ফুঁকলে দেখবি সব ফাঁকা। বাজে!'

আমি বলবার মত কোন উত্তর পেলাম না। আমাকে চুপ দেখে গদা বলল, 'যদ্দিন আছিস ফুর্তি করে যা। লেখপড়া শিখিনি তোদের মতন, তবে বলি, কাউকে নিয়ে মাথা ঘামাস নি বেশি! নিজেকে নিয়ে থাক—দুঃখু কষ্ট কম পাবি!'

গদার মধ্যেও দর্শন আছে! কথাগুলো তখনকার মত হেসে উড়িয়ে দিলুম বটে কিন্তু ওই কথাগুলো বোধহয় সারাজীবনই মনে থেকে যাবে।

বাস রুটে এসে ও বাস ধরল না। পাশাপাশি বসে সাইকেল রিক্সায় অনেকখানি রাস্তা পেরিয়ে আমি আর গদা চললাম বাড়ীর দিকে! একটাও কথা বলছে না ও! অবসন্ন শীতের বিকেল!

রোদ পড়ে গিয়ে ঠাণ্ডা রাতের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। র‍্যাপারখানা ভাল করে জড়িয়ে নিলাম গায়ে। গদাকে নিস্তব্ধ দেখে আমারই যেন কেমন লাগছে। গভীর দুঃখের মধ্যে হাবুডুবু খেতে খেতে ও যেন এইমাত্র জলের ওপর উঠে এসে হাঁফ ছাড়ছে।





চার

মহিষাদলে আমি গদাধরের আস্তানায় থাকতে পারিনি বেশিদিন ! খারাপ যে লেগেছিল—তা নয় ! গদাধরের শত কাজের মধ্যে আমার দেখাশোনার কথা সে এত গভীর ভাবে স্মরণে রেখেছিল—যে সেই আন্তরিকতাই বোধহয় আমাকে শেষ পর্যন্ত বিরক্ত কোরে ছাড়ল ! গদার মাকে ছোটবেলায় দু'একবার দেখেছিলুম ; কিন্তু এত কাল পরে চেহারা দেখে তাকে আর চেনবার উপায় নেই ! গত কয়েকবছর ধরেই মাকে গদারা তীর্থে পাঠাচ্ছে প্রতি বছর ; এদিকে খামার ধানজমি, মরাই একপাল গরু গোটাকত ছাগল, হাঁসের পরিচর্যা নিয়ে ভোর থেকে রাত পর্য্যন্ত চর্কিবাজীর মতন ঘুরপাক খাচ্ছেন তিনি। তাতেই তাঁর অসীম তৃপ্তি।

গদা বলে, 'বুড়ি তোমায় যে দাদা ফাসকেলাসে কোরে রামেশ্বর ঘুরিয়ে আনল—তা শেষ পর্য্যন্ত আবার যে কে সেই ?'

বুড়ি খড় কুচোচ্ছে, গোবর নেদি দিচ্ছে আর বলছে, 'থাম বাপু। তোদের মাতায় ভূত চেপেছে। ছাই পাঁশ রামেশ্বর !'

গদা হেসে বলে, 'দেকেচিস্ ; মা বুড়ী আমার ধম্ম টম্মও সব ওই গরু বাছুরদের পায়ে দিয়ে বসেছে !'

তবু ধর্ম আছে বুড়িমাসীর। আমাকে বামুন জেনে, কত আহ্লাদ! তারা নাকি অধস্তন জাত! তাদের ঘরে অন্নগ্রহণ করলে তাদের অপরাধ হবে; বুড়ি তাই দূরে বামুনদের বাড়ী থেকে আমার খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করলেন!

বলতুম, 'বুড়িমাসী পথের কুকুর বেড়াল, গরু বাছুরদের এত সেবা কর—আমি কি অপরাধ করলুম। তুটি ভাত খাব—তাও দেবেনা।' বলে মনে মনে হাসতুম।

একরকম বিরক্ত হোয়েই মহিষাদলের বাড়ী ছেড়েছিলুম ক'দিন পরে! কেবল শুয়ে বসে দিনের পর দিন কাটানো। গদা তু'দিন থেকে কি এক জরুরী কাজে চলে গেল বোলপুর কোর্টে; একা একা আমি আর ক'দ্দিন ভাত মারি!

তবু ঘুরতাম খুব; নতুন দেশ নতুন পরিবেশ! ছন্নছাড়া গৃহহারা নই যে বে-আইনী বেহিসাবী ঘুরবো। ক'দিনে বেশ তন্ন তন্ন করে দেখে নিলাম মহিষাদল!

গেঁওখালির ঘাট থেকে গদা আমাকে পাল্টে দিয়ে গেছে। মনে ভেবেও দেখেছি, সত্যি, কারও কথা ভেবে কাজ নেই! যা পাই নিজে খানিক কুড়িয়ে নি!

গঙ্গা-রূপনারায়ণের ওপর দিয়ে যেতে যেতে সেদিন মনে হয়েছিল, হয়ত এখানেই বন্দর ছিল একদিন! হয়ত এখানেই বিদেশী বাণিজ্যের পাল-তোলা জাহাজ সাত সমুদ্দুর তের নদী পেরিয়ে নোঙর করেছে একদিন। সপ্তম শতাব্দীর হিউয়েন শাং যাতায়াত করেছেন এই পথে—এমনি কত কথা। রোমাঞ্চকর রূপকথার মত সব। কিন্তু ওই বিরাট বক্ষের বিস্তৃতি দেখে সঙ্গে সঙ্গে ভেবেছি, কোন্ প্রত্নতাত্ত্বিক হলপ কোরে বলতে পারবে সে কথা; কি নিদর্শন দেখে বলবে! এখানে আবহমান কালের অনন্ত স্রোত বহে চলেছে।

লোনা জল, পলিস্তর, প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় বন্যাস্রোত এসবের হাত থেকে সেই প্রাচীন বন্দরের লুপ্ত স্মৃতিকে বাঁচাবে কে? গোটা ইতিহাসটাই প্রক্ষিপ্ত হতে হতে শেষে পুরাণ না হয়ে যায়।

ফিরে এসেছি মহিষাদল রাজবাড়ীতে!

মহিষাদল নয়—মেদিনীপুরের ইতিহাসই যেন রাজকাহিনীর! খণ্ড বিচ্ছিন্ন কত রাজার অস্তিত্ব যে এই মেদিনীপুরে বিগত কটা শতকের মধ্যে অতীত থেকে বর্তমান পর্য্যন্ত রয়ে গিয়েছে—ভাবলে অবাক হতে হয়! অনেকখানি ভূমি অধিকার করতে করতে একদিন তমলুক মহকুমার অন্তর্গত ৩২৩ বর্গমাইল পরিমিত ভূখণ্ড জুড়ে মহিষাদল রাজবংশের বিস্তৃতি ছিল। ইতিহাস যতটুকু শোনা যায়,—পাঠান মোগল যুগের বাংলার বাইরে থেকে কোন কোন সৈনিক, কখনও বা বণিক বাংলায় এসেছিলেন। তারপর ইতিহাসের বিবর্তনে একদিন তারাই তলোয়ারের জোরে অথবা অর্থকৌলীন্যে রাজার সাজে সেজে সিংহাসনে বসে রাজা হতেন। পাঠান মোগল যুগ সন্ধিক্ষণে ষোড়শ শতাব্দীর সুরুতে মহিষাদলে তেমন একটি রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। উত্তরপ্রদেশের এক ব্রাহ্মণকুমার জনার্দন উপাধ্যায় সে যুগে বাণিজ্যে এসেছিলেন এ মুলুকে! তারপর স্থানীয় জমিদার কল্যাণ রায়চৌধুরীকে পরাভূত করে বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ড রূপে দেখা দিয়েছিল।

প্রবলপ্রতাপান্বিত মহামহিম রাজা ছিলেন জনার্দন উপাধ্যায়। রাজবাড়ীর কোষাগারে তার প্রমাণ স্বরূপ বৈরামখাঁর নামাঙ্কিত তরবারী, বিচিত্র 'সাহনামা' গ্রন্থের কপি এখনও আছে! বিদেশী কার্পেটে মোড়া, ঝাড়লণ্ঠন ঝোলান মহলের পর মহল, অদূরে গেঁওখালির কাছে মীরপুরে রাজাদের আনানো ওলন্দাজ বাহিনীর পরিবার—এসব দেখে বিশ্বাস দৃঢ়তর হয় যে 'এক যে ছিল রাজার' উপকথার মত এ রাজা কোন অতিবিস্মৃত রূপকথার রাজা ছিলেন না।

ষোড়শ শতাব্দীর কথা খুব পুরাতন নয়। দিল্লীর বাদশাহের

অনুগ্রহপুষ্ট এই রাজপরিবার বহুদিন পর্য্যন্ত বংশপরম্পরায় প্রজানুরঞ্জক এবং বীর্যবান রাজা হিসেবে শাসন করে গিয়েছেন। এই ইতিহাসটুকু আজ আর ধূলি ধূসর পুঁথিপত্রের তলে চাপা পড়ে নেই! দুর্জন, রামশরণ, রাজারাম, শুকলাল, আনন্দলাল ও স্ত্রী জানকী দেবী রাজত্ব করেছেন পরবর্তী কালে। যখন—

'মারহাট্টায় কাট্টা কুট্যা লুটা পুট্যা খায়।
মায়ের মত জানকী দেবী বাঁচায় সেই দায়॥'

এই প্রতাপান্বিতা রাণী জানকী দেবীর ১৮০৪ সালে মৃত্যুর পর এই চলমান রাজবংশের ইতিহাসে কিছুটা গরমিল দেখা দেয়। রাণী ছিলেন সন্তানহীনা। অতএব পোষ্যপুত্রের অধিকার নিয়ে অসন্তোষে অনেকদিন মামলা মোকদ্দমায় অতিবাহিত হয়। ১৮৫২ সালের 'মেমরেণ্ডা অফ্ মিদ্‌নাপুরে' তৎকালীন কালেকটর এইচ, ভি, বেলের লেখা ইতিহাসে একটি নাটকীয় কাহিনী আছে এই রাজত্ব নিয়ে। ঘটনাটি এই; রাণী জানকীর ইচ্ছানুসারে তার দত্তক পুত্র হিসেবে মতিলাল পারাকে রাজ্যভার দেওয়ার কথা। কিন্তু দেওয়ান তা' চাইলেন না; একদা তার অনুপস্থিতির সুযোগে দেওয়ান ভবানীপ্রসাদ ও কালীপ্রসাদ গর্গকে নিয়ে এলেন সিংহাসনে বসাবেন বলে। মতিলাল প্রতিবাদ জানালেন; মামলা গড়াল প্রিভি কাউন্সিল অবধি। ইতিমধ্যে দলিল, দস্তাবেজ, টাইটেল ডীড্ সমেত খিদিরপুরের গঙ্গায় মতিলালকে ফেলে দেওয়া হল বজরা থেকে। টাইটেল ডীড্ খোয়া গেল। অতঃপর ভবানীপ্রসাদের ছোট ভাই জগন্নাথ গর্গ রাজা খেতাব পেলেন। দেওয়ান মারা গেলেন এই ধরণের জঘন্যতম কাজ করতে করতে। তাঁর ছেলেকে হুগলী নদীতে ডুবিয়ে মারা হল এবং অসৎ উপায়ে অর্জিত রাজস্বের ভাগীদার হিসেবে তার বিধবা স্ত্রী জগন্নাথের ভ্রাতৃবধূকে বিক্রী করে দিলেন। সেই ভ্রাতৃবধূ ইন্দ্রানী দেবীও আগড়পাড়ার গঙ্গার ধারে জ্বলন্ত চিতায় জীবন বিসর্জন দিয়েছিলেন। পরবর্তী দত্তক পুত্র এলেন লছমনপ্রসাদ গর্গ। তারপর বংশপরম্পরায় রাজা হলেন তস্য পুত্রেরা।

নতুন কিছু নয়। সব রাজপ্রসাদের ভিত্তি প্রস্তরই এমন সব বিষয় আসক্তির কাহিনীতে খোদিত। কিন্তু একদিন দুপুর রোদে ঘুরতে ঘুরতে সাইকেল রিক্সা অনেক খানি পথ পেরিয়ে আমায় নিয়ে এল দেউড়িতে। খাঁ খাঁ করছে চারিদিক। কেউ কোথাও নেই। গাছ-গাছালীর মধ্যে নাম-না-জানা পাখীর একঘেয়ে অকারণ ডাক। অনেক ডাকাডাকিতে পাহারাদার এসে নিয়ে গিয়েছিল রাজ উদ্যান পেরিয়ে, মার্বেল সিঁড়ি অতিক্রম করিয়ে ওপরের বারান্দায়। সারবন্দী গোটা তিনেক কামান। অতীত সামন্ততন্ত্রের স্বর্ণপ্রভার নীরব সাক্ষী। বন্দুকধারী শান্ত্রী এগিয়ে এলো। বসাল, দেখাল, শোনাল! রাজাদের শিকারলব্ধ বন্য প্রাণীদের প্রদর্শনী-গৃহ। মনে মনে ভাবি, হায়রে। সব আছে, কেবল মানুষই নেই! থাকলেই হত; শুনেছি এখানে ভবানী প্রসাদের আমলেই ভবানীতলায় জীবন্ত নরবলি হয়েছে!

ভৌগলিক বলে, বরোজ সাহেবের আঁকা ম্যাপে দেখা যায়—ছোট্ট একটা দ্বীপের মত ভূখণ্ড সুতাহাটা, মহিষাদল (আজকের হলদিয়া বন্দর কোন অতলে ঘুমচ্ছে) একেবারে সমুদ্রের মধ্যে থেকে পিঠখানা ভাসিয়ে উঠেছে। সেই মহিষাদলের চেহারার আদলটা নাকি মহিষের মত বলে, জায়গাটার নামই হয়ে গেল মহিষাদল; সে যাই হোক, সংস্কৃতি বিজ্ঞানী বিনয় ঘোষের বক্তব্য, এ সমস্ত অঞ্চলের মাহিষ্য জাতি প্রাধান্যই এ নামের কারণ!

পুরাতন রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করলাম কাঠের এক বিরাট সিংদরজার মধ্যে কাটা গর্ত দিয়ে। জনশূন্য পথ সামনে। শেষ হয়েছে সম্ভবতঃ নহবৎ-খানার সামনে। নীচে আয়ুর্বেদ ভবন। রাজপ্রাসাদ —অতএব বিনা অনুমতিতে অন্দরে প্রবেশ করা যাবে না। ডান দিকে ছায়া ঢাকা দীঘির ধার ধরে খানিক এগোলে নজরে পড়ে সুদৃশ্য এক নবরত্ন মন্দির; রাণী জানকী দেবী প্রতিষ্ঠিত ১৮০০ সালের গোপাল জীউয়ের মন্দির। সামনে দুদিকে দুই শিবের মন্দির। শ্রীকৃষ্ণ শিব

একসঙ্গে। এ ছাড়াও আছে রাজাদের গৃহ দেবতা রামজীউয়ের মন্দির। হনুমান, লক্ষণ, সীতা তো আছেনই সেখানে—উপরন্তু বিরাজ করেছেন জগন্নাথ সুভদ্রা। দেবতার জাতিভেদ হয় না ; কিন্তু স্থান কাল ভেদে তাদের রূপের বিভেদ হয়! উপরন্তু এটাও হয়। বোধ হয় প্রভাবেই হয়। হিন্দু প্রভাবে কালক্রমে বৌদ্ধ দেবতা ধর্মরাজ হন ; আদিবাসীদের দেবতা পূজা করেন হিন্দুললনা ;—বোধহয় সেই প্রভাবেই উড়িষ্যার ঘনিষ্ঠতায় মহিষাদলের উত্তরভারতীয় রাজার ঘরে জগন্নাথদেবের ঠাঁই হয়ে গেছে।

কৃষ্ণচূড়ার গাছের আড়ালে তখনও সেই অচেনা পাখীটা অচেনা গলায় ডাকছে ; বাঁধানো ঘাট ছায়ায় ঢাকা। শীতকালের দিন, এখানে বসবার কথা নয়। কিন্তু কি যে মনে হল, বসে পড়লাম। আবার তো যেতে হবে।

বসে বসে সন্ধ্যে হোয়ে আসে ;

রিক্সাওলাকে অতক্ষণ আটকে রাখা ঠিক নয়। ছেড়ে দিলাম। আরও খানিক পরে বাঁধানো ঘাট ছেড়ে বেরিয়ে এলাম পায়ে পায়ে। আবার গিয়ে উঠতে হবে গদাদের বাড়ী ; গদা নিজে নেই ; মার তদারকিতে আমাকে ছেড়ে দিয়ে নিজের কাজে চলে গেছে। কবে আসবে জানিনা! এদিকে ওপরের দক্ষিণমুখী দোতলার ঘরটাতে এক গলা বিছানার মধ্যে অবসর যাপন করতে করতে আমি ভেতবে ভেতরে ক্লান্ত! একটা মন বলে, সইবে কেন এই নির্বিঘ্ন অবসর! অন্য মনটা বেঁকে বসে একগুঁয়ে ছেলের মতন—যাবই।

পরের দিনের ভোর বেলা বুড়িমাসীকে বলি, 'বুড়িমাসী, এবার যে যেতে হবে!'

বুড়িমাসী গরুর জাব মাখতে মাখতে একবারে লাফিয়ে উঠল।—'বলিস কি রে! গদা যে আমায় বকবে বাবা! বলেছে, সে ফিরলে তবে যেতে!'

ম্লান হেসে বলি, 'না, তার দরকার নেই। সময় পেলে আবার আসবো—তাকে বলে দিও ;'

জামাকাপড় পরে প্রস্তুত হয়েই ছিলাম! এবার ঘরে গিয়ে বিছানার বাণ্ডিলটা তুলে নিয়ে বেরিয়ে এলাম। বুড়িমাসী অনেক সময় নিজে নিজেই কথা বলে—এখনও বলে যাচ্ছে অনেক কথা—। মঙ্গলা গাই, মধু ছাগল, এদের সঙ্গেই বুড়িমাসী কথা বলে যায় অনর্গল! এখন ওদিকে কান দিলে চলবে না।

মহিষাদলের বাসে উঠে বসতে বাস ছাড়ল। কোথায় এখন যাচ্ছি তারও স্থিরতা নেই ; মহিষাদলের ঠিকানায় বাড়ীতে চিঠি লেখা ছিল বটে কিন্তু কোন চিঠি নেই। কে দেবে? কার বা প্রয়োজন আছে আমাকে? আসবার আগে দেখে এসেছি বাড়ীতে মা অসুস্থ্য। কথা ছিল একটু সুস্থ্য হ'লে ক'দিনের জন্যে ঝাড়গ্রাম আসবেন। কিন্তু আমি কোথা যাচ্ছি? কণ্ডাকটর টিকিট চাইতে যেন সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। একবারে নিশ্চিন্ত হয়ে বলে বসলাম, 'তমলুক।' তমলুক বাজারে নেমে গেলাম শেষে। গুটি গুটি পায়ে একসময় একটা হোটেলেও এসে উঠলাম।

তমলুক অনেকবার যাতায়াত করেছি আমি। কারণে অকারণে অনেকবার তমলুক আমাকে আকর্ষণ করেছে। একবার মহিষদলে রথের মেলায় আসতে তমলুক থেকে বাস ধরে ফুলবেড়ে গ্রামে যেতে বর্ষার রাতে কি নাকালই না হয়ে ছিলাম মনে আছে। রাতের শেষ বাসে ভিড়ে উঠতে পারলাম না। অত রাতে অজানা অচেনা ফুলবেড়ের হাফিজ মিঞার বাড়ী কেমন করে যাব—তাও জানা নেই। হাফিজ জানতো আসব। অসুবিধে হবে না বলে, সঙ্গে লোক দিয়ে ছিল পথ দেখাবার। এমনই অদৃষ্ট, মেচেদা ষ্টেশনে সে লোকটাকে কোথা হারিয়ে ফেললাম! তার কাছেই যতটুকু পথের বর্ণনা শোনা ; তাই ভরসা করেই অন্ধকার রাতে পাড়ি দেওয়া। রাত সাড়ে দশটায় কেমন করে

ঝিম্ ঝিম্ বৃষ্টির মধ্যে দেড় মাইল কাদার রাস্তায় হাবুডুবু খেতে খেতে তার বাড়ী পৌঁচেছিলাম, সে এক রোমাঞ্চকর গল্প! অনেক কথা!

তাই বলছি, তমলুক আমাকে নানা ভাবে আকর্ষণ করেছে। আজকের আকর্ষণও তেমনি!

ইতিহাসের ব্রাহ্মমুহূর্তে মেদিনীপুরের এই সব অঞ্চল কৈবর্ত্যদের প্রবল প্রতাপের স্বাক্ষর রেখে গেছে। শুধু সমুদ্রতীরের এই অঞ্চলগুলোই নয়; আমার মনে হয়েছে ইতিহাসের প্রথম যুগে দানবীয় ঔদ্ধত্যে ও শাসনে মানভূম বীরভূম সিংভূম মল্লভূম সাঁওতাল পরগণা জুড়ে এই ধরণের আদিবাসী, আদি অষ্ট্রালয়েড্ গোষ্ঠী, কৈবর্ত্য ধীবর-শ্রেণীর মানুষের আধিপত্য বিস্তৃত ছিল। আজ তার ইতিহাসই আছে শুধু। কে জানে কোথায় গেছে আটবর্গ মাইল পরিমিত পরিখা ঘেরা সেদিনের দূর্ভেদ্য প্রাচীরের মধ্যে কৈবর্ত্যরাজার প্রাসাদ। কে জানে কোথায় আছে বৌদ্ধবাঙ্গলার সেই তাম্রলিপ্ত—ফা হিয়েনের ভাষায় তান-মো-লি-টি যার নাম?

আদিবাসী প্রভাবিত ও অধ্যুষিত এই সব এলাকা একদিন রাজা অশোকের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। অশোকের কালেই তাম্রলিপ্তের খ্যাতি বেড়েছিল বঙ্গোপসাগরের এক বিখ্যাত বন্দর হিসেবে; ফা-হিয়েনের বৃত্তান্তের বিরাট এই বন্দর নগর, অট্টালিকা, বিপণি ও আলোকমালায় সাজা না তাম্রলিপ্ত কালস্রোতে কোথায় হারিয়ে গেছে। কিন্তু সেকি কালস্রোত শুধু? শত শত বছর আগে কি রূপনারায়ণ আর গতিপথ পরিবর্তন করে প্রাচীন তাম্রলিপ্তকে ভাসিয়ে নিয়ে যায় নি?

মিত্রগুপ্তের 'দশকুমার চরিতে' তাম্রলিপ্তকে সমুদ্র উপকূলবর্তী এবং গঙ্গা থেকে বহুদূরে অবস্থিত এক বাণিজ্য-কেন্দ্র বলে বর্ণনা করা আছে। সে বর্ণনা ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগের। তারপর? তারপর কিছু নেই! তারপরেই বোধহয় সকল সমৃদ্ধি ধুয়ে মুছে দিয়ে

গেছে রূপনারায়ণের স্রোত। কত কি ঘটে গেছে! হতেও পারে, রাজনৈতিক আবর্তের মধ্যে পড়ে উড়িষ্যার 'গঙ্গ' রাজাদের যুদ্ধক্ষেত্র তাম্রলিপ্ত, তার প্রাচীনতার নিদর্শনগুলো হারিয়ে ফেলছে। নইলে কোথায় গেল রাজা অশোকের নির্মিত বৌদ্ধ স্তূপগুলো! তার সংখ্যাও তো শুনি পঁচিশটারও বেশি।

পড়ে আছে শুধু প্রাচীনতম দলিলের মত তমলুকের আজ বর্গভীমার মন্দির। অনেকখানি জায়গা জুড়ে মন্দিরটি; রাজপথ থেকে অনেকটা ওপরে। অন্তত ত্রিশ ফুট হবে। 'ষ্টাটিষ্টিক্যাল ইনিষ্টিটিউট অব বেঙ্গলে' হাণ্টার সাহেবের গবেষণা পড়ে বলছি,—মন্দিরটি এত উঁচুতে নির্মাণ করা হয়েছিল কেবল সার সার গাছের গুঁড়ি সাজিয়ে। তার ওপরে চাপানো হয়েছে ইঁট, পাথর, মাটি। ন'ফুট গভীর করে গাঁথা ভিতের ওপর মন্দিরের দেওয়ালগুলি উঠেছে ষাট ফুট উঁচু অবধি। বৃহদাকার গোলাকার পাথরে মন্দিরটির মাথা ঢাকা। হাণ্টার সাহেব আশ্চর্য্য হয়েছেন, কেমন করে অত উঁচুতে সে যুগে বিরাট এই পাথর খণ্ডটি তোলা সম্ভব হয়েছে।

মন্দিরটি তারা দেবীর। চূড়ায় কিন্তু বিষ্ণুর পবিত্র চক্রটি শোভা পাচ্ছে!

উড়িষ্যা মন্দিরের গঠনরীতির সঙ্গে এ মন্দিরের মিল আছে। সেই নাটমন্দির, ভোগমণ্ডপ জগমোহন আর বড়-দেউল। বাইশটা সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে নহবৎখানা।

দেবী উগ্রতারা। একটি সম্পূর্ণ পাথরের ওপর রিলিফ পদ্ধতিতে খোদাই করা মূর্তি। পদতলে লুণ্ঠিত শিব। দেবীর চার হাতে ত্রিশূল তরবারি, করোটি ও দস্যুর ছিন্ন মুণ্ড; একই আসনে আরও দুটি মূর্তি আছে;—শিব আর মহিষাসুরমর্দিনী দশভূজা। অতি জাগ্রতা দেবী। সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা, নিম্নবঙ্গ লুঠ করার সময় মারাঠা দস্যুরা পর্য্যন্ত মন্দির স্পর্শ করতে সাহস পায়নি। বরং বহুমূল্য অলঙ্কার রাশি উৎসর্গ করে যেত দেবীর পায়ে।

যাক সে কথা। আজ সব কাহিনী গুলোই রূপকথা হয়ে গেছে। তমলুক কেন, নিরবধি কালস্রোতে পৃথিবীর কত লক্ষ কথা আর কাহিনীই লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। প্রতিদিন পুরাতন যাচ্ছে; নতুন এসে বসছে তার জায়গা দখল করে। কিন্তু কোথায় যাচ্ছে তারা? আছে কি ওই শত-শতাব্দী প্রাচীন বঙ্গোপসাগরের উচ্ছ্বসিত জলকল্লোলের মধ্যে ঘুমিয়ে?

কে জানে, 'আমি কোথায় পাবো তারে···'

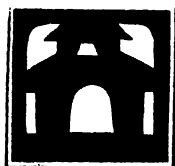
মনে মনে ওই একই কথা কেবল গুঞ্জন করে ফেরে,—'তার বসত কোথায় না জেনে তায় গগন কেঁদে মরে।'

তমলুকের হোটেলের একান্তে দোতলার ঘরে তখন আমার আস্তানা। নড়বড়ে একখানা তক্তাপোষের কাঠে পাতা দু'খানা কম্বল আমার সঙ্গী; রবারের একখানা মাথার বালিশ শোবার সময় অনেকক্ষণ দম খরচ করে হাওয়া ভরে নি। এই তখন নিত্য দিনের কাজ: এই পারিপাট্যহীন সংকোচন যে এতদূর বেদনাদায়ক হবে কল্পনাই করিনি। গত মাসাধিক কাল পরের আস্তানায় তুলোর গদীর উষ্ণতা আর আরামে থেকে ভাবতে হয়নি তমলুকের হোটেলে মাত্র চারটে দিনের জীবন এমন দুঃসহ বোঝা হয়ে দাঁড়াবে। নিজেই নিজেকে ধিক্কার দিই। নিজেকে বোঝাবার চেষ্টা করি এটুকু দুঃখ দুঃখই নয়! মনে মনে সংকল্প করে ঘর থেকে বেরবার কথা স্মরণ করি। কিন্তু হবে কি, বিধি বাম!

ভোর না হতেই ঘুম ভেঙ্গে গেল হোটেলের ঘরে।

একে অনেক রাত অবধি জেগে কেটেছে শীতের উপযুক্ত আচ্ছাদনের অভাবে; ভেবেছিলাম বেলা পর্য্যন্ত ঘুমিয়ে পুষিয়ে নেব; কিন্তু হল কি। হাওয়া-পোরা বালিশটা কখন নিঃশ্বাস মুক্ত করে মুক্ত-পুরুষ হয়ে গেছে! এই আরামের শয্যাতলে কারও পক্ষেই ঘুমোন অসম্ভব। এর ওপর আমকাঠের তক্তার বারোয়ারী পাটাতন পেতে

কর্ত্তামশাই যে ছারপোকা পুষেছেন—সেখানে ঘুমব কি! নিদ্রাদেবীর সঙ্গে অসিযুদ্ধ করতে ইচ্ছে করছে। অতএব বিনা বাক্যব্যয়ে সেই মুহূর্ত্তেই মশারি খুলে কম্বল ভাঁজ করতে লেগে গেলাম; এখানে কোনরকমে নাক কান বুঁজে চা গ্রহণ চলতেও পারে। অন্নগ্রহণ





পাঁচ

সতিই সেদিন ঝাড়গ্রামের রেবেকাদের বাড়ীতে ভরদুপুর বেলা হাজির হয়ে গেলুম আমি! কি জানি কে টেনে আনল, পৌছে দেখি রেবেকা তো আছেই—মা-ও হাজির। দু'জনের মিলিয়ে এক হাজার প্রশ্ন।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললাম, 'রেবেকা, চা কর।'

এই ঝাড়গ্রামের দিনগুলো ফাল্গুনের আবেশে বেশ মন্থর কেটেও গেল।

বেলপাহাড়ীর বাস ধরে সাঁওতাল গ্রামে ঘুরে, কোনদিন বা অকারণে পার্শেল ট্রেনে চেপে ঘাটশিলার সুবর্ণরেখার ওপর দিয়ে 'কপার করপোরেশনে'র লরীতে মোসাবনি মাইনের পথ ধরতুম ওদের গেষ্ট হাউস থেকে। নিস্তেজ নিস্তরঙ্গ দুপুর কেটে যেত সুবর্ণরেখার

বালির চড়ায় দাঁড়িয়ে বৌদ্ধ মৃতদেহ সৎকার দেখতে দেখতে। লোকে বলে, ওদের মৃত্যুর তিনদিন পরে নাকি দাহ করা হয় ; হবেও বা। দুপুর রোদে ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে তাই দেখি। বৌদ্ধ লামা বিরাট একটা ঘন্টা বাজাতে বাজাতে বালির উপর উবু হয়ে বসে মন্ত্র পড়ে চলেছে! বাঁশের কাঠামোর চারপাশে রঙীন কাপড়ে জড়িয়ে মৃত দেহটি নিয়ে এসে একপাশে রেখেছে শববাহকেরা। আশ্চর্য্য! মানুষটিকে নাকি তার মধ্যে বসিয়েই এনেছে।

নতুনদিদির কেরাসিনের আলো জ্বলা ঘরে বসে মা আর রেবেকা শুনে অবাক। বলে, 'ওমা সেকি কথা। তিন্‌দিনের বাসি মড়া ; তায় আবার বসিয়ে?'

বলি, 'আর কি হবে? যে দেশে যেমন আচার।'

এখানে সেখানে ঘুরে আসি। ঢেঁকিছাটা চালের ভাত যাই ; দড়ির খাটিয়ার ওপর শুয়ে রাত কেটে যায়। আর দিনের বেলা চিৎ হয়ে শুয়ে যখনই মনে হয়, আমি কত বেকার, তখনই আবার কোথাও পালিয়ে বাঁচি।

সেখান থেকেই বোধ হয় একদিন গিয়েছিলাম কুলটিকরী। বোধ হয় দীঘা থেকেই ফিরবার পথে কণ্টাই রোড ষ্টেশন দিয়েই। সাবিত্রী ট্রান্সপোর্ট কোম্পানীর বাসের ললাটে কুলটিকরী নামটা দেখেই লাফিয়ে নেমে পড়লাম বাস থেকে! বাঃ বেশ চেনা-চেনা নাম তো। সঙ্গে সঙ্গে সিংহরায়ের মুখখানি মনে পড়ে গেল।—'দাদা যাবেন একদিন। কুলটিকরীর বাসে বসে বলবেন, রাজ বাড়ী যাব! ব্যস—।'

রাজবাড়ী নয় সেই সিংহরায়ই টেনে নিয়ে গেল কুলটিকরী।

বড় বড় টানা টানা চোখ, চুলে ভাঁজ ভাঁজ কেয়ারী ; উজ্জ্বল কাঞ্চন রং-এ আভিজাত্যের ছাপ—কথার আগে হাসি, মধ্যে হাসি ও শেষে হাসি সিংহরায়ের। নিঃশব্দ হাসির গমকে গমকে সারা

শরীর হাসিতে নাচে। সব শুদ্ধু মিলিয়ে মনোহর কান্তি সিংহরায় যেন ময়ূরে-চড়া কার্তিকটি। বলেছিল, 'দাদা সত্যি বাঁচিয়েছেন।'

কারণ একটা আছে। কলকাতায় শ্বশুরবাড়ীতে সিংহরায়ের আসা যাওয়ার সূত্রে কোন সম্ভাব্য সিনেমা ডিরেকটরবেশী এক রক্ত-চোষা ভাম্পায়ার জাতীয় ভদ্রলোক এই কার্তিককে সংস্কৃতিচর্চায় কিছু ঢেলে তার সম্ভাব্য নায়কের কল্পিত পদটি গ্রহণ করতে অনুরোধ করেন। গ্রাম্য অর্থবান যুবক। ডিরেকটরের টোপ সকৃতজ্ঞ চিত্তে গিলে মেদিনীপুরের জমিদারীর একমাত্র উত্তরাধিকারী হিসেবে সিনেমা ব্যবসায়ে আত্মদানের সংকল্প করেছে। সেই সময় আলাপ মাত্র কয়েক দিনের। সেদিন ডিরেকটরের হাত থেকে উদ্ধার কোরে তাকে তার স্ত্রী, সন্তান, বিধবা মার কাছে পাঠিয়ে দিতে পেরে মনে মনে গর্বিত হয়েছিলাম। পরে এক চিঠিতেও জানিয়েছিল, 'দাদা সত্যি বাঁচিয়েছেন। এখানে নিশ্চয় আসবেন। বাসে বসে বলবেন—।' এখন মনে পড়ল বড় বড় চোখ আর থলথলে নাহুস নুহুস শরীরটা নাচিয়ে সিংহরায় হেসে বলছে—'যাবেন।' সে কথা রাখতেই একটা দিনের জন্যে এসেছিলাম।

জমিদারের গৃহদেবতা বোধ হয় মা ভবানী। তাঁরই পূজা সেদিন রাতে! প্রায়ান্ধকার অঙ্গন পেরিয়ে জমিদার নন্দনের দর্শন পেতে পেতে ঘণ্টা খানেক কেটে গেল; তারপর বেরিয়ে এলেন সিংহরায় মশাই নিজে। গলায় রুদ্রাক্ষ, কপালে ত্রিপুণ্ড্রক, পরণে লাল চেলির জোড়।—একেবারে অচেনা ব্যক্তি:ত্বর ভদ্রলোক; পরিচয় দেবার পরে আমাকে চিনতে বেশ খানিক সময় লাগল তার! পরে যখন চিনলেন, তখন ক্ষুধায় ক্লান্ত অবসন্ন আমি ফিরে যাবার কথা চিন্তা করছি! আর মনে মনে হা-হুতাশ করছি। কিন্তু উপায় নেই—বাস বন্ধ।

রাত্রি তৃতীয় প্রহরে মা ভবানীর প্রসাদ বিতরণ। তখন কাছারী বাড়ীর মেটে দাওয়ায় কম্বল বিছিয়ে শুয়ে ক্ষুধার্ত মশার সঙ্গে অন্ধকারে

অদৃশ্য বক্সিং লড়ছি। আহার হল তারপর। জমিদার নন্দন আরও পরে আমাকে নিয়ে মার মন্দির, জমিদার বাড়ীর অন্দর মহল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাতে ছাড়লেন না তাদের অতীত কালের বৈভব।

এর পরেও মজা আছে!···

মশারী না থাকায় আমাকে বিব্রত দেখে নায়েব মশাই এর বোধ করি দয়া উপজিল। তিনি বিরাট টেবিল-পাতা ছোট অফিস ঘরে আমায় পুরে দিয়ে—দরজা জানালা বন্ধ করে দিলেন। টেবিলের ওপরটা পরিষ্কার করে শোয়ালেন তার ওপর। তারপর একটা মাটির সরাতে কতকগুলো ঘুঁটে পুড়িয়ে রাশি রাশি ধোঁয়া করে রেখে গেলেন বন্ধ ঘরে।

বিশেষ কিছু অসুবিধে হয়নি। ঘরের বাইরে দাওয়ায় বসে বসে চোখের সামনে ভোর হয়ে এল। কোনরকম কালক্ষেপ না করে কম্বলটা ভাঁজ করে নিজেই বেরিয়ে পড়লাম বাস রাস্তায়।

আজ সেই সরল, সহজ সুপ্রভাত সিংহরায়ের কথা ম্যাট্রিক ক্লাসে পড়া ক্যাপ্টেন বুম্‌গার্টেনের গল্পটা মনে করিয়ে দিচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে ভাবি, কিন্তু আমি তো সিনেমা-ডিরেকটর কালিসাধন বাবু নই। তবে আমার ওপর ওর এত আক্রোশ কেন? নাকি, এটাও একটা গ্রাম্য সারল্যের সহজ প্রকাশ।

কাহিনীর পর কাহিনী।···

নিজে নিজেই অবাক হোয়ে যাই! রাত একটা বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্যে কাটল। আবার ফিরতি পথে আর এক নতুন অভিজ্ঞতা।....

চলেছি ঝাড়গ্রামের পথে। সকালের প্রথম বাস। যাত্রীর ভিড় তেমন বেশিও নয়! বেশ হাত পা ছড়িয়ে গত রাতের ক্লান্তি কাটাবার পক্ষে উপযুক্ত। ফাল্গুনের সকাল; চলন্ত বাসের জানালায় যতটুকু বাতাস আসে তাতে ঘুমিয়ে পড়া তখন আমার একান্ত কর্তব্য। কিন্তু হোলে কি হবে? পাথুরে কাঁচা রাস্তা; মাথাটা ঠেসান দিয়ে বসব—তার উপায় নেই।

তবু তন্দ্রা বোধ হয় এসেছিল। কেন জানিনা, হঠাৎ চোখ খুলতেই, দেখি....। কি হল ? কেউ লক্ষ্য করেছে বলে তো মনে হচ্ছে না। বাসও ঠিক চলেছে, কিন্তু·· মাথাটা একটু বাড়িয়ে দেখি সামনের দুটো সীটের মধ্যেখানে ফাঁকটাতে একটি মেয়ে তালগোল পাকিয়ে গুঁজড়ে পড়ে গেছে। তাড়াতাড়ি তাকে তুলে সীটে তুললাম। কেউ কেউ তখন সাহায্যের জন্যে ছুটে এসেছে। মেয়েটি চোখ দুটো বন্ধ করে তখনও আচ্ছন্ন। বাস থেমে গেছে।

বছর বাইশ তেইশ বয়স মেয়েটির রুগ্ন চেহারা, মুখটি তারই মধ্যে খানিকটা লাবণ্যময়ী। কে একজন জল দিয়ে মুখে চোখে হাত বুলিয়ে দিলে। তখনও তার পাশে বসে মেয়েটিকে ধরে আছি। চেতনা ফিরতেই মেয়েটি বড় বড় চোখ তুলে লজ্জা ভয় সংকোচের সঙ্গে বলে উঠল, 'আমাকে ধরলেন কেন ?'

'কেন'র কৈফিয়ৎ দিয়ে ছিলাম।

ঝাড়গ্রামের হাসপাতালে তার দিদি নার্সের কাজ করে। তার কোয়ার্টারেও গিয়েছি রেবেকাকে নিয়ে ; সান্ত্বনা চা খাইয়ে সপ্রতিভ ভাবে খবরের কাগজের কাটিং দেখিয়ে বলেছিল, 'এই দেখুন খবরটা। নবদ্বীপে আমাদের বাড়ীর সবাই একসঙ্গে মারা গিয়েছিল ইলেকট্রিকে ! দিদির বিয়ে হয়ে গিস্‌ল—ছিলনা, আর আমি ইস্কুলে গিসলুম ; তাই মারিনি।' বলে ম্লান হাসল সে।

কিন্তু সে হাসি যেন বিকারগ্রস্থ লোকের হাসি ! হাসির ছটায় জীবনের আনন্দের প্রকাশ যেখানে নেই, হাসি সেখানে এমন কুৎসিৎ দেখতে হয়, জানতাম না।

ওই ঝাড়গ্রামের বাড়ী ছেড়েই একদিন সাতসকালে চিঁড়ে গুড় বেঁধে নিয়ে হাজির হয়েছিলুম শালছত্রির মেলায়,— কংসাবতীর চরে সাঁওতালদের 'বাহা' পূজোর উৎসবে।

বুকের ওপর খাঁ খাঁ করা বসন্ত সকালের রোদ গায়ে মেখে বিধবা

কাঁসাই-এর চর তখন আগুন নিয়ে খেলবে বলে অপেক্ষা করেছে। বাঁধের পথ ধরে যেতে যেতে দেখছি, ওপারে সে আগুন ছড়িয়ে দিয়েছে পলাশ আর শিমূল! শালের ঝুমকো ফুল কোথায় পাবে সে আগুন।

নদীর সুদীর্ঘ বাঁধের পথে নরম ধুলো মাড়িয়ে মাড়িয়ে চলেছিলুম কানমণিদের 'বাহা' পরবে। মেয়েটা আমাদের ঘরে কাজ কোরত। এমন বেহিসেবী মেয়ে দেখিনি। গেরস্থদের বিপাকে ফেলে একটা গোটা দিন ছুটি নিয়ে মেলায় হাজির বোধহয় মাইল দশেক পথ পায়ে হেঁটে এসে। দেখি, কানমণির মত শ'য়ে শ'য়ে মেয়ে চলেছে মাঠের আল পথ ধরে—বাঁধের ধূলোয় পা রাঙিয়ে ছুটেছে যেন রঙমাতাল বসন্তের দক্ষিণে বাতাসকে দুটো হাতে জড়িয়ে ধরবে বলে। ওদের মাথায় রূপোর ফুলের পাশে গুচ্ছ গুচ্ছ রাধাচূড়া হাতে বাউটি, গলায় ভারী রূপোর অলংকার। ওরা চলেছে পায়ে হেঁটে ; বন্ধুনীদের সঙ্গে গালাগালি কোরে গান গাইতেও চলেছে অনেকে।

আমিও চলেছি!···

পায়ের শিরাগুলো দড়ির মতন ফুলে উঠছে সুফলের। প্যাডেলে সজোরে পায়ের চাপ দিতে দিতে লোকটার পিঠের জামাটা ঘামে ভিজে গায়ের সঙ্গে একবারে লেপটে গেছে! তাকে দেখছি, মাঠের ওই ছুটন্ত মেয়েগুলোকে দেখছি—আর ভাবছি, এই রোদ্দুরে ধূলোর সাগর পেরিয়ে আমার কি রিক্সা থেকে নেমে পড়া ঠিক হবে! কিন্তু···

—তবু আমি নামলাম। কোন সভ্য কোলকাতার দক্ষিণপাড়ার সন্ধ্যেবেলায় মিষ্টি মিষ্টি গান শুনতে তো যাচ্ছিনা সিক্তযুথীগন্ধে ভরা কোন বসন্ত উৎসব-উৎসের মুখে! আমি চলেছি, শালছত্রির মেলার পথে আদিম মানুষদের অতি অসভ্য সত্তাকে সত্য কোরে দর্শন করতে! পায়ে হেঁটেই যাব সেখানে।

দূর থেকে জয়ঢাক আর নাকড়ার মন্থর ধ্বনি ভেসে আসছে,— ডুম্—ডুম্—ডুম্।

একসময় দূরে একটা শিশুগাছের ঝুপড়ী দেখিয়ে হাঁফ ছেড়ে সুফল বললে, 'ওই যে দেখছেন ; ওইটা মেলার মুখ। আমরা এসে গেছি।'

সত্যিই আমরা এসে গেলাম।

কানমণি বলেছিল, আজ ফুলের মাস, নতুন পাতার মাস ; ফাল্গুন ওদের নববর্ষের মাস। তাই শুক্লাদ্বাদশীর আজকের রাত শালছত্রির অরণ্যসভায় 'জাহের-এরা'কে আহ্বান করার! সহর থেকে দূরে, সভ্যতার পাকা সড়কের শেষে আজ ওরা আসন পেতেছে দেবতার ; 'জাহেরে' পূজো দেওয়া হলে, ওদের মেয়েরা মাথায় দেবে শালের মঞ্জরী—পুরুষেরা করবে মহুয়া মদের নেশা।

কি কোরে যে সারাটা দিন কেটে গেল। · শেষে আমি দেখলাম রাত এলো। ধ্বনি তরঙ্গিত শালছত্রির আকাশে শাল মঞ্জরীর ছায়ায় ছায়ায় আর মহুয়া-মাতাল অরণ্য প্রান্তরে নেমে এলো অতি শান্ত নরম আলোর ফিকে রাত্তির ;

পুরোহিত বা 'নায়কের' সঙ্গে এসেছে তিনজন গ্রামবাসী—মারাং বুরু, জাহের-এরা আর মঁড়েকো। এঁরা তিনজন দেবতা ; প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন তিনজন গ্রামবাসীর ওপর। ওরা আসতে আসতে গাইছে—

'মারাং বুরু চিয়য়া হো বীর দেশম্ দ
জাহের-এরায় দহয় হো আতোরে পায়রি॥'

বলছেঃ মারাং বুরু (প্রধান দেবতা) বনভূমি খুঁজবেন। সেখানে বসত করবেন জাহের এরা। তাতে কি হবে? না, গ্রামে শান্তি হবে। সাঁওতাল উপনিবেশটি সুন্দর হোয়ে গড়ে উঠবে। শস্যপূর্ণ হবে মাঠ।

অত্যন্ত সহজ মনের সরল কামনা।···

আমি তখন ওদের আদিম জীবনের ধারে নিশ্চিন্তে বসে আছি। মঙ্গল টুডু, কানহাই সরেন ব্যবস্থা করে দিয়েছে ; কানমণির দিদিমা বুড়ি চোখে দেখতে পায় না ; পা ছড়িয়ে দাওয়ার ওপর বসে বসে বিনিয়ে বিনিয়ে ওদের গল্প শুনিয়ে যাচ্ছে আমায়।···

বারমাসে তের পার্বণ তো আছেই বাংলাদেশে। এর মধ্যে আরও আছে গান। অস্তিত্বের প্রথম দিন থেকেই এই গান দিয়েই ওদের জীবনের সুরু। ওদের জন্ম ইতিহাসের পৌরানিক কাহিনীটি শুনতে শুনতে তাই ভাবি—সত্যি কোথায় ছিল সেই পিলচু হারেম আর পিলচু বুধির সাত ছেলে আর সাত মেয়ে। মা সাত মেয়েকে নিয়ে বনে গেল। বাবা সাত ছেলেকে নিয়ে চলল পাহাড়ে বাস করতে।

দিদিমা বুড়ি বকে চলেছে একভাবে।

—অনেক দিন কেটে গেল। বড় হল মেয়েরা আর ছেলেরা। একদিন এমনি সাত ভাই বনে শিকার করতে গিয়ে ছুটল একটা হরিণের পেছনে। অনেকদূর গিয়ে দেখে গভীর বনে সাতটি মেয়ে দোল খাচ্ছে বটগাছে দোলনা বেঁধে। ইতিমধ্যে তীর বেঁধা হরিণটা তাদের কাছে এসে লুটিয়ে পড়ল। মেয়েরা তো কেঁদে সারা। ভয়ও পেয়েছে সামনে ওই ধনুর্বান-ধারী সাতজন মানুষকে দেখে। ভেবেই পাচ্ছে না, কে ওরা? অবাক হয়ে দেখছে চেয়ে চেয়ে। তারপর তারা বিস্ময়ে আনন্দে শিহরণে সকলে গান গেয়ে উঠল। সাতটি মেয়ের মিলন হল সাতটি ছেলের সঙ্গে। বুড়ি মিট মিটিয়ে হেসে বলল, 'এবের বল, কেমন কুথা?'

মনে মনে ভাবি, কালচক্রের পরিবর্তনে এই যে এত উত্থান পতন, ইতিহাসের হাজার হাজার ভাঙ্গা-গড়া, মানুষের জীবন জিজ্ঞাসা, সমাজ সংসারের নিত্য পরিবর্তন সারা পৃথিবী জুড়ে—এদের জীবনের ইতিহাসে কি তার ছায়াও পড়ছে না? নিজেদের আদিম ইতিহাসের ঐতিহ্যটুকু আঁকড়ে ওরা তো আজও বেশ ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলেছে! জানি, সাঁওতালদের জীবনের কোন লিপিবদ্ধ ইতিহাস নেই; তাদের আপন সংস্কৃতি ওদের মনের পাতায় পাতায় বংশ পরম্পরার শ্রুতি এবং স্মৃতিতে বেঁচে আছে! ওরা গান গেয়ে বলে যাচ্ছে ওদের সুখ দুঃখের পূণ্যকাহিনী, সমাজজীবনের কথা। গোষ্ঠীভিত্তিক জীবনকে

পুরোপুরি উৎসবকেন্দ্রিক কোরে তুলেছে ; বার মাসে আমাদের তের পার্বণ হোলে—ওদের সেখানে ছাব্বিশ পার্বণ। আর তার সঙ্গে গান! আদিমতম প্রাণময়তায় ভরা সাঁওতালরা ধান কাটার উৎসব করে গান গেয়ে ; বীজ পোঁতে গান গায়। গান দিয়ে ওদের বিবাহ উৎসব সুরু হয়। গানে ওরা আপন জনের মৃত্যুতে শোকচ্ছ্বাস করে! আবার নাচেও। প্রকৃতির মর্মে সে নাচের দোলার সঙ্গে ওদের মাদলের তাল মিশে যায় ; বসন্ত উৎসব তো ওদেরই। এটা যে ফুলেব মাস।

বৃত্তাকারে নাচতে নাচতে কতকগুলো মেয়ে গাইছে :

‘—সারজম্ বাহা মাতকম্ গেলে,
মালি বাহা য়্যা বাহা বঙা
নাওয়া বাহা য়্যা নাওয়া গেলে
জিউয়ি হেড়েস্ য়্যা লেচেক্ লেচেক্।’

‘শালগাছে ফুল ফুটেছে, মহুয়ায় ফুল ফুটেছে।
বেলফুল ফুটেছে ভাই! এ ফুলের মাস ;
চারিদিকে নতুন ফুল—
প্রাণ মধুময় হয়ে যে আজ কেবল দোল খায়॥’

সাতদিন আগে এ উৎসবের প্রস্তুতি হয়েছিল। তখন গাঁয়ের ‘মাঝি’ বা মোড়ল ‘নায়কে’কে দিয়ে উৎসবের দিন ঠিক করিয়ে ‘গোডেতে (বার্তাবাহক) পাঠিয়েছিলেন সারা গাঁয় এ সংবাদ ঘোষণা করতে। আজ সাতদিন পরে নির্বাচিত ‘জাহেরে’ (দেবস্থান) সবাই নির্দ্দিষ্ট সময়ে এসে হাজির।

গাঁয়ের ছেলেরা আগের দিন জাহেরে শালগাছের ডালপাতা দিয়ে একটি চালাঘর তৈরী করে গেছে। তার তলে গড়ে গেছে বেদী।

সকালে স্নান করে ছেলেরা বনে গিয়েছিল শিকারে। পুরোহিত

স্নানান্তে জাহেরের অঙ্গনে গোবর নিকিয়ে মাটিতে আলপনা এঁকে গেছে। পূজার আয়োজন সাজিয়ে গেছে। আহার করেছে স্বহস্তে রান্না করে!

সন্ধ্যেবেলা সকলে পুরোহিতের দাওয়ায় গিয়ে অপেক্ষা করছি! সকালে যারা শিকারে গেছে—তারা ফিরে আসবে এখানে। সন্ধ্যার আবছা অন্ধকার নামছে সারা বন জুড়ে।

একসময় নাকাড়া বেজে উঠল; ছেলেরা আসছে শিকার সেরে। কতকগুলো লোক গান গাইতে গাইতে আসছে তাদের সঙ্গে।

চার দিকে শালের অরণ্য ঘেরা একটা ফাঁকা মঠে তাদের সঙ্গে হাজির হলাম! জাহেরে বনদেবতার বেদী ঘিরে দূর দুরান্তের লোক এসেছে নাকাড়ার আওয়াজ শুনে। জমজমাট হয়েছে চারিদিক।

টিম্‌টিমে আলো জ্বলছে কয়েকটা।

সামনের অঙ্গনে বনদেবতাকে ঘিরে অর্দ্ধবৃত্তাকারে মেয়েরা হেলে দুলে নাচছে। ভিন্ন দলে নাচছে ছেলেরা। জ্যোৎস্নার আলো আড়াল কোরে রেখেছে শালের জটিল ডালপালা। ওরা গাইছে—

"দেশ চং আচুরেণ যা গোঁসাই তুলে দয় রাগেকান
দিশম্ চং বিহ্লরেন যা গোঁসাই গোৎ রোৎ দয় শাহেদা—।"
"দেশের পরিবর্তন হচ্ছে—তুত পাখী কাঁদছে—
দেশ পাল্টে যাচ্ছে—গোৎ রোৎ পাখী ফেলছে দীর্ঘশ্বাস।"

ঊর্দ্ধাকাশে জ্যোতিষ্কমণ্ডল থেকে মাটির গভীর পর্য্যন্ত যে নিত্য প্রবহমান পরিবর্তনের স্রোত বহে চলেছে,—তাই দেখে গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলছে ওদের তুত আর গোৎ রোৎ পাখী।...

তিনজন গ্রামবাসী এসেছে পুরোহিতের সঙ্গে। আগে বলেছি, ওরা আজকেব পূজোয় দেব দেবী। সেই মারাং বুরু হাতে নিয়েছেন 'কাঁপি' (এক ধরণের ছোট কুঠার)। জাহের-এরা স্ত্রীলোক, তিনি মালা পরে হাতে নিয়েছে ঝুড়ি আর ঝাড়ু। মঁড়েকো নিয়েছে তীর

আর ধনুক। জাহের-এরা ঝাঁটা দিয়ে পরিষ্কার করলেন অঙ্গন। সেখানে চলছে নাচ আর গান।

চলেছে 'বাহা' উৎসবের প্রথম রাত।...

সারাদিন ধরে বিক্রী হয়েছে গ্রামান্তর থেকে আসা 'হাঁড়িয়া' অর্থাৎ পচাই মদের কলসী। মেয়ে বুড়ো এমন কি কোলের ছেলেটা পর্যন্ত আকণ্ঠ পান করেছে। এখন তার ঝাঁঝাল গন্ধ এতবড় চত্বরটারই যেন নেশা ধরিয়ে দিয়েছে; নেশায় মাদল বাদকের হাত ছুটো অবসন্ন। মেয়েদের নাচের পাগুলো সমান তালে যেন পড়তে চাইছে না।

কংসাবতীর চর জোড়া শাল-মহুয়ার অরণ্য এসব দেখছে, দেখছে শুক্লা দ্বাদশীর চাঁদ, সাক্ষী রয়েছে সাঁওতালদের ঠাকুর 'করমবোঙা'।

দহিঝুড়ির ভোগন কিস্কু আর বিনপুরের বিশাখাকে দেখেছিলুম জেগে জেগে রাত কাটাচ্ছে তন্দ্রাহীন।

গোটা সাঁওতাল পরিবার একাত্ম হোয়ে গেছে আজ এখানে এসে। মানুষের সঙ্গে মানুষ মিলছে; সমবেত আত্মীয় বন্ধুদের কাছে আজ একজন প্রকাশ করছে তার সুখ দুঃখ, আনন্দ বিষাদের কাহিনী। গভীর বেদনাও আছে এ রাতে। জক্‌মা গাঁয়ের মঙ্গল মুর্মুর বউ আজ এখানেই স্বামীর কাছ থেকে বিদায় নিতে চেয়েছিল তিনখানা শালের পাতা ছিঁড়ে। পুরোহিত কানে তুলল না তার কলঙ্কের কথা। নয়—এ সব কথা আজ নয়। শিকারোৎসবের রাতে কথাটা তুলো সকলের সমক্ষে।

এসব কৃষ্ণবর্ণ মোমের পুতুলের মত পুতুল হেমব্রমের মুখখানা। মেলা ছেড়ে সে চলে গেল।

এই সব কিছুর ওপরে প্রকৃতির সঙ্গে ওদের একাত্মতায়, প্রচলিত সংস্কারের পূর্ণ স্বীকৃতি দিতে ওরা সকলে 'বাহার' দিন এমনি কোরে উপস্থিত হয়। গান গায়, নাচে, মদ্য পান করে আকণ্ঠ।...

কানমণির দিদিমা বুড়ি আবার এসেছে। হাতের আঁকাবাঁকা লাঠিটা দাওয়ায় রেখে পা ছাড়িয়ে খালি এখন বকছে ; বুড়ি বোঝেও না যে, যারা শুনছে তারা কান পেতে শুনছে কিনা। সে-ও একপেট হাঁড়িয়া খেয়েছে ; আর অনর্গল বকে চলেছে ওদের পৌরাণিক কাহিনীর হাঁস হাঁসিলের গল্প। সারা পৃথিবী আগে নাকি চারদিকে জলে ডোবা ছিল ; আর আকাশে ঘুরে বেড়াত হাঁস হাঁসিল ! বিধাতা তারপর সৃষ্টি করলেন কতকগুলো জলের প্রাণী। কচ্ছপ সৃষ্টি করলেন, কেঁচোর জন্ম হল। তারপর কি করে পৃথিবী সৃষ্টি হল ? না, কচ্ছপ জলের ওপর ভেসে রইল। আর কেঁচো শরীরের এক প্রান্ত কচ্ছপের পিঠে আর অপর প্রান্ত জলের নীচে মাটিতে নামিয়ে মাটি টেনে তুলল ওপরে। এইভাবে কচ্ছপের পিঠের ওপর তৈবী হল মাটির পৃথিবী। তাব ওপর গাছ গাছালী। সেই গাছে বসল হাঁস হাঁসিল— সাঁওতালদের আদিম পূর্বপুরুষ ।···

বুড়ির গল্পেরও শেষ নেই।

এমনি কবে রাত বোধহয় কেটে গেল ! মাথার ওপর দিয়ে ফাল্গুনের রোদ বয়ে গেছে সারাটা দিন। অবসন্ন শ্রান্ত হয়ে নায়কের খাটিয়ায় কখন ঘুমিয়েও পড়েছি ।

পরের দিন সকাল হল শালছত্রির মাঠে। কংসাবতীর ওপার থেকে ভেসে এলো পাখির কাকলি ; পুরোহিত নদী থেকে জল নিয়ে এল ঘরে। ছেলেরা পূজার উপকরণগুলি সাজিয়ে গান করতে করতে চলল 'জাহেরে'। মেয়েরা সঙ্গে চলল গান গেয়ে।···

বলতে ভুল হয়েছে ; আগের দিন শিকার থেকে ফিবে যে তিনজন তাদের ঝাড়ু, তীর ধনুক, কুঠার ফেরৎ দিয়ে পুরোহিতের দ্বারে চাল হাতে বসেছিল,—পুরোহিত যাদের পা ধুইয়ে বাকী জল তাদের গায়ে ছিটিয়ে দিতেই দেবতারা যাদের ওপর থেকে অন্তর্হিত হয়েছিলেন —এখন সেই দেবতারাই তাদের ওপর আবার ভর করলেন। যিনি

মঁড়েকো তিনি তীরধনুক নিয়ে বনে চললেন; সেখানে একটি শালগাছে তীর ছুঁড়ে মারবেন।

মারং বুরু সেই গাছে উঠে শালের ফুল ছিঁড়ে মাটিতে ফেললেন। জাহের-এরা ঝুড়িতে সে ফুল সংগ্রহ কোরে জাহেরে ফিরে এলে পুরোহিত মশাই গলবস্ত্র হয়ে সে ফুল হাতে কোরে নিলেন।

তারপর পূজা।

মহুয়ার নির্মাল্য দেওয়া হল, মুরগি বলি দিয়ে দেবতাকে উৎসর্গ করা হল। পুবোহিত দেবতাকে আহ্বান করে প্রণাম জানালেন। উপস্থিত সবাই মিলে ঠাকুরের ভোগ হিসেবে জাহেরে গোল হয়ে বসে শালপাতার খিচুড়ি আর পশুপাখির মাংস খেতে বসল। এটা দিনের বেলার ঘটনা। জাহেরে সেদিন পুরোহিত সারা দিন রইলেন একা।

বিকেলে ছেলেরা গিয়ে জাহের থেকে পুরোহিতকে নিয়ে এল ঘরে। শালফুলের মঞ্জরী নিয়ে পুরোহিত এলেন। মেয়েরা তার পা ধুইয়ে দিয়ে পায়ে তেল মাখিয়ে দিল।

পুরোহিত এবার তাদেব হাতে দিলেন শালফুল। এবার সমবেত সকলে এ ওর গায়ে জল ছড়িয়ে দিল। এ যেন প্রতীক। সারা বছরের যত মালিন্য মনে মনে জমা হয়েছে—তা' আজ দূর হোক।

তারপর আবার এক নতুন মাতন।

গান আর নাচ। সেই অর্ধবৃত্তাকার নৃত্য। সঙ্গে সঙ্গে মাদলের আর নাকড়ার গুরু গুরু শব্দে শালছত্রির নিঃস্তব্ধ অরণ্যে আবার সেই আদিম দিনগুলি জেগে উঠল।

বাংলার এই আদিবাসীগুলো অরণ্যের প্রতীক হিসেবে শালগাছকে প্রণাম জানাল। এই শালগাছই একদিন ওদের পথ দেখিয়েছিল। এরাই ওদের সত্যের সন্ধান দিয়েছিল; আজকের

উৎসব-গানে ওই অসভ্য লোকগুলো তাকেই সসম্মানে প্রণাম জানাল এই শুক্লাদ্বাদশীর রাতে। ওরা কিছু ভোলেনি।

আর নয়; আমাকে ফিরে যেতে হবে দেশান্তরে। আমি কি তীর্থযাত্রী? সংস্কারী মানুষের প্রতীক কি আমি? একদিন মানুষ খুঁজতে বেরিয়েছিলুম ঘরে ঘরে। মনে মনে ভাবতুম, 'দেশে দেশে মোর ঘর আছে,' আর 'ঘরে ঘরে আছে পরমাত্মীয়!' মিথ্যে নয়—আজও আছে! যেতে-যেতে-যেতে কত পথই তো পরিক্রমা করলাম এ ক'দিনে। সে দিন গভীর রাতে যখন বাড়ি ফিরছি, এক বন্ধু বললে, 'হিউয়েন সাং কোথেকে এলে।' শুনে যে খারাপ লাগল তা নয়,—হয়ত সম্মানই পেলুম। কিন্তু একটা মন বললেঃ ফা-হিয়েন নয়, হিউয়েন সাং কি মেঘাস্থিনিস নয়; ওই গগন হরকরাই ভাল।

—হারায়ে সেই মানুষে, তার উদ্দেশে দেশ বিদেশে আমি ঘুরে বেড়াচ্ছি! কোনকালে তাকে খুঁজে পাই তো পাব।…

অনেক দূর পথ নতুনদিহি!

চারদিক ধুলোয় ধুলো; ছেঁড়া শালপাতা আর ভাঙ্গা কালিমাখা পাত্র ছড়ান। তার মধ্যেই রাত ফরসা হয়ে আসছে।

যাবার সময় আজ বুড়ি বললে, 'র' র' যাবি কেনে?'

কিন্তু যেতেই হল।…





-ছয়

সে সব গল্প নেহাৎ গল্প হয়ে গেছে আজ।···

ঝাড়গ্রামের নতুনদিহির বাস তুলে একদিন ট্রেনে চেপে বসলাম ; যাব বিষ্ণুপুর! অনেকদিনের চেনা জায়গা ; পরিচিত অনেকেই আছেন। তবু ভেবেছিলাম তাদের কাছে যাব না ; মিথ্যে বসে বসে আর ভাল লাগছেনা। দিন দুই কোন হোটেলে কাটিয়ে ওখান থেকে বাস ধরে চলে যাব জয়রামবাটি ; সেখান থেকে কামারপুকুর হয়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে আসব।

খড়্গপুরে ট্রেন ˉদল করে সত্যিই বিষ্ণুপুরের গাড়িতে উঠলাম একদিন। কি কারণে যেন একেবারে শেষ মুহূর্তে চলন্ত ট্রেন ধরতে হল। আর উঠেও পড়লাম একটা ফার্স্ট ক্লাস কম্পার্টমেণ্টে।

ট্রেন চলেছে ; যদিও চেকার এলে থার্ড ক্লাসখানা পাল্টে ফার্স্ট ক্লাস করে নেব—তবু মনে মনে কেমন একটা অস্বস্তি রয়ে গেল ; অন্যান্য যাত্রীদের সহযাত্রী বলে মনে করতে পাচ্ছি না। হঠাৎ ছোট কম্পার্টমেণ্টের ওদিক থেকে এক ভদ্রলোক ইংরাজীতে বললেন, 'আপনাকে কোথায় দেখেছি বলুন তো?'

ভারতীয় ভদ্রলোক। কালো, ছোটখাটো চেহারার মানুষটি। পরনে ট্রাউজার, হাতে মোটা সিগার। ভাল করে তার দিকে দেখে মনে হল, মুখটি যেন চেনা চেনা। বললাম, 'ঠিক বলতে পাচ্ছি না তো।'

তারপর এটা ওটা সেটা আমারও পাল্টা প্রশ্ন।

কথোপকথনের পর ভদ্রলোক বললেন, 'আচ্ছা আপনি কি আর্কিওলজি অপিসে—।'

কথা শেষ হল না। একদিন পশ্চিমবঙ্গ আর্কিওলজিক্যাল সার্ভের দপ্তরে গিয়েছিলাম কি একটি উদ্বোধনী সভায়। সেখানে কেন্দ্রীয় অফিসের অ্যাসিস্টেন্ট সুপারিনটেণ্ডেন্ট, ওই শ্রীরাজেন্দ্র প্রসাদ দাসের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন ডিরেক্টর পরেশবাবু।

বললুম, 'আরে কোথায় যাচ্ছেন ?'

রাজেন্দ্র বললে, 'বিষ্ণুপুর। আপনি ?'

উল্লসিত হোয়ে বললাম, 'আমিও !'

ততোধিক উল্লসিত হল রাজেন্দ্র। বলল, 'বাঃ বাঃ। তাহ'লে মজা করে কাটবে তুজনের ! কোথায় উঠবেন ?'

অতি সহজ মানুষ ! পণ্ডিত লোক ! উড়িষ্যার ছেলে। কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপনা ছেড়ে প্রত্নতত্ত্বে এসে ঢুকেছে। বিষ্ণুপুরে তুটো দিন একসঙ্গে এক ঘরে থাকতে থাকতে লোকটা অতি সহজেই অত্যন্ত কাছে চলে এলো আমার।

তার দপ্তরী কাজে সে ঘুরছে যখন আমি তার সঙ্গী। আমার আত্মীয় স্বজনের ঘরে যাচ্ছি যখন সে আমার।

কিন্তু ঘুরে ঘুরে যত দেখি, তত আশ্চর্য হোয়ে যাই। সত্যি, এমন চোখ দিয়ে তো কোনদিনই দেখিনি বিষ্ণুপুরকে। কাজপাগল রাজেন্দ্র আমায় তু'দিন ধরে লেকচার দিয়ে গেল অনর্গল।

—একদিন ছিল···

দেখি, পোড়া-মাটির টালির ওপর রণতরীর সার। তীরন্দাজ

সৈনিকদের যুদ্ধযাত্রার কাহিনীর পর কাহিনী আঁকা। এরা একদিন ছিল ;

> “গজপৃষ্ঠে ঢাঙ ঢাঙ বাজে জোড়া দামা
> সাজিল ভূপতি রায় মাহুত্থার মামা ॥
> আগে চলে বারো গণ্ডা পতাকা নিশান
> ছাব্বিশ হাজার ঘোড়া চলে কান কান ॥”

চোখের সামনে দিয়ে ‘ধর্মমঙ্গলের’ কাহিনীর সৈন্যরা চলেছে যেন।

একদিন এসব ছিল। সারা বাংলা জুড়ে শৌর্যবীর্যের কাহিনী ছিল ; জয়ের পর জয় দিয়ে গড়া ছিল বাংলার স্মৃতিমন্দির আর কীর্তিস্তম্ভ। শস্ত্র যেমন ছিল শাস্ত্রও ছিল তেমনি। বিষ্ণুপুরে একদিন সাহিত্য ছিল, ছিল নব ধর্মের প্রবল বন্যা—ছিল সংগীত, অক্ষয় অমর যার প্রতিষ্ঠা।

কিন্তু কোথায় গেল সেসব! কোথায় গেল বনবিষ্ণুপুরের ঐতিহাসিক দিনগুলো ?

বাঁকুড়া বিষ্ণুপুর মেদিনীপুর জুড়ে বহু শতাব্দী থেকে আদিবাসীরা বাস করে আসছে বংশ পরম্পরায়। সাঁওতাল, বাউরি, ডোম, হাড়ি, জেলেদের প্রভুত্ব করার দিনগুলো যুগেব পর যুগ ধরে ক্রমে ক্রমে হারিয়ে এসেছে। নতুন বিজেতা অধিকার করেছে এদের ; দারিদ্র্যের চাপে অনেক কিছু দিনে দিনে হারিয়ে গেছে ওদেব জীবন থেকে। কিন্তু রাঢ়ের অন্তর্গত এই বিষ্ণুপুব তার প্রাচীন ঐতিহ্য নিয়ে ইতিহাসের অনেকখানি অংশ অধিকার করে রেখেছে। মল্লভূমের মল্লবীরদের বীরত্বে, স্বদেশপ্রেমে, প্রজাপ্রেমে সেদিন বিষ্ণুপুরের রাজারা ছিলেন দেশ বন্দিত, চিরস্মরণীয়।

উত্তর ও দক্ষিণ বঙ্গে আর্য সভ্যতা বিকাশের অনেক পরে এ সব অঞ্চলে আর্যীকরণ হয়েছিল। অতএব মল্লরাজাদের আদিবাসী বংশ-সম্ভূত বললে ভুল হবে না ; আদিবাসী ছাড়া বিষ্ণুপুরে সে যুগে কেউ

আধিপত্য করতে পারেনি। আজ সেই প্রবল প্রতাপান্বিত গৌরব কিরীট রাজা ও রাজত্ব না থাক—দুর্গের সিংহদ্বারের চিহ্ন নিয়ে যে লালমাটির প্রান্তরটুকু পড়ে আছে—তাদের বুকে দেউলের ভগ্নাংশ ঘিরে সংরক্ষিত কাঁটাগাছের ঝোপেও তাদের ইতিহাস আজ ধূলিসাৎ হয়নি।

এখানকার রাজাকাহিনীর ইতিহাস ১৫৮৭ খ্রীষ্টাব্দে বীর হাম্বিরকে দিয়ে শুরু। মাত্র বারো বছরের সহায়সম্বলহীন ছেলে তখনকার বাংলা দেশের তুমুল যুদ্ধ সংকটের দিনে বসেছেন সিংহাসনে। সেই ছেলেই বিষ্ণুপুরের রাজকাহিনীকে শক্ত ভিতের ওপর প্রতিষ্ঠিত করে গিয়েছিলেন। মুসলমান অত্যাচার, পাঠান আক্রমণ, এ সব ঝঞ্ঝার মত পার হয়ে এসেছিলেন বীর হাম্বির।

রাজারা ছিলেন শিব ও শক্তির পূজারী। বিষ্ণুপুরে মল্লেশ্বর শিবের ও খড়বাংলোয় যে চণ্ডী ও দুর্গার মূর্তি আছে তা তখনকার—অর্থাৎ ১৬১১ খ্রীষ্টাব্দের তৈরী।

কিন্তু শৈব রাজা বীর হাম্বিরের বৈষ্ণবত্ব গ্রহণের কাহিনীটি হয়ত অনেকে জানেন। বৃন্দাবন থেকে বৈষ্ণব পুঁথি বোঝাই গরুর গাড়ি নিয়ে বিখ্যাত তিনজন বৈষ্ণবধর্ম প্রচারক, শ্রীনিবাস আচার্য, নরোত্তম দাস আর শ্যামানন্দ চলেছিলেন গৌড়ে; পথে দস্যুদের হাতে লুণ্ঠিত হল গাড়ি। এই বীর হাম্বিরই সেই লুণ্ঠনের অধিকর্তা। আর ইনিই পরবর্তী কালে শ্রীনিবাস আচার্যের কাছে দীক্ষিত হয়ে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারে রাজ ক্ষমতা নিয়োজিত করলেন। শেষ জীবন তার কাটল বৃন্দাবনে। ধন্য বাংলার ধর্ম! 'হরি নাম দিয়ে জগত মাতালে।' এই হাম্বিরের শেষ কীর্তি বিষ্ণুপুরের রাসমঞ্চ।

বিষ্ণুপুর তখন ভাসছে বৈষ্ণব ধর্ম বন্যায়।

পুত্র রঘুনাথ নির্মাণ করলেন পঞ্চরত্ন মন্দির আর জোড় বাংলা (১৬৫৫ খ্রীঃ)। দুর্জন সিংহ ১৬৯৪ খ্রীষ্টাব্দে রাজত্ব নিয়ে প্রতিষ্ঠা করলেন মদনমোহন দেবের মন্দির। এই মদনমোহনই নাকি

১৭৪৩ এর বর্গী আক্রমণ ঠেকিয়ে ছিলেন দলমাদল কামান দু'টি দু'বগলে নিয়ে।

এর পরে রাজা হলেন ২য় রঘুনাথ সিংহ। যবন কন্যা লালবাঈ-এর কাহিনী জড়িত এরই সঙ্গে। মেদিনীপুরের চেতুয়া বরদার জমিদার শোভাসিংহের কন্যা রাজ্য সমেত লুঠে এনেছিলেন রঘুনাথ। তাকে বিবাহও করেছিলেন। সোনার বিশালাক্ষী আর লালবাঈ ছিল লুণ্ঠিত দ্রব্যের অন্তর্গত।

রাজার জীবনটিও একটি চমৎকার নাটক। ছোট ভাই গোপাল সিংহ অধার্মিক দাদার বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করলেন। রঘুনাথের হিন্দু স্ত্রী চন্দ্রপ্রভা তার সঙ্গে যুক্ত হলেন স্বামীর বিরুদ্ধে। রাজাকে হত্যা করা হল। স্ত্রী-ই আবার স্বামীর সঙ্গে সহমৃতা হলেন এক চিতায়! যবনিকা পড়ল সে নাটকের।

কালস্রোতে সব হারিয়ে যায়! ইতিহাসও যায়! কিন্তু হলওয়েল সাহেবের বই পড়ে শোনাতে শোনাতে দাস বলতো 'কি আর অবজ্ঞা করবেন! সবই কি মনে করেন গল্প?' দেখি প্রজাশাসনে, বিদ্যোৎসাহে, ধার্মিকতায়, সংস্কৃতিচর্চায় বিষ্ণুপুর বাংলার এক শীর্ষ কেন্দ্র তখন। প্রাচীন কীর্তি সেদিন অনেক ছিল—আজও অনেক আছে; টেরাকোটা —যাকে আজকের দিনের মানুষ মূল্য দিতে চায় না বিশেষ—তারই কি উচ্চাংগের সৃষ্টিবৈচিত্র্য আজও অক্ষয় হয়ে রয়েছে বিষ্ণুপুরের মন্দির-গুলোর গায়ে গায়ে। কোথায় গেল সেই নবসৃষ্টির কবিরা?—

পৃথিবীর মানুষ আজও হয়ত বিষ্ণুপুরকে চেনে তার শাঁখের কাজে, শাখার কাজে, রেশম বস্ত্রের সূক্ষ্মতায় আর বিষ্ণুপুর ঘরানার সংগীতের জন্যে। কিন্তু কোন সভ্য মানুষ কী স্বীকার করবে, আদিবাসী মল্লরাজারাই ছিলেন তার পৃষ্ঠপোষক?

বৃটিশ শাসনের অবশ্যম্ভাবী ফল—মানুষকে মানুষের কাছে থেকে দূরে সরিয়েছে। জাতে জাতে ধর্মে ধর্মে ঘরে ঘরে বিবাদ সৃষ্টি করে গেছে। বিষ্ণুপুর রাজারাও একদিন সেই কোপদৃষ্টিতে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছেন। মারাঠা, মুসলমান অত্যাচার, ছিয়াত্তরের মন্বন্তর এড়িয়ে যাঁরা জেগে উঠেছিলেন—তাঁরা শেষ হয়ে গেছেন ভিনদেশী বণিকগুলোর হাতে।

দাস বলতো, 'আপনি তো মল্লরাজাদের "বাগদী রাজা", "মাল উপজাতিদের রাজা" বলে খুব গর্বিত হচ্ছেন কিন্তু তারা নিজেরাই নিজেদের উত্তরভারতের ক্ষত্রিয় বংশের বলে দাবী করেন জানেন তো?'

সে রকম কথা শুনেছি। অনেক কিংবদন্তীতে তাদের উত্তরভারতীয় ক্ষত্রিয় বলে প্রমাণ করাব চেষ্টাও হয়েছে; কিন্তু ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে মল্লরাজাদের ইতিহাস বিষ্ণুপুর বাঁকুড়া অঞ্চলের আদিবাসী সম্প্রদায় থেকে উদ্ভূত বললে তাদের অবজ্ঞা করা হবে বলে আমার মনে হয় নি! শৌর্য ও বীর্যের প্রতীক হিসেবে এই আদিবাসীই বাংলার অনেক ইতিহাস কাহিনীর স্রষ্টা।

আজকের কথা নয়। বিষ্ণুপুরের রাজবংশের অস্তিত্বকাল অনেক প্রাচীন। অন্তত আট-ন'শ বছরের। রাজাদের কুলপঞ্জীতে এ বংশের প্রতিষ্ঠাতা আদি মল্লকে খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর বলে উল্লেখ করা আছে। কেবলমাত্র ৪৯ তম রাজা ষোড়শ শতাব্দীর বীর হাম্বির মোঘল আমলে বার্ষিক এক লক্ষ সাত হাজার টাকা কর দিয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন।

বলতুম 'রাজেন্দ্র, এবার চুপ কর ভাই!'

রাজেন্দ্র মোটা চুরুটটা টানত চিৎ হয়ে শুয়ে। বলতো, 'সেকি মশায়, বাংলা দেশের লোক নই বলে বাংলার ইতিহাস আমার মুখে শুনতে ভাল লাগছে না?'

বুঝলাম, রাজেন্দ্র বেশ অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত করেছে। ওকে আর ঘাটাতে সাহস পেলাম না। লজ্জিত হয়ে বললাম, 'না সে কথা নয়। তুমি কি ঠিক করলে বল ?'

'কি সম্বন্ধে ?'

'জয়রামবাটিটা তোমায় দেখাব ঠিক করেছি যে। যাচ্ছ তো ?'

দাস হাসতে হাসতে বলতো, 'জয়রামবাটি গিয়ে আমি কি করবো ? ওখানকার মাটি খুঁড়ে কি 'ক্যালকলিথিক কালচার' দেখাতে পারবে ?'

বললাম, 'মাটির তলে প্রাগৈতিহাসিক না হোক মাটির ওপর আধুনিক কালচারটা অন্তত তোমার দেখে যাওয়া উচিত রাজেন্দ্র।'

রাজেন্দ্র পাল্টা নিমন্ত্রণ করে বসল, 'এসো পাণ্ডুরাজার ঢিবিতে ! মার্চে আমি আসছি ! বেশ মজা করে কাটানো যাবে ক্যাম্পে ; আসছ তো ? ভেবোনা তোমার সঙ্গে গেলাম না বলে একদেশদর্শিতা করছি।'

'বলা কি যায় ? পদ্মপত্রে শিশির বিন্দুর জীবন। কোন সময়ে কালের বাতাস লেগে ঝরে যাব—কে জানে !'—হাসতে হাসতে বললাম।

দাস হো হো করে হেসে উঠে বলল, 'যাই হোক। আমার ঠিকানাটা রেখে দাও ; সময় পেলে চিঠি দিও ; প্রোগ্রাম করা যাবে।'

কিন্তু রাজেন্দ্রর মত মানুষও কেউ রইল না সঙ্গে। অনেক দিনের পথ পার হয়ে হয়ে অতর্কিতে যাব সঙ্গ পাই— সে-ও থাকে না ! যাবার সময় বললুম, 'তুমি তো গেলেনা। কিন্তু তোমার জন্যে যে বিরহে মরব রাজেন্দ্র !'

রাজেন্দ্র ছদ্ম দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'আহা তাই হোক ভাই ! তোমাদের শরৎবাবুর দেবদাসের মত আমার জন্যে তোমারও যেন দু' ফোটা চোখের জল পড়ে !' তারপর বাস ছাড়তে বলল,—'মোর

লাগি করিও না শোক; আমার রয়েছে কর্ম আমার রয়েছে বিশ্বলোক।'

আমি বললুম, 'সাবাস!'

মনে আশা রইল আবার দেখা হবে দাসের সঙ্গে। চললাম, যেন কয়েক শতক পার হোয়ে জয়রামবাটি!....





সাত

শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, 'ওকে সামান্যা ভেবোনা। আমার চেয়ে সারদা অনেক বড়। তাঁর যদি কৃপা হয়—তোমার সব দুঃখ যাবে!

রাজদর্শন করতে হলে দ্বারীকে প্রণামী দিতে হয়। রাজা রামকৃষ্ণের দর্শনের পূর্বে আমি সেদিন সারদাময়ীকে প্রণাম জানতে এসেছিলাম জয়রামবাটি।

পৌঁচেছিলাম সন্ধ্যার কিছু পরে। মন্দিরে শ্রীমার শ্বেত পাথরের মূর্তি ধূপে ধূনায় ঢেকে গেছে তখন। কীর্তনীয়া খোল করতাল নিয়ে অপেক্ষা করছে।

স্বামীজী আহার বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। মেটে-কোঠার দোতলার ঢালা বিছানা পেতে জন তিনেক তীর্থযাত্রী আগে ভাগেই জায়গা করে নিয়েছেন! তাদের পাশে গিয়ে কম্বল বিছিয়ে শোবার ব্যবস্থা করলাম সবার শেষে! ভেবেছিলাম, অযাচিত, অনিমন্ত্রিত এমনকি পূর্বাহ্নে কোন সংবাদ না দিয়ে হাজির হয়েছি! কে জানে আশ্রয় পাবো কিনা! কিন্তু সংশয় মিটে গেল। মশারি

ফেলে সেই অন্ধকার ঘরখানিতে টিম্‌ টিমে হ্যারিকেনের আলোয় শুয়ে ভাবছি,—দেবতনু মা সারদা একটি মাটির প্রদীপে জ্বেলে দিয়েছেন ভাস্বতী শিখা। অনির্বাণ সে আলোয় যুগের দীপ্তি—চিরন্তনী পৃথিবীকে পথ দেখাবার বিভা।—তাই তিনি সরস্বতী সারদাময়ী। মহাবৃক্ষের আশ্রয়ে যেন এক নিবিড় শান্তির মাতৃক্রোড়।

কথাগুলো কেবলমাত্র ভাবপ্রবণতারই হল বোধহয় ; কিন্তু এমন কথাই সেদিন মনে এসেছিল। ভবঘুরের মত এসে পড়েছি। এসে লজ্জিতই হয়েছি বিছানার পোঁটলাটা বগলে করে। কিন্তু কে জানতো আমার জন্যে অপেক্ষা করছে এক শান্তির নিকেতন।

পাশের বিছানায় প্রৌঢ় ভদ্রলোক মুখুজ্যেমশাই এসেছেন পাটনা থেকে! দাড়ি গোঁফ এমনকি মাথাটি পর্যন্ত কামানো—শান্ত সৌম্য চেহারা। একসময় কথায় কথায় বললেন, 'তা' ভাই আপনার বয়সের ছেলেরা তো বড় একটা এ সব জায়গায় আসে না!'

বললাম, 'শরীর স্বাস্থ্য ভাল থাকতে থাকতেই ঘুরে নি! বয়েস হলে, শরীর মন দুটোই তো নষ্ট হবে। আপনি কি বলেন?'

মুখুজ্যেমশাই-এর বদলে উত্তর দিলেন তাঁর ও পাশের ভদ্রলোকটি! একটু জোরেই বললেন, 'কি বললেন—কি বললেন!'

আমি প্রমাদ গণলাম! একি! এমন অতর্কিত ধমক কেন? যেমন তার প্রশ্ন তাতে খুব স্বাভাবিকভাবে ভয় পাওয়ারই কথা ; যেন কোন কুইঙ্গিতপূর্ণ আপত্তিকর কথা বলে ফেলেছি! কিন্তু কৈফিয়ৎ দেব কি? বক্তব্যটা আর একটু প্রাঞ্জল করলাম।

মেঘনাদবাবু সমস্তটা শুনে অনুধাবন করে বললেন, 'তা যা বলেছেন।' তারপরে মুখুজ্যেমশাই-এর দিকে চেয়ে, 'তাহলে আরম্ভ করি?'

স্মিত হেসে সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়লেন মুখুজ্যেমশাই।

কি জানি কি আরম্ভ করবেন মেঘনাদদা।

কিন্তু বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না ; ক্ষণপরেই মেঘনাদদার কণ্ঠে উদারা থেকে তারার আরোহণ অবরোহণ আরম্ভ হয়ে গেল। যোগাসনে বসে, হাতের ঘড়িটা খুলে একপাশে রাখলেন। তারপর হ্যারিকেনের আলোয় একখানা বই মেলে ধরে মেঘনাদদা হাঁটুর ওপর তালি দিতে দিতে ধরলেন, 'মা আছেন আর আমরা আছি, ভাবনা কি আছে আমার।'

* তার কোন ভাবনা না থাক ভাবনা যে আমার হচ্ছে। এই কি মানুষের কণ্ঠস্বর ! সত্যিই যেন মেঘেব নাদ সে স্বরে ! যেন পর্বত শৃঙ্গ বিদীর্ণ করে সে সংগীত ধাবা গলিত লাভার মত গলগলিয়ে নেবে আসছে মর্ত ধামে জনপদ চূর্ণ কবতে করতে। একে এই ভরা চৈত্রের গরম তাপ তার ওপর সংগীত শিক্ষার্থীব গানের উত্তাপ ! আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে চিৎ হয়ে পড়ে রইলাম। আর মনে মনে আদি দেবতা মায় সারদামার চরণ যুগলে প্রণিপাত করতে করতে ভাবতে লাগলাম,—ভগবন, এই কি তোমাব শান্তির নিকেতন ?

বোধ কবি আধ ঘণ্টা কেটে গিয়ে থাকবে ; মেঘনাদদার কম্বুকণ্ঠ নিঃসৃত সংগীত নির্ঝর ইতিমধ্যে থেমেছে। তারপব আড়ামোড়া ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে মুখুজ্যেমশাই-এব দিকে নজর পড়তে বললেন, 'দাদা কেমন বুইলেন ?' দাদা উত্তর করলেন না ; বোধকরি 'মা আছেন' এই আশ্বাসবাণীতে সত্যিই তিনি বেপরোয়া। অতএব ঘুমিয়ে পড়েছেন।

মেঘনাদদা এবার আমায় নিয়ে পড়লেন। আমার সাং মোঃ সব জানবার পর, মশারিটা পড়তে দেখে বললেন, 'হ্যাঁ ভাই, মশারিটা কোত্থেকে নিলেন ?'

বললাম ! কিন্তু কৌতূহল চরিতার্থ হল না মেঘনাদদার। কত পড়ল থেকে আরম্ভ করে—কোন মঙ্গলবারে হাওড়া হাট থেকে কিনতে পারলে দামের সুবিধে তো বটেই—মশারির কোণে কাপড় থাকা ছাড়া আমার আর কি কি সুবিধে হত, তা সবিস্তারে জানিয়ে

দিয়ে মেঘনাদদা বললেন, 'আর বলনা ভাই—মশা ঢোকা বাদ দাও—আমার মশারিতে বেড়াল পর্যন্ত ঢোঁকে; বেড়াল ঢুঁকুক আপত্তি নেই; মাছের কাঁটাকুঁটি নে-সে ঢোঁকে বলে মহা মুস্কিল!'

'নে সে', অর্থাৎ 'নিয়ে এসে আর 'ঢোঁকে' মানে প্রবেশ করে।'

কি ভাগ্য হ্যারিকেন আলোটা নামিয়ে দিল মেঘনাদদা।

কোথাকার কোন বাঁকুড়া-হুগলী জেলার সীমান্তে অজ পাড়া গাঁয়ে শান্ত রাতে চোখ বোঁজার চেষ্টা করলুম; কিন্তু ঘুম এলে হয়। মেঘনাদদার কম্বুকণ্ঠধ্বনি মস্তিষ্কের স্নায়ুতন্ত্রীতে এখনও দিশেহারার মতন ঘুরপাক খাচ্ছে! বিধাতা-পুরুষ মুখুজ্যেমশাই-এর ওপর অশেষ কৃপা করেছেন! নইলে গত দু'রাত্রির মেঘনাদদার নিপীড়নে আর নির্যাতনে তাঁকে অনিদ্রায় বাসা ছাড়া করতো। আজও তিনি নির্বিঘ্নে ঘুমচ্ছেন।

১৮৫৩ সালের ২২শে ডিসেম্বর রামচন্দ্র মুখুজ্যের দরিদ্র ঘরে জন্মালেন সারদামণি! সেই সন্তান—আমোদরের তীরে ম্লান সন্ধ্যাব আভা লাগা পশ্চিমগগনে একদিন এক ভুবনমোহিনী, যজ্ঞোপবীত-ধারিণী কৌমারী শক্তি জগদ্ধাত্রীরূপে দেখা দিয়েছিলেন। রামচন্দ্র স্বপ্নে দেখেছিলেন যে দিব্যাননা দ্বিভুজাকে—তিনিই তাঁর ঘরে এসেছিলেন সারদামণিরূপে। অখ্যাত অজ্ঞাত নগণ্য সাধারণ মেয়ে। কোথা থেকে কি হয়ে গেল! সারা বিশ্ব আলোকিত করে একদা ঊনবিংশশতাব্দীর বিরুদ্ধ ধর্মানুশাসনের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়ে উদ্ভাসিত হলেন। যুগগুরু রামকৃষ্ণের সহধর্মিনীরূপে প্রকাশিত হলেন অন্তরে অন্তরে। কিন্তু মালাবদল তো হল পুরুষে আর প্রকৃতিতে,—বাঁকুড়া আর হুগলীতে। কিন্তু কোথায় গেল প্রচলিত দাম্পত্য জীবনের চিরাচরিত গৃহকোণ? ষাট-মাইল দূরের দক্ষিণেশ্বরে সেই লোকটার কাছে একদিন উপনীত হলেন পথশ্রান্ত মা-সারদা। তখনই তাঁর স্বামীর জীবনে সার্থকতা এসেছে! অঞ্জলি পূর্ণ হয়েছে—

ধন্য হয়েছে অন্তর ; তখন এক সুন্দর সূর্যসঙ্কাশ জীবনের শুভ সংকেত পেয়েছেন তিনি। তিনি তখন আকুল হয়ে কাঁদছেন গোপিনীরূপে ; স্ত্রীকে পূজা করছেন নানা উপচারে। বলছেন, 'স্ত্রীলোক যে আদ্যাশক্তি রে। তাই আমার মাতৃভাব।'

অনেক দূর !

ক্ষুরস্য ধারা সে পথে। দুর্গম ! সশরীরে সেখানে পৌঁছবে কী ; চিন্তাটাই যেন মাথা ছেড়ে পালায়। ভেবে কাজ নেই ; ভাবতে ভাবতেই ক্লান্ত হয়ে যাই আমি।

সকাল হল একজনের ডাকে ; চৈত্রের রাত ; প্রথম রাতে ভাল করে ঘুম আসতে চায়নি ; এখন কোনরকমে চোখ মেলতেই দেখি অন্ধকার চেপে বসে আছে সারা ঘরখানায়। কে একজন ডাকছেন, 'একবার উঠবেন ?'

কিন্তু আহ্বানকারীটি কে ? মুখুজ্যেমশাই পাশে আছেন ! তার পাশে মেঘনাদদার বিছানা। তাব নাসিকাগর্জনের কলরোল শুনলে কিছু না ভেবেই ধারণা করা যায়—ইটি মেঘনাদদা ! কিন্তু ক্ষীণকণ্ঠে যিনি ডাকছেন—তিনি কে ? মেঘনাদদার ওপাশে কেউ আছে বলে তো জানিনা !

ঘুম চোখেই বলি, 'কে ?'

ক্ষীণ কণ্ঠে উত্তর এল, 'আমি শরণ হরি !'

শরণ হরি যদি, এমন মাঝরাতে আমাকে স্মরণ করছ কেন ?— মনে মনেই ভাবি। টর্চটা জ্বেলে হাতঘড়িতে দেখি প্রায় চারটে বাজছে ; শবণ হরির কণ্ঠস্বর ততক্ষণে করুণ আর্তিতে পরিণত হয়েছে। বললে, 'একটু উঠুন না ?'

অগত্যা। তিনি ফাঁকে অর্থাৎ বাইরে যাবেন : দাঁড়াতে হবে ! উঠে টর্চ নিয়ে এগিয়ে অপেক্ষা কবতে হল না ! শরণ হরি মশায় অতি দ্রুত মেটে কোঠার সিঁড়ি ভেঙে নিচে নেমে ততক্ষণ অন্ধকারে

অদৃশ্য হয়ে গেলেন। আমি বিচিত্র প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে রইলাম বাইরে বেরিয়ে।

'দেশে দেশে মোর দেশ আছে' কথাটায় খুব আশ্বাস বাণী পেয়ে ঘর থেকে একদিন বেরিয়ে ছিলাম। কিন্তু সে বোধহয় কবিতাতেই। 'ঘরে ঘরে আছে পরমাত্মীয়' বলে কবি যেমন উচ্ছ্বসিত হয়েছেন, মনে হয় কবিকে কোনকালে জয়রামবাটির মাঝরাতে কোন শরণহরির পাল্লায় পড়তে হয়নি।

মিনিট পনের বেমালুম কেটে গেল! শরণহরির কোন পাত্তা মিলল না! মশাও তেমনি; তাদের সুবিধে আছে, অন্ধকারে অন্ধভাবে অদৃশ্য থেকে তারা কামড়ে যেতে পারে। কিন্তু কতক্ষণ? দু'একবার আমিও শরণ হরিকে স্মরণ করলাম; কিন্তু কোথায় সে? ওপরে উঠে এসে দেখি হ্যারিকেনটা জ্বালিয়ে নিয়ে ইতিমধ্যেই মেঘনাদ-দা যোগাসনে বসে বোধহয় প্রাণায়াম করছেন,—আর পাটনার মুখুজ্যেমশাইএর গলা শোনা যাচ্ছে আস্তে আস্তে! কে জানে, গানের খাতাটা টেনে নিয়ে বৈতালিকের দল হয়ত এখনই সাধন সংগীত শুরু করে দেবেন! সমস্ত ক্লেশ উপেক্ষা করে সেইভাবেই ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লাম! এ অবস্থায় এখানে থাকা সমীচীন নয়।

এক বিষয়ে ভাল হল; চৈত্রশেষের দিন। বেলা বাড়লে ঘরের বার হয় কার সাধ্য। মন্দিরের কাছে পুণ্যপুকুরের পুবপাড়ে জাগ্রতা দেবী সিংহবাহিনীর টিনেছাওয়া মন্দিরটির কাছ দিয়ে ঘুরে এলাম; দূর দেশ-দেশান্তরের লোকের কাছে এ অলৌকিক শক্তিসম্পন্না দেবী আজ চির পরিচিতা; মা ব্যাধিমুক্ত হয়েছিলেন এই মন্দিরে হত্যে দিয়ে। দেখে এলাম, শ্রীমার ছোটবেলাকার তালপুকুর। শীর্ণকায়া নদী আমোদরের বাঁধানো ঘাটে এসে বসলাম ছায়ায়। তারপর

খোলামাঠের ধানের ক্ষেতের আল পথ ধরে ফিরে এলাম মন্দিরের চূড়াটি নিশানা করে। মন্দিরে যাবার পথে শ্রীমার বসতবাটি! অতি সামান্য নগণ্য কতকগুলি পুরোনো চিহ্ন; আড়ম্বর নেই, আতিশয্য নেই কোথাও একতিল। অথচ ওটুকুই কত মূল্যবান হয়ে আছে।

দেখতে দেখতে তুপুর স্তব্ধ হয়ে নামল গ্রামে গ্রামে; অবসন্ন প্রান্তরের মধ্যে প্রচণ্ড তাপে কোন গাছের ছায়াময় শাখায় বসে চারদিকে স্তব্ধতার খবর রটিয়ে দিচ্ছে তুপুরবেলার ঘুঘুটা! বসে বসে ভাবি এই নিস্তব্ধ দিনে ঘুঘুর ডাকটা না থাকলে কি অর্থহীনই মনে হত!

কিন্তু ঘরের কাছে আসতেই দূর থেকে একটা কোলাহল কানে এল; সেই মেঘনাদ-দার কণ্ঠস্বর! শ্রীমার অশেষ করুণা; গান নয়; নেহাৎই আলাপন হচ্ছে! কিন্তু অনেক দূর থেকেই বোঝা যাচ্ছে, তিনি খুবই উত্তেজিত।

এক রকম দৌড়তে দৌড়তেই সিঁড়ি বেয়ে উঠলাম; ওপরের ঘরে নিজের একটা ছোট্ট স্যুটকেশ, মুখুজ্যেমশাই-এর ঝোলাঝুলি, আমার পাতা বিছানা কম্বল চারদিকে ছড়ানো-ছিটনো; আর মেঘনাদ-দা সারা পাড়া মাথায় করে চিৎকার করছেন। খুব ঘাবড়ে গিয়ে সামনে দাঁড়াতেই মেঘনাদ-দা আমার দিকে তু'পা লাফিয়ে এসে বজ্রনির্ঘোষে বললেন, 'কোথায় ছিলেন এতক্ষণ?'

অচেনা তু'একজন তখন সেখানে উপস্থিত। তারা, মুখুজ্যেমশাই, হাঁ-হাঁ করতে করতে আমাকে ছাড়িয়ে নিতে নিতে বললেন, 'কি মশাই আপনার কি মাথায় ছিট আছে?'

আমি একেবারে অবাক! ভাব দেখে মুখুজ্যেমশাই ড্যাবডেবে চোখ মেলে বললেন, 'বিরিঞ্চির হাতঘড়ি হারিয়ে গেছে!'

'তাই নাকি? কবে?' আমি আরও অবাক হয়ে গেলাম। 'কিন্তু বিরিঞ্চি কে?'

মুখুজ্যেমশাই-এর মুখে 'কোন উত্তর নেই। গামছাটা মুখের সামনে নাড়তে নাড়তে নিজের বিছানাটা পরিষ্কার করে গুছিয়ে নিলেন।

মেঘনাদ-দা তেমনি রূঢ়ভাবেই নিজের বুকের ওপর একখানি সজোরে চাপড় মেরে উত্তর দিলেন, 'আমিই বিরিঞ্চি। আপনি ঘড়ি দেকেচেন?'

উত্তেজিত হবারই কথা! মেঘনাদ-দাকে বিছানায় বসিয়ে বললুম, 'কি করে হারাল? আমি তো দেখিনি।'

আবার বারুদে আগুন পড়ল। রক্তবর্ণ চোখ তুলে মেঘনাদ-দা বললেন, 'কি করে দেখবেন; ভূতে যে ট্যাঁক মেরেছে। জানলা দে ফরফর করে উড়ে বেইরে গেল। বলে হাত দিয়ে উড়বার ভঙ্গী দেখিয়ে অন্যদিকে তাকিয়ে মুখ ঘুরিয়ে রসলেন।

বেগতিক; নিজের বিছানা-পত্তর গোছাতে গোছাতে নিজেকে অনেক কষ্টে সংযত করে রাখলাম। শুধু আমার নয়, মুখুজ্যেমশাই-এর জিনিস পত্তরও তল্লাসী করে মেঘনাদ-দা ঘড়ির সন্ধান করেছেন!

অপমানিত যথেষ্ট হয়েছি; কিন্তু কোন কৌশলে যে আমি তার ছাব্বিশ বছর আগেকার বিয়ের ঘড়িটি হাতসাফাই করিনি, তা বোঝাই কেমন করে? চুপ করে রইলাম!

বিরিঞ্চি ওরফে মেঘনাদ-দা গজগজ করতে লাগলেন।

মুখুজ্যেমশাই পায়ের ওপর পা তুলে চোখ বন্ধ করে এতক্ষণ শুয়েছিলেন; হঠাৎ কি মনে হতে উঠতে উঠতে বললেন, 'আচ্ছা বিরিঞ্চি, তোমার ঠিক মনে আছে তো ঘড়িটা জানলার ওপর রেখেছিলে কাল রাতে?'

মেঘনাদ-দা 'হুঁ' বলে গম্ভীর হয়ে রইল!

'—আর এক ভদ্রলোক যে এখানে কাল রাতে ছিলেন? তাকে জিজ্ঞেস করেছেন?' শরণ হরির কথাটা হঠাৎই আমার মনে হল।

মেঘনাদ-দা বিস্ময়ের সঙ্গে বলল, 'রেতে? কে? কৈ আমরা

তো কেউ জানতুম নি!' বলেন কী! শরণহরির শেষ রাতের ঘটনা বললাম! তার 'ফাঁকে' যাওয়া তারপর সেই অন্ধকারেই আমাকে দাঁড় করিয়ে অদৃশ্য হয়ে যাওয়া—সব।

মুখুজ্যেমশাই বিরিঞ্চি-এর সব শুনে, পুত্রের মৃত্যুসংবাদ শোনা রাবণের মত, 'ওঃ' বলে বিছানাশায়ী হলেন। মুখুজ্যেমশাই ঘটনাটা ঠিক বুঝতে পারেন নি বোধহয়! বললেন, 'কি বলছে বিরিঞ্চি?—খাবে না?'

এতক্ষণে বুঝলাম মুখুজ্যেমশাই কানে শোনেন না! বুঝলুম মেঘনাদ-দার সংগীত তার কাছে এত প্রিয় কেন!

ক্ষোভে দুঃখে আত্মগ্লানিতে মেঘনাদ-দা সে দুপুরে স্নান আহার কিছুই করলেন না; অচৈতন্যপ্রায় সারা দিন মুখ গুঁজে পড়ে রইলেন! অনেক অনুরোধ উপরোধ করে শেষে দু'টি সন্দেশ আর খানিকটা দই এনে তাকে খাওয়ানো গেল। অন্তরে অত বড় একটা সংগীতের সরোবর, বেশ ধরে নেওয়া গেল তা শুকিয়ে গিয়েছে।....

কিন্তু কি করব; অনেক বুদ্ধি খাটিয়েও ঘড়ি চোরকে সনাক্ত করা যাবে না! এদের মধ্যে আমিই কেবল সেই অজ্ঞাত শরণহরির এক-ছত্র বাণী শুনেছিলুম শেষ রাতে। চোখে দেখা তো দূরের কথা—এরা দু'জন সে সৌভাগ্যও করেন নি।

আহার করে ফিরবার পথে মুখুজ্যেমশাই বললেন, 'দেখুন দিগিনি। লোকে তীর্থ করতে আসে মনের দুঃখু ভুলতে। এ ব্যাচারী আবার নতুন করে দুঃখু নিয়ে ফিরচেন।'

উত্তর দিয়ে লাভ নেই। মুখুজ্যেমশাই শুনতে পাবেন না। যেতে যেতে আবার বললেন, 'আপনারা যাই বলুন; আমার কিন্তু মনে হয়—ঘড়ি বিরিঞ্চি নিজেই কোথাও হারিয়েছে। মিথ্যে লোকের নামে কলঙ্ক দেওয়া কি ঠিক?...'

উত্তরে কি-ই বা বলব? নিজের চোখে দেখেছি, মেঘনাদ-দা

হাঁটুতে তবলার বোল তুলতে ঘড়িটা খুলে রাখল জানলার ওপর। তারপর যথারীতি সকাল হয়েছে ; মেঘনাদ-দাও ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে ঘড়িতে দম কষতে গিয়ে দেখলেন, ঘড়ি নেই। এখন শরণহরি ছাড়া কাকে দোষ দিই। আপনি আমি যদি না নিয়ে থাকি—তাহলে ঘরেই কোথাও থাকত। আর এই সদাশয় ভদ্রলোকটি ঠিক উল্টো কথা বললেন !

যাক আর ভেবে লাভ নেই।···

মুখুজ্যেমশাইকে ঘরে তুলে দিয়ে গরুর গাড়ি ভাড়া করতে বেরিয়ে গেলাম ! কামারপুকুর এখান থেকে মাইল কয়েক রাস্তা ! গরুর গাড়িতেই যাবো তিনজনে।

বিকেল হ'তে বোঝা গেল—গরুর গাড়ি নিয়ে কি ভালই করেছি। সারাদিনের পর শোকসন্তপ্ত মেঘনাদ-দা ওরফে বিরিঞ্চির এমনই অবস্থা—যে তাকে নড়ানোই অসম্ভব। অথচ কামারপুকুরে যেতেও আপত্তি নেই। যাই হোক সমস্ত ঘটনার একটি সুস্থ পরিণতিতে পৌঁছে নিজেই তার বিছানা-পত্তর গোছ-গাছ করে গরুর গাড়িতে তুললুম। শেষে সংগীতে তদ্গতপ্রাণ মেঘনাদ-দাকে তুলে এনে গরুর গাড়িতে বোঝাই করলাম।

চলন্ত গরুরগাড়ির খড়ের ওপর বসে মুড়ি বাতাসায় কোঁচড় ভরে মুখুজ্যেমশাই বললেন, 'নাও হে বিরিঞ্চি ভাই ! খাও।'

বেশিক্ষণ সাধাসাধি করতে হল না ; বিরিঞ্চি ভাই মুঠো মুঠো করে খেতে লাগলেন। গরুর গাড়ি চলতে লাগল পিচের রাস্তায়।

কামারপুকুর যাবার পথের মধ্যে পড়ে কতুলপুর। পাঠান কতলুখাঁর সঙ্গে পরিচয় থাকলে পাঠকের স্মরণ হবে ! মনে পড়বে গড়মন্দারণের কথা।

বছর দু'য়েক আগে একবার কামারপুকুর এসেছিলাম আমি আর বিশু। পুজোর সময়। তারকেশ্বর, চাঁপাডাঙ্গা, আরামবাগ হয়ে

গড়মন্দারণ দেখতে এসে কামারপুকুরে দু'রাত্তির কাটিয়ে গিয়েছিলাম মনে আছে। সবাইকে চুপচাপ দেখে যেতে যেতে সেই গল্পটা আরম্ভ করেছিলাম।

জানি, মুখুজ্যেমশাইকে শোনাতে গেলে কণ্ঠে যত শক্তি লাগে তত আমার নেই; কিন্তু মেঘনাদ-দা 'তা'পর' বলে ঔৎসুক্য জানাতেই আবার উৎসাহের সঙ্গে আরম্ভ করলাম, 'তারপর যেতে-যেতে দারুকেশ্বর নদী পার হতেই আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামল। সন্ধে হয়ে গেছে অনেকক্ষণ।' নদীর ধারে বালি ঠেলে ঠেলে হাতে জুতো, মাথায় স্যুটকেশ নিয়ে ওই দুর্যোগের রাত দুজনে কিভাবে অচেনা রাস্তায় এসে উঠেছিলাম কামারপুকুরের বাস ধরতে—বলেছিলাম সে গল্প! চারদিকে বন্ধ বাসের মধ্যে ভিজে কাকের মতন বসে ড্রাইভারের পথ চেয়ে আছি—। সে এক রোমাঞ্চকর কাহিনী। আটটার বাস ছাড়ল রাত দশটায়।

মেঘনাদ-দা বললে, 'কোথায় উঠলেন অত রাতে? কি খেলেন?'

সে-ও এক গল্প। খাবারের দোকানে ময়রাকে অনেক অনুনয় বিনয় করে তার দালানের বেঞ্চিতে শুয়ে রাত কাটানো আর তার দোকানের মুড়ি আর জিলিপি আর রস তাই হল রাতের আহার।

ময়রার বেঞ্চিতে চিৎ হয়ে শুয়ে মশা মারছি চট্‌চট্‌। বিশু অন্য বেঞ্চিতে শুয়ে বলছে, 'ঘি এখনও কাঁচা আছে; তাই কলকল করছে। দাঁড়াও বাবা ঘি পাকুক, পরে লুচি ছেড়ো।' কে জানে কাকে বলছে? হয়ত লুচিরই স্বপ্ন দেখছে বেচারী। আহা!

বিরিঞ্চি ভাই হাসতে হাসতে চোখ বড় বড় করে বলল 'সত্যি?'

এতক্ষণে দেখি তার চক্ষেও সেই তৃষ্ণা। তৃষ্ণা বক্ষ জুড়ে! অতঃপর সামান্য উসখুস করে এবার বলল, 'শুনুন, একখানা কর্ণাটি একতালা।' বলে উত্তরের সময় না দিয়েই আরম্ভ করল—

"তাথেইয়া তাথৈইয়া নাচে ভোলা

বম্ বম্ বাজে গাল।

ডিমি ডিমি ডিমি ডমরু বাজে

দুলিছে কপাল মাল।"

সঙ্গে সঙ্গে নিজের উরুর ওপর তালে তালে চাপড়। গরুর গাড়িতে জোতা নেহাৎ পাষণ্ড কলিযুগের নেমকহারাম ষণ্ডযুগল। নইলে এ অবস্থায় দেবতা-বাহনের সগোত্র আমাদের বাহন যুগল সামান্য দ্বৈত নৃত্যও শুরু করল না কেন? আমি বিস্ময়ের সঙ্গে ভাবলুম, সত্য সেলুকস্, কি বিচিত্র এই দেশ! কি বিচিত্র এ দেশের আপামরজনসাধারণ। সারা দিনের এত ঘটনার পর, হৃদয়বিদারক ছাব্বিশ বছরের ঘড়ি চুরির কয়েক ঘণ্টা পরেই এই অবস্থা! এত অল্পক্ষণেই সন্তাপের অবসান! হয়ত সবই শ্রীভগবানের অসীম করুণার ফল।

মুখুজ্যেমশাই এতক্ষণ নির্বাক ছিলেন; বিরিঞ্চির কণ্ঠস্বর তাঁর কানে বোধহয় মধুবর্ষণ করছিল। গান থামতে রসাপ্লুত গলায় বললেন, 'বাঃ বাঃ। আহা, বিরিঞ্চি ভাই বড় ভাল গায়। কি বল?'

সে কথা বলবার অপেক্ষা।

মুখুজ্যেমশাই আবার উপরোধ করলেন, 'গাও তো স্বামীজীর সেই গানটা।—নাহি সূর্য নাহি জ্যোতি—।' বলে চোখ বুজলেন।

মেঘনাদদা ভ্রূকুটি করে বললেন, 'দূর মশাই; ভর সন্ধেবেলা রাগেশ্রী গাইব কী? আপনার কি মাথা খারাপ।'

এত বড় সাঙ্গীতিক কথাটা বোধহয় মুখুজ্যেমশাই-এর কানেই গেল না। ছই-এর গায়ে ঠেসান দিয়ে চোখ বুজে সংগীত সুধা পান করতে লাগলেন।

আমি ত্রিশঙ্কু অবস্থায় তখন ঝোঝুল্যমান। ভাগ্যিস বুঝিনা কোন গানটা কখন করতে হয়; হলওয়েল মনুমেণ্টের গল্পটা জানা

থাকলে আমার অবস্থাটা অনুমান করা যাবে। সৈনিকগুলো বন্ধ ঘরে যেমন দম বন্ধ করে মরেছিল—আমার অবস্থাও তেমনি। মেঘনাদ-দার মেঘমন্দ্রস্বরের রাগ সংগীত যে কী পরিমাণে রাগী, সে সম্বন্ধে সম্যক ধারণা করা যাবে না! তাকে বাধা দেবার ক্ষীণ চেষ্টা করে বললুম, 'আপনার তো ফিরে গিয়ে আবার কোথায় গাইতে যেতে হবে না?'

মেঘনাদ-দা গভীর হয়ে সংক্ষেপে বলল, 'সুলুটি। দু'রাত্তির।'

বোঝ ব্যাপার। দু'রাত্তির ধরে ঘনশ্যাম অপেরার 'গণেশ জননীর' নারদ গান করে যাবেন সুলুটিতে; হে বিধাতঃ!

পুরাতন শোক পুনরুজ্জীবিত করে মেঘনাদ-দা এবার যোগ করলেন, 'ওঃ কি হল বলুন দিকিনি? এই 'মুড' নে গান কি করা যাবে?'

সহানুভূতিতে করুণতম হয়ে আমি উত্তর করলুম। 'সত্যি!'

এবার একটু অপ্রাসঙ্গিক কথা···

আজ থেকে একশ বছর আগে আজকের মত কোন সন্ধ্যাবেলা—পাখির গান গেয়ে ঘরে ফেরার সময় কোনদিন যদি এসে দাঁড়াতাম ক্ষুদিরাম চাটুজ্যের এই বাস্তুভিটের পাশটিতে—আজ থেকে অনেক অনেকদিন আগে যদি হালদারপুকুরের পাশ দিয়ে লাহাবাবুদের চণ্ডীমণ্ডপ বাঁ হাতে রেখে, পাঠশালা ঘরটি পাশে রেখে, যুগীদের শিবের মন্দিরে প্রণাম করে এসে দাঁড়াতাম একবারে এই রঘুবীরের অঙ্গনে—আমরা কি দেখতাম সেদিন? বোধহয় শুনতাম···

—আহা, পথশ্রান্ত পথিক; অনেক দূর থেকে এসেছ বুঝি গো?

—আহা দূর পথের যাত্রী বুঝি তোমরা?

—অতিথি! এসো আমাদের ঘরে। বসো ক্ষণেকের তরে। দেব ছায়া—দেব জল···

আর আজ থেকে পাঁচশ বছর পরে যদি গিয়ে দাঁড়াতে পারতাম বিগত এক ঊনবিংশশতাব্দীর গৌরবদীপ্ত বাংলার এই নিভৃততম

পল্লীকুটিরে—প্রাচীন বাংলার ছিন্নপৃষ্ঠা—ইতিহাসের ভাঙা পথ সন্ধান করতে করতে—হয়ত দেখতাম, আকাশ-ছোঁয়া মহাবৃক্ষ এক দূর পথিকের এক তীর্থ পথের ঠিকানা—শ্রীধাম—শ্রীরামকৃষ্ণের বাস্তুভিটা। দেখতাম, সেই মহাঅটবী সেদিনও তেমনি ছায়ার আসন পেতে আহ্বান করছে পথিককে ; শ্রান্তি দূর করছে শ্রান্তর। দেখতাম, অনন্ত কালরূপী সেই ভাস্কর-ভস্ম-বিভূষণ সেদিনও আমার সামনে তেমনি করেই বলছেন, 'অতিথি ? এসো আমাদের ঘরে ; বসো ক্ষণেকের তরে।'—সেই সহজ-সরল-নিরলঙ্কার-নিরহঙ্কার মহাপ্রাজ্ঞ।

প্রাসঙ্গিক হলেও অপ্রাসঙ্গিকই বলবে আজকের বিজ্ঞান দাম্ভিক এই বিংশশতাব্দীর ষষ্ঠ দশক।

দাঁড়িয়েছিলাম জন্মস্থানটির কাছে ; মর্মর বিগ্রহ দেখছি শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মগ্রহণকালীন স্মারক স্বরূপ ওই বেদীটির সামনে একটি পাথরের ঢেঁকি, উনুন আর প্রদীপ।

বাঁ দিকে চাতালের পরে রামকৃষ্ণের কুলদেবতা রঘুবীরের মন্দির। পেছনে সিঁড়িতে মাটিতে রামকৃষ্ণের পায়ের চিহ্ন আঁকা তাঁর বাসগৃহটি। সবই সুসংরক্ষিত—সুললিত—সুন্দর। সব কিছুই ঠাকুর রামকৃষ্ণকে বড় কাছের মানুষ করে দিয়েছে!

আরও পুবে ভাঁড়ারঘর বলে ব্যবহৃত আর একখানি ঘর। দোতলা। তারও পরে বৈঠকখানা ঘর। ঠাকুর সেখানে বসতেন, পাঁচজনের সঙ্গে দেখাশোনা করতেন। পুব পাশে তাঁরই হাতে রোপণ করা আমগাছটি আজও শাখাপল্লব মেলে চেয়ে আছে।

আশ্রমে আমাদের আস্থানায় ফিরে এলুম এখানে ওখানে ঘুরে। দারুণ ভ্যাপসা গরম ; সারাটা দিন ধরে যেন মাটির ওপরটাকে চেপে ধরেছে ; মন্দিরে আরতি দেখতে গিয়ে মুখুজ্যেমশাই চোখ বন্ধ করে সেই যে যোগাসনে বসলেন,—কিছুক্ষণের মধ্যে তিনি যে উঠবেন এমন

মনে হল না। মেঘনাদ-দা কানের পাশে মুখ এনে ঠ্যালা দিয়ে বললেন, 'চলুন্ ফাঁকে যাই ; বেধড়ক গরম !'

যেতে আমারও ইচ্ছে ! একফাঁকে আমিও উঠে এলুম ; পেছনে পেছনে মেঘনাদ-দা। কিন্তু কোথাও যাবার তো প্রয়োজন নেই ! একদিনে কামারপুকুর দেখতে হবে বলে গরুর গাড়ি থেকে নেমেই যথাসাধ্য ঘুরে নিয়েছি ! এখন অন্ধকারে কোথাও যাবারও ইচ্ছে নেই ! খানিকটা দূরে গিয়ে মেঘনাদ-দাকে নিয়ে অন্ধকার মাঠের একধারে বসে পড়লুম। বসার সঙ্গে সঙ্গে মেঘনাদ-দার নাক দিয়ে একটি সশব্দ দীর্ঘশ্বাস পড়ল ; বুঝলুম, সাময়িক স্মৃতি-কথাই হবে বোধহয় ; মেঘনাদ-দার নিশ্চয়ই হাতঘড়ির পূর্ব স্মৃতিটা জেগেছে ; হ্যাঁ, আবছা আলোয় দেখলুম মুখে চোখে সকালের সেই করুণ ভাবটি সত্যি আবার ফুটে উঠেছে মেঘনাদ-দার। এতক্ষণ নির্বাক হয়ে ছিলেন। এবার বললেন, 'মশাই, কি কারবার দেকুন দিকিন ! লোকটা একেবারে ঘড়িটাই ঝেড়ে দিলে ? নিলি নিলি, অন্য কিছু নে' যেতে পারলি নি ? ওঃ।'

বললুম, 'কি আর করবেন বলুন। চোরের কি আর তীর্থ আছে ? ধর্মজ্ঞান আছে ? বাগে পেলেই বাগাবে। আমাকেও একবারে বুড়বাক বানিয়ে দিল !'

মেঘনাদ-দা আবার চুপ করলেন। আবার দু'মিনিট যেতে না যেতেই বললেন, 'ওই পুখুজ্যেটাই য্যাত নষ্টের গোড়া। ওর কতা শুনে জয়রামবাটিতে না থাকলেই হত !' বলে সমানে গজ গজ করতে লাগলেন।

মনে এল বলি, 'দাদা, যেখানে এখন দাঁড়িয়ে আছেন—সে লোকটাই পার্থিব কিছুই গ্রহণ করেন নি। চিরকাল বলেচেন মাটি টাকা—টাকা মাটি !' কিন্তু বলতে সাহস হল না! উত্তরে কিছু কথা শুনে লাভ কী ?

বললুম, 'কেমন লাগল কামারপুকুর !'

স্বর তেমনি উচ্চগ্রামেই বাঁধা মেঘনাদ-দার। বলল, 'দূর দূর। য্যাত চোরের আড্ডাখানা। রামকেষ্টর নাম ভাঙে কতকগুলো নোক খাচ্ছে ; নেহাৎ উপায় নেই—তাই থাকা! নইলে—'

নাঃ মেঘনাদ-দাকে আর চটানো ঠিক নয়। এই ধরনের ব্যাখ্যায় আমিও উত্তেজিত হয়ে পড়বো। নিজেকে সংযত করে কথা ঘোরালাম! বললুম, 'ঘরে গিয়ে একটু শুয়ে নেবেন নাকি?'

ইতিমধ্যে দেখা গেল জন দুই লোক আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। আসতে আসতে যেন কাকে খুঁজছেন! খুঁজতে খুঁজতে সত্যিই আমাদের কাছাকাছি! দেখি, একজন পুরুষ অপরজন একটি মহিলা! দু'জনেব হাতেই জিনিসপত্র। ছোট বেডিং ব্যাগ ইত্যাদি! মনে হল, স্বামী স্ত্রী দু'জনে তীর্থ করতে বেরিয়েছেন!

ভদ্রলোক সোজাসুজি কাছে এসে বললেন, 'আচ্ছা আপনারা কি এখানে বেড়াতে এসেছেন?'

'হ্যাঁ ; কেন বলুন তো?'

পাজামা আর পাঞ্জাবী পরা ছেলেটি বলল, 'আমরাও এসেছিলুম ; শুনেছিলুম, এখানে থাকতে দেয়—কিন্তু স্বামীজি বললেন, নো। নেই!'

আমি অবাক হয়ে বললুম, 'বলেন কী? সঙ্গে মহিলা রয়েছেন ; তবুও হল না।'

মেয়েটির মনোহারী দোকানের মোম-পালিশ করা রং চং-এ মুখখানি একেবারে যেন নিরক্ত হয়ে গেছে। মেঘনাদ-দা এবারে প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ পেলেন। আমাকে শুনিয়ে বললেন, 'দেকলেন তো? এই রাত-বিরেতে এখন মেয়েলোককে নিয়ে কোথায় দাঁড়াবে?' শেষে গর্জনান্তে বললেন, 'একখুনি চলুন ; এর একটা বিহিত করা দরগার।'

তাকে নিরস্ত করে বললুম, 'যাক ও নিয়ে গোলমাল করে লাভ নেই। যারাই রাত কাটাবেন বলে আসেন, তাদেরই আগের

থেকে যোগাযোগ করে আসার দরকার। আপনারা কিছু সাহায্য করতে পারেন কি ভাবুন।'

মেঘনাদ-দা খুব ভাবুকের মতন চোখ নীচু করে কপালে আঙুলের টোকা মারতে লাগলেন।

একটা চিন্তা আমার মাথাতেও ইতিমধ্যেই এসেছিল। উঠে ভদ্রলোককে বললুম, 'আসুন! আমাদের সঙ্গে আসুন। একটা ব্যবস্থা করতে পারবো বলে মনে হচ্ছে!'

মেঘনাদ দা বলল, 'কী?'

ভাগ্যক্রমে নিজের ভাগে একখানা গোটা ঘর পেয়ে গেছি এখানে। মেঘনাদ-দা মনের অবস্থার কথা বিবেচনা করেও বিশ্বাস ছিল না, গতরাত্রের মত আজও আমাকে সংগীত সুধা পান করে রাত জাগতে হবে। অতএব নিজের ঘর পেয়ে মনে মনে প্রফুল্লই হয়েছি! কিন্তু বললাম, আমার ঘরখানাই আপনারা আজ নিন। গরমের রাত— আমি বাইরে কাটিয়ে দোব'খন! ওদের বললুম, 'চলুন।'

ভদ্রলোক পাঞ্জাবীর পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বার করে সিগারেট ঠুকতে ঠুকতে বললেন, 'গুড্। ভেরি নাইস! লেট আস্ টেক্ এ চান্স্, শেলি। চলো!'

আমি মেঘনাদ-দার মুখের দিকে চাইলাম। মেঘনাদ-দা আমার দিকে। ভদ্রলোককে বললুম, 'খাবেন না এখানে; বারণ।'

ভদ্রলোক যেতে যেতে বললেন, 'কী বললেন—বারণ? ফানি! তখনই! তখনই বলেছিলাম, এ সব ন্যাষ্টি এফেয়ারের মধ্যে গিয়ে কাজ নেই।' শেষ অংশটি শেলিকে উদ্দেশ্য করে।

মেঘনাদ-দা কানে কানে বলল, 'কোথাকার মাল মশাই?'

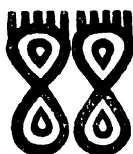
আমি চুপ চাপ রইলাম।

বিচিত্র মানুষ; বিচিত্র প্রকৃতি!...

গল্পেরও শেষ নেই।

দাওয়াতে সতরঞ্চি বিছিয়ে গরমে এপাশ ওপাশ করতে করতে

ভাবছি এইসব। ভদ্রলোকের সামান্য কৃতজ্ঞতা বোধও নেই। ঘরখানা দখলে পেয়ে বোধ হয় ভাবছেন, তারই সংরক্ষিত আসন তিনি অধিকার করেছেন; শেলি নাম্নী মেয়েটির সঙ্গে কথোপকথনের মধ্যে কেবলি কেরোসিনের আলো জ্বলা ম্লান ঘরখানির মেঝেতে পাতা বিছানার জন্যে হাহুতাশ, ফ্যান না থাকার জন্যে শেলির বুদ্ধির ওপর কটাক্ষপাত এবং সর্বশেষে, লা-রা-লা-রা সহযোগে 'দাউ মাই হনি...' বলে পাশ্চাত্য সংগীতের লালাবাই শুনতে শুনতে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম রামকৃষ্ণকে স্মরণ করে। বললুম 'ঠাকুর, তুমি তোমার অধম সন্তানদের একটু কৃপা কর।'





আট

অনেকদিন আগে একটা গল্প পড়েছিলাম, কাহিনীর পূর্বাপর আজ হয়ত মনে করা যাবে না। কিন্তু দশ বছর আগেকার সেই গল্পটি আজও অত্যন্ত স্পষ্ট ভাবে আমাব মনে বাসা বেঁধে আছে, হয়ত আপনাদের কারও কাবও চোখে পড়েছে গল্পটি! যাক গল্পটিই আগে বলি!

রাঙা-মাটির কোন এক গ্রামেব ঘটনা। মোঘল বাদশাদের আমলের বর্ধিষ্ণু গ্রাম। অধিবাসীরা বেশির ভাগই উগ্রক্ষত্রিয় কিন্তু ক ঘর ব্রাহ্মণ পরিবারের পরিবেশে জমিদারের একাধিপত্যে সেই অধস্তন জাতিটি মৃতপ্রায় এবং হতদরিদ্র! গ্রামখানি বড়ও বেশ! জংশন স্টেশন মাত্র মাইল দশেকের মধ্যেই, গ্রামে প্রাইমারী স্কুল আছে, মহাজন আছে, ডাক্তারব বু আছেন! সদর কাছারির উকীল-বাবুও আছেন! গল্পটি সেই অশিক্ষিত হতদরিদ্র কৃষিজীবী মানুষদের রক্তপানকারী এক উকীলবাবুকে নিয়ে। পটভূমিকাটি সেই গ্রাম-খানির অতি বিখ্যাত গাজন মেলা।

কাহিনীর শুরুতে এই রকম এক গরীব উগ্রক্ষত্রিয় চাষী অতিদূর পথ অতিক্রম করে, চৈত্র সংক্রান্তির দুপুর রোদে জ্বলে

পুড়ে উকীলবাবুর বাড়িতে এসে উপস্থিত হল এবং উকীলবাবুর সঙ্গে দেখা করে অনেক নিষ্ফল কান্নাকাটি অনুনয় উপরোধ শেষে উকীলবাবুর হাতে তার শেষ সম্বল জমিটুকু বেচা টাকা দিয়ে দেনার দায় থেকে নিষ্কৃতি পেল সে-বারের মত! নির্বিকার উকীলবাবু তার তামাক খাওয়া তামাটে গোঁফের প্রান্ত চুমরে গড়গড়ার জলে মনোনিবেশ করলেন। গাজনের সন্ন্যাসী বকু মোড়ল রুক্ষ একমাথা জটাপাকানো চুল সমেত মাথা চাপড়াতে চাপড়াতে চাপা কান্নায় গোঙাতে গোঙাতে পথে বেরিয়ে গেল।

উকীলবাবুও দুপুরে সেদিন ঘুমুতে পারলেন না। স্টেশনে কয়েকজন লোক পাঠিয়েছেন। কেউ কেউ ফিরেও এসেছে ইতিমধ্যে। কিন্তু সকলের মুখেই এক কথা—জামাইবাবু আসেন নি! অথচ পর পর দু'খানা চিঠিতেই বাবাজীবন লিখছে আজই সে আসবে সকালের গাড়িতে! উকীলবাবুও নতুন জামাইকে চিঠিতে যথাযথ নির্দেশ দিয়েছেন বারবার—কেমন করে কিভাবে আসতে হবে। পালকী বেহারারা স্টেশনে বসে আছে সকাল থেকে অথচ বাবাজীবন এখনও এলেন না।

সন্ধে হয়ে গেল। কলকাতার শেষ ট্রেনখানা তন্ন তন্ন করে খুঁজে উকীলবাবুর লোকেরা রাত দশটায় এসে জানাল জামাইবাবু আসেন নি! মুখে কিছু প্রকাশ করলেন না উকীলবাবু! কিন্তু ভয় পেলেন, মেয়েও আগামী সন্তানের জন্যে কাঁথার ওপর লতাপাতা সেলাই-এ মন দিতে পারল না।

অনেক রাত অবধি জেগে রইল সবাই। মনকে প্রবোধ দেবার চেষ্টা করল উকীলবাবুর আসন্ন প্রসবা মেয়ে।

পরের দিন শেষ রাতে এখানকার গাজন উৎসবের বিশেষ আকর্ষণ—মড়ার মাথা নিয়ে নাচ। সন্ন্যাসীরা মৃতদেহের ছিন্ন মুণ্ডু হাতে নিয়ে নাচ দেখাবে মেলাতলায়। উকীলবাবু বিনিদ্র রাত কাটিয়ে সেই স্বল্পালোকিত রাত্রিশেষে এক পা এক পা কোরে মেলাতলায় এসে

উপস্থিত হোলেন। দশ বিশটা ঢাকের বাজনার সঙ্গে তখন গোটা চল্লিশ শ্মশান সন্ন্যাসী আদিম বন্যতার তাণ্ডব নাচে মেতে উঠেছে।

সেখানে উকীলবাবু দেখা পেলেন তার বাবাজীবনের। জীর্ণ শীর্ণ সকালবেলায় সেই হতদরিদ্র আগুরি বকু মোড়লের হাতে খড়ের দড়িতে বাঁধা বাবাজীবনের ছিন্ন মুণ্ডটা যেন দীর্ঘদিন অদর্শনের পর সানন্দে চিৎকার করে উঠল—মনে হল প্রৌঢ় উকীলবাবুর। যেন বললে, 'বাবা আমি এসেচি।'

পরবর্তী ঘটনা থানায় বকু মোড়ল নামক হত্যা-কারীর জবান-বন্দীতে সমাপ্ত। কিন্তু মূল কাহিনীর জ্বলজ্বলে উপবাস জীর্ণ বকু মোড়লের চেহারা আমি গত দশ বছরের নানা কাহিনী দিয়েও মুছে দিতে পারিনি মন থেকে!

অবিশ্বাস্য মনে হয়েছিল লেখকের বক্তব্য। কারণ বিংশ শতাব্দীর এই শতকে বসে বিশ্বাস করতে পারিনি এই আদিমতা সভ্য মানুষের মধ্যে আজও বেঁচে আছে। সব ছাড়িয়ে লেখককেই বেশি করে মনে হয়েছিল। নামটা তাই আজও স্মরণে আছে—বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য।

আজ এতকাল পরে কুড়মুন থেকে ফিরে এসে গল্পটা তার সমস্ত বিভৎসতা, রূঢ়তা নিয়ে আ ার কাছে সত্য হয়েছে। বর্ধমান স্টেশনের দশ মাইল উত্তর পূর্বের এই রাঙামাটির গ্রামখানির সঙ্গে এক চমৎকার কাহিনী মেশাতে পেরেছিলেন লেখক।

কুড়মুনেব অন্তরে দাঁড়িয়ে রাঢ় সভ্যতার রূঢ় রূপখানি আমি যেন সেই চৈত্র সংক্রান্তির রাত শেষের উত্তাল তাণ্ডব নাচের মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছিলাম। বৈজ্ঞানিক সংস্কারটুকু দিয়ে এই অস্বাস্থ্যকর উৎসবের এই অংশটিকে নোংরা অসভ্যতাই বলেছিলুম। আর আশ্চর্য হয়েছিলুম আজকের দিনেও এর অস্তিত্বের কথা ভেবে।

এক সময় এ সব জায়গা জমিদারের খাস তালুকভুক্ত ছিল। ছোটয় বড়য় তাদের অস্তিত্ব আজও খুঁজলে হয়ত পাওয়া যায়। ভাঙা প্রাচীন মন্দিরের গায়ের টেরা কোটায়, ভগ্নপ্রায় ঠাকুরদালানে এক সময় জমিদার শীলদের আধিপত্য ছিল। তাদের গোমস্তা ছিলেন আগুরি সন্তোষ মণ্ডল। একদিন তিনিই স্বপ্নে আদেশ পান— গ্রামপ্রান্তে খড়্গেশ্বরী নদীর কলমিসায়রে পড়ে আছে এক ত্রিশির ত্রিশূলাকৃতি লিঙ্গ মূর্তি। তাঁকে উদ্ধার করে প্রতিষ্ঠা কর, গ্রামে কল্যাণ হবে—মানুষের মঙ্গল হবে। সেই ঈশানেশ্বর মূর্তিকে সেবায়েত সন্তোষ মণ্ডল প্রতিষ্ঠা করলেন। আজও মণ্ডলরা বংশপরম্পরায় সেই দেবতার সেবায়েত।

বছরের মাত্র ক'টা দিনের জন্যে ঈশানপাড়ার গাজনের মেলা সারাপ্রহর উৎসব মুখর থাকে। ৩০শে বৈশাখ পর্যন্ত বাবা ঈশানেশ্বরের পুজো হবে এ পাড়ায়। ১লা জ্যৈষ্ঠ থেকে ১৩ই চৈত্র কটা মাস কুড়মুনের গ্রাম দেবতা পাশের গ্রামে ব্রাহ্মণ ঘোষালদের মন্দিরে কয়েকটি দেব দেবীর সঙ্গে নিত্য পূজা পাবেন। পুনর্বার ১৩ই চৈত্র ঘোষালরা তাকে বয়ে নিয়ে আসবেন ঈশানেশ্বরের মন্দিরে। বছরের শেষ কটা দিন আবার সারা গাঁ ভেঙে পড়বে মেলাতলায়। গাঁয়ের প্রবাসী ছেলেরা ঘরে আসবে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা নতুন জামাকাপড় পাবে। গৃহস্থ বউ নীলাবতীর পূজায় আলপনা আঁকবে আঙিনায়। গৃহস্থ ঘরের দেওয়ালে মাটি লেপবে—দরকার হ'লে চাল ছাইবে। আবার চৈত্র সংক্রান্তির চড়ক পূজা হয়ে গেলে—ঈশানেশ্বর আর মন্দিরে না থেকে গ্রামের ব্রাহ্মণদের বাড়ি ঘুরে ঘুরে আতিথ্য গ্রহণ করবেন ; ব্রাহ্মণ আধিপত্যের এই বোধকরি শেষ ক্ষীণপ্রায় নিদর্শন।

এই রাঢ়ে—বাংলার পশ্চিম অঞ্চলের মানুষের মধ্যে অতি প্রাচীনকাল থেকেই মৃগয়া ছিল জীবিকা। এরা ছিল ডোম, বাউরী,

সাঁওতাল প্রভৃতি আদিবাসীর দল। এ অঞ্চলে অনেককাল ধরে আর্য-অনার্যের সংস্কৃতির দেওয়া-নেওয়ার ফলে অনার্যের মধ্যে যেমন আর্য প্রভাব পড়েছিল,—আর্যের মধ্যে তেমনি অনার্য প্রভাব পড়ার কোন বাধা ছিল না। এমনি করে অনার্য দেবতা শিব একদিন অরণ্যাকীর্ণ জঙ্গলমহলের আরণ্যক পরিবেশ থেকে এসে ক্রমে ক্রমে আপন মহিমায় আর্যের মন্দিরে বিরাজ করতে লাগলেন। এই অনার্য দেবতা শিব—তার নিজের অনার্য প্রজার কাছে বলির রক্ত গ্রহণ করেছেন। এবং সেই কারণে তাদের কাছে তিনি রক্তপিপাসু রুদ্র দেবতার রূপ পরিগ্রহ করেছেন। এইভাবে বছরের পর বছর ধরে এখানে এবং এর পাশাপাশি আরও কয়েকখানা গ্রাম জুড়ে লৌকিক দেবতা শিব গাজনের উৎসবের আদিতম অনার্য-বৈশিষ্ট্যে নিয়মিত পূজা পাচ্ছেন। হয়ত এমনিই হয়; লৌকিক এইসব দেবতার মধ্যে সমাজের জীবনধারণের ও ধ্যানধারণার যে স্পষ্ট ছবি পড়ে রাঢ়াঞ্চলে এই হয়ত তার রূপ। তাই হয়ত উত্তরবঙ্গের শিব কৃষিজীবি, দিন-ভিখারী। সেই কারণে প্রাগবৈদিক এই দেবতাটি কুড়মুনে এক রক্তপিপাসু ও ভয়ঙ্কর। এখানে সন্ন্যাসীদের কাছে তাই নরমুণ্ডহীন গাজন উৎসবের কোন মূল্য নেই।

আগে আশেপাশে কয়েকখানি গ্রাম নিয়ে কুড়মুনের গাজন জমে উঠত। গ্রাম্য রসিকতায়, রেষারেষিতে, গ্রামে গ্রামে ঢক্কানিনাদে উৎসবের কদিন এ গ্রাম স কিছু অভাব অভিযোগ ভুলে থাকত।

ডাঃ বিভূতি চক্রবর্তীর ডিসপেন্সারীর দাওয়ায় বসে সেই পুরানো কালের গল্প শুনতে শুনতে রাত গভীর হয়ে গেল। সন্ন্যাসীদের চিত্র-বিচিত্র মুখে নাচের কথা, নানান ধরনের বাজী পোড়ান, যাত্রাগান, পাড়ুই গ্রামের পথে শোভাযাত্রার কথা; 'ছবি' বা মাটির মূর্তি সাজানোর অনেক গল্প শুনতাম তার মুখে। আজও কিছু কিছু দেখলাম নিয়মরক্ষার মত অবশিষ্ট আছে।

বাবা ঈশানেশ্বরের সেবায়েত শ্রীননীগোপাল মণ্ডল এখন গাজনের

মূল সন্ন্যাসী। তার মুখে একদিন এ পূজার আঙ্গিকটির কথাও শুনে এলাম।

চৈত্রমাস ৩০শে হলে ২৬এ থেকে ও ৩:শে হলে ২৭এ থেকে শিবব্রত-পরায়ণ সন্ন্যাসীরা গাজন শুরু করে। হবিষ্যি-মহাহবিষ্যি ফল-উপবাস-চড়ক, এই পাঁচটি অঙ্গে গাজন শেষ হয় চৈত্র সংক্রান্তির দিন।

অনুষ্ঠানের তৃতীয় দিন অর্থাৎ ফলের দিন সন্ন্যাসীরা ফলাহারে রইল। বিকেলে দেহ মুখ চিত্রিত করে তারা বেরোল। শোভাযাত্রায় পাশের গাঁ পলাশী থেকেও অন্য সন্ন্যাসীরা এসে এদের আলিঙ্গন করে গেল। তারপর সন্ধেবেলা খড়ি নদীর ধারে গিয়ে ঈশানেশ্বরকে প্রণাম জানিয়ে সন্ন্যাসীরা পরের রাতের জন্যে নরমুণ্ড সিঁদুরে রাঙিয়ে পুজো করে গাছের ডালে বেঁধে এল—যাতে শিয়াল কুকুরের মুখে না যায়।

পরের দিন শেষ রাতে পূজাদি শেষ করে শবমুণ্ড নিয়ে তাণ্ডব নৃত্য শুরু হবে। মানুষগুলো যেন পিশাচ। 'ধর ধর মড়ার মাথা' বলে খড়ের দড়িতে বাঁধা শবমুণ্ড একহাতে অন্যহাতে দা' কিংবা খড়্গ নিয়ে রীতিমত প্রেতনৃত্য শুরু করে দিল। এর পরে হবে অগ্নি উৎসব।

রাত বারোটার সময় গিয়ে দেখি, গ্যাসের আলো জ্বালিয়ে গোটা পঁচিশ সন্ন্যাসীকে দিয়ে মণ্ডলমশাই 'দ্বারমুক্ত' করাচ্ছেন। দু' ছত্র মন্ত্রপাঠের পর নাম ডাকা আর সঙ্গে সঙ্গে ঢাকের ওপর কাঠি পড়ছে।

'হাতে ত্রিশূল রাঙালাঠি, পরিধানে বাঘের ছাল।
বৃষভ-বাহনে শিব ত্রিদেবের নাথ॥
জাগরে জাগরে ভাই সতোর কোটাল
মুক্ত হইল ঠাকুরের পূব দ্বার—॥'

এই ভাবে পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর দক্ষিণ, স্বর্গ ও গাজনের ছ'টি দ্বার

মুক্ত হল। আরও রাতে খাওয়া-দাওয়া সেরে খাটিয়ায় শুয়ে মাথার মধ্যে ঘুরপাক খেতে লাগল 'যোগভঙ্গের' মন্ত্রগুলো।

'প্রভু যোগনিদ্রা কর ভঙ্গ, সেবকের দেখ রঙ্গ
পরিহার তোমার চরণে।
কার্তিক গণেশ কোলে, শয়ন আছে নিদ্রা ভোলে (ভুলে)
আমরা তোমায় প্রণাম করিব কেমনে॥'

কালের প্রবাহধারা অনেক কিছু মুছে নিয়েছে। কালপ্রবাহে এখানেও পূজা পদ্ধতিতে কিছু অদলবদল, পূজামন্ত্রের ভাষায় কিছু কিছু পরিবর্তন এসেছে। এক এক সময় এক একজন মূল-সন্ন্যাসীর মন্ত্রোচ্চারণে মন্ত্র এক একটা রূপ পেতে পেতে আজ যেখানে উপাস্থিত হয়েছে তা থেকে এর পরিপূর্ণ অর্থ করা যাবে না। যেমন—"গোসাঞ তুমি যে অটিসিনী, যেন বটিসিনী। যেন পঞ্চ বটিসিনী যেন ধর্ম সমুদ্র, তার অধিকারী। ধর্ম্ম অধিকারী যেন ঈশ্বরের চরণ। একাদশ রূপ, সপ্ত দিকে বল্লুকা সমুদ্র; তার কিঙ্করের কিঙ্কর পঞ্চপ্রণাম করিতে আজ্ঞা হয়? আজ্ঞা হইল!" এর অর্থ লুপ্ত হোয়েছে।

'সদাশিব' প্রণামের মন্ত্র সম্ভবতঃ সংস্কৃত ভাষায়। একে দেবভাষা তার ওপর এই রকম।

"প্রথম রূপ নহি ততঃ পুরুষং
প্রভু সর্ব গুণেশ্বর ঈশ্বর হাস্যমুখং
ফণি কুণ্ডল মণ্ডিত গণ্ডযুগং
প্রণমামি সদাশিবং পাপহরণং॥"

বসে বসে নিষ্পাপ শিশুর মত শুনি। "তার কিঙ্করের কিঙ্কর, আশ্বাল অতীত ভক্তা, ছত্রিশ সাঁই, বাহাত্তর ভক্তা ঠাকুরদের আঁচলে পঞ্চ প্রণাম করিলেন। ঠাকুরের আজ্ঞা হইল; পঞ্চপ্রণামে বড় সন্তোষ হইলেন।" এরপর

"শিবের মাথায় চাঁপা ফুল,
ভক্ত নামে 'ওড়ের ফুল'॥"

—এসব যারা বললেন, তাদের কাছেও হয়ত এর বোধহয় অর্থ স্পষ্ট নয়। কিন্তু আসল লক্ষ্যবস্তু শিব। এরা তাকেই প্রণাম জানাচ্ছেন। তল্লাশ করলে বেশ নজরে পড়ে, পঞ্চাশ বছর আগেকার এই গাজনের সুরটিও এখনকার লোকের মন থেকে উবে আজ যাচ্ছে। যাবার কথাই ; যান্ত্রিক ভারতবর্ষ, যুদ্ধ পরবর্তীকালের ভারতবর্ষ ঈশ্বর চেতনা থেকে আমাদের অতি দ্রুত হাটিয়ে দিচ্ছে।

যাত্রা গানের আসর সেদিনও জমল। গাঁয়ের অপেরা পার্টি সারারাতব্যাপী অভিনয় করল। শেষের রাতে বাঁয়া তবলা, কোনটা শ্রীখোলের আকারবিশিষ্ট তুবড়ী সশব্দে সদম্ভে জ্বলে পুড়ে উৎসবের রোশনাই বাড়াল। কিন্তু পৃথিবী কোন কোণেও আজ যখন নিশ্চিন্ত অবসরের সুস্থ মন বেঁচে নেই, তখন কুড়মুনের বাসিন্দারাও সেই পুরাতন দিনগুলি শত দীর্ঘশ্বাসের পরিবর্তে আর খুঁজে পাবেন কি করে ?

এখন কুড়মুনে আসার গল্পটা একটু বলি।··

বর্ধমান এসেছিলাম কামারপুকুর থেকে সোজা বাঁকুড়া ফিরে এক রাত্তির তরুণের কোয়ার্টারে কাটিয়ে। সে তখন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে সবে বাঁকুড়াতে বসেছে। ওদিকে চৈত্র সংক্রান্তির কুড়মুন দেখে বর্ধমান হয়েই যাব পাণ্ডুরাজার ঢিবি—কলকাতায় রাজেন্দ্রকে চিঠিতে তেমনই জানিয়েছি।···অথচ কামারপুকুর থেকে বর্ধমান যাবার রাস্তা বাঁকুড়া হয়েই সুবিধে। পুরুলিয়া-কলকাতা বাসে উঠলেই হল।

সেইভাবেই বর্ধমান স্টেশনে এসে পৌছতে সেদিন দুপুর হল। যতটুকু জানি, বর্ধমানের মাইল দশেক উত্তরপূর্বে কুড়মুন যত বর্ধিষ্ণু গ্রামই হোক,—রাতের খাবার থাকবার ব্যবস্থা নিশ্চয়ই হবে না। আর অনুষ্ঠানও আরম্ভ হতে রাত হবে। এইসব ভেবেই স্নান করে

রিফ্রেশমেণ্টে খাওয়া-দাওয়া সেরে ওয়েটিং রুমে পাখা খুলে বে-আইনী বিশ্রাম করতে করতে রাত সাড়ে সাতটা বেজে গেল।...

তাড়াতাড়ি একখানা রিক্সা ধরলাম। কুড়মুন যাবার বাসও আছে; কিন্তু বাস তখন বোধহয় বন্ধ।

মাইল দশেক পথ; যেতে যেতে আরও কয়েক ঘণ্টা গেল। রাস্তা জনমানবহীন; অন্ধকার রাত। অনেক দূর থেকে গাজন মেলার মাইকে গানের শব্দ অনুসরণ করে অনেক ঘোরাঘুরির পর এসে ওঠা গেল মেলাতলায়।

আপাততঃ আহারেরও সম্ভবত প্রয়োজন নেই; রাতটা কাটাতে পারলেই নিশ্চিন্ত। একে ওকে তাকে সেরকম কথাই বলছি। ইতিমধ্যে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ। চোখে সোনার চশমা: খালি গায়ে বুকের ওপর গলার পৈতে মালার মতন দোলানো। পরিচয় হতে জানা গেল, ভদ্রলোক এ অঞ্চলের ডাক্তারবাবু; নাম বিভূতিভূষণ চক্রবর্তী। এখানে ডাক্তারীও করেন; আর করেন ধান চালের কারবার। ভদ্রলোক আমার পরিচয় জেনে নিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই কোথায় অদৃশ্য হলেন। আমিও চারধার ঘুরতে লাগলাম মেলার।

এমনি করে বোধহয় ঘণ্টা দেড়েক পার হয়ে গেছে। এমন সময় মনে হল কে একজন ডাকছেন আমায়। নাম জানেন না—ডাকছেন 'কলকাতার বাবু' বলে! লোকটি কাছে এল। বলল, 'আপনার সঙ্গে জিনিসপত্তরগুলো কোথা?'

বললুম, 'কেন?'

লোকটি সপ্রতিভ ভাবে বলল, 'ডাক্তারবাবু বললেন— আপনাকে ডেকে আনতে।'

একপাশে একজনের জিম্মায় বিছানার বাণ্ডিলটা পড়ে ছিল। নানারকম চিন্তা করতে করতে সেগুলো লোকটাকে দেখাতেই— সে তুলে নিয়ে যেতে যেতে বলল, 'আসুন'। সঙ্গে চললুম, যেন আমায়

নিশিতে পেয়েছে; নিজের পা দুখানায় আমার নিজেরই যেন কোন অধিকার নেই।

বার বাড়ির দাওয়ার ওপর আমার বিছানার বাণ্ডিলটা রেখে লোকটি বললে, 'আসুন'। তার পেছনে পেছনে সদরদরজা পেরিয়ে ভেতরে ঢুকে দেখি সত্যিই সেই সোনার চশমা পরা, গলায় মালার মত পৈতে জড়ানো ভদ্রলোক আমারই জন্যে অপেক্ষা করছেন।

দাস এবার চুরুট খেতে খেতে লাফিয়ে উঠে রাজার ঢিবির নিস্তব্ধতা ভেঙে হা-হা করে হেসে উঠল। বললে, 'আপনার চোখ মুখ দেখেই বুঝেছি—সেখানে ভুরিভোজের ব্যবস্থা। আপনাদের একটা কথা আছে না—পেটুক ব্রাহ্মণ।'

বললুম, 'সত্যি, রাত বারোটার সময় কোন গৃহস্থ অতিথি সৎকার করে আমার জানা ছিল না রাজেন্দ্র। আমরা তো কলকাতায় এসব কল্পনাই করতে পারি না।'

আমার লজ্জা দেখে ডাক্তারবাবু বললেন, 'অত সংকোচ করছেন কেন? উপদ্রব কেন হবে? গাজনের এ কদিন এ গ্রামের প্রত্যেকেরই ঘরে এসব ঘটছে—খোঁজ করে দেখুন। আমরা দু'একজন আত্মীয় স্বজনের আশা করেই থাকি! কিছু ভাববেন না; খান।'

এখন গল্পটা শুনে মাঝখানে বলল, তাহলে ভগবানের এগ্‌জিস্‌টেন্সে আপনার বিশ্বাস হল তো?

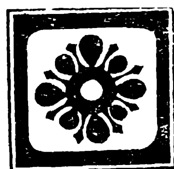
আমি হ্যাঁ না কিছু না বলে বললুম, 'তারপর শুনুন। সেই নানা উপকরণ দিয়ে ভুরিভোজ পরিবেশন করছেন অন্নপূর্ণার মতন একটি মেয়ে! ডাক্তারবাবু বললেন,—আমার বড় মেয়ে লক্ষ্মী। ও-ই তো বাপের বাড়ি এসেছে গাজন দেখতে। জামাই আসবার কথা। আজ এল না—কাল সকালেই আসবে নিশ্চয়।'

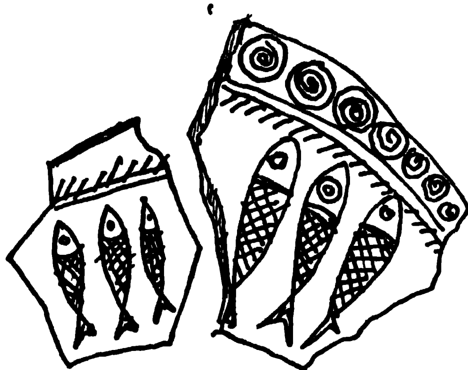
লক্ষ্মীদিদি সোনার প্রতিমার মত মুখখানি সলজ্জে গোপন করে ভেতরে চলে গেলেন।

কিন্তু সবটা দেখে শুনে বুকের মধ্যেটা টনটন করে উঠল আমার;

একি! এ যে সেই উকীলবাবুর গল্পটারই রূপ! স্বপ্নের মত গল্পটি মনে পড়ে গেল। ডাক্তারবাবুর মুখের দিকে তাকালাম। নাঃ, সেই সহজ, প্রশান্ত মুখের ওপর বিষাদের ছাপ নেই কোন। সবটা আমারই কল্পনা।

এদিকে শোবার ব্যবস্থাও হয়েছে। ডাক্তারবাবু ডিসপেন্-সারীর মেঝেতে বিছানা বালিশ পেতে মশারি খাটিয়ে ব্যবস্থা করিয়ে রেখেছেন। খাওয়া-দাওয়া সেরে তার সঙ্গে বাইরে এসে দেখি ছোট্ট টেবিলে পান, মশলা এমন কি এক গ্লাস জলও ঢাকা দিয়ে রাখা। রাজেন্দ্রকে বললুম, 'বুঝলে, এতক্ষণে আমার বিশ্বাস হল ; ভগবান না থাকুন—বাংলাদেশের অনেক ঘরে এখনও লক্ষ্মীদির মত নির্বাক অন্নপূর্ণা আর ডাক্তারবাবুর মত ব্যক্তিপুরুষ আজও আছেন।'





নয়

রাজেন্দ্র বলল, 'ওই খাবারটা না পেলে—ডাক্তারবাবুর সম্বন্ধে এসব নিশ্চয় ভাবতেন না তো ?'

কথাটা কেবলমাত্র ব্যঙ্গেরই! দাস হাসল। আমিও হাসতে হাসতে বললুম, 'ভাই, ওই খাবারটাই যে দেয়—নতি স্বীকার তো তার কাছেই করি। তাই না ?'

গল্প হচ্ছিল, বিখ্যাত 'পাণ্ডু রাজার ঢিবি'তে ক্যাম্পের বাইরে ইজিচেয়ারে শুয়ে শুয়ে। চিঠির কথামত দাস ঠিক দিনে হাজির হয়েছিল বর্ধমান স্টেশনে। তার সঙ্গে কলকাতা থেকে এসেছেন প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের আধিকারিক শ্রীপরেশচন্দ্র দাসগুপ্ত। সদা হাস্যময় ভদ্রলোকটির সঙ্গে আগেই পরিচয় ছিল। স্টেশন থেকে ক্যাম্পে পৌঁছতে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের ষাট মাইলের ওপর রাস্তায় সেই বৈশাখের দিনে জীপের মধ্যে বসে কোন কষ্টই বোঝা গেল না। পানাগড় পেরিয়ে পথ বেঁকে গেছে ইলামবাজার হয়ে শান্তিনিকেতনের দিকে ; সেই ঢাল উপত্যকাপথে নেমে এলে অজয় সেতুর অনেক আগেই ডানদিকে পথ ঘুরে গেছে অনেকদূর। সেখানে পথ এখনও কাঁচা। ট্রেনে গেলে বোলপুরের আগের স্টেশন

ভেদিয়া ! সেখান থেকে মেঠো পথ ধরে গরুরগাড়িতে রাস্তা পাঁচ ছ' মাইল হবে।

ছোট গ্রাম। নাম দীননাথপুর। তারপর পাণ্ডুপ। দুটি গ্রামের সংযোগস্থলে 'পাণ্ডুরাজার ঢিবি'।

কিন্তু পাণ্ডুরাজা কেন? মহাভারতের রাজা পাণ্ডুর কথা স্বাভাবিকভাবে বার বার মনে পড়ছিল। পরেশবাবু বললেন, না, তার সঙ্গে এর কোন যোগ নেই। হয়ত কোন রাজার সঙ্গেই নেই। গ্রামের লোকেরা ঢিবিটাকে বলে, রাজা-পোতার ডাঙা। বংশানুক্রমিক ধারায় তাই ওই নামটাই চলে আসছে। এর সঙ্গে উপকথা মিশিয়ে তারা এক যে ছিল রাজার আখ্যায়িকা রচনা করেছে। সে যাই হোক। জনশ্রুতির সঙ্গে এত প্রাচীন গল্পের মিল হল কেমন করে? পাণ্ডুপ গ্রামের রাজার ঢিবি। অতএব রোমান্স মিশিয়ে 'পাণ্ডু রাজার ঢিবি' হোক তাতে আপত্তি নেই। হয়ত কোনদিন কোন রাজা এখানে বসতি করে থাকবেন। কিন্তু তার চেয়ে বহু প্রাচীন ওই 'চ্যানেল স্পাউটেড বোল' ওই 'পারফেরেটেড' পাত্র। ইতিহাস পূর্ব-কালের শিকারীদের তৈরী লোহার তীরের ফলা আর ওই নরকঙ্কালগুলো। কে জানে কোন পাণ্ডুরাজার কলের সামগ্রী সে সব !

ভোরবেলায় যথারীতি খাওয়া-দাওয়া সেরে সকলে মিলে বেরোনো গেল।

এখানকার মাটির চরিত্র আলাদা, এখানে ঋতু বদলের চেহারাটা কলকাতার চোখে যেন কেমন কেমন। ফাগুনে এখানে শালের গাছে গাছে মঞ্জরী ফোটে। ঝাঁঝাঁ করা দুপুর রোদে বিষাক্ত পোকারা গাছের কোটরে বসে ঝিঁ ঝিঁ পোকার মতন ডাকে। বৈশাখে ওঠে ধুলোর ঝড়। রাঙ্গা ধুলো পশ্চিম দিগন্তের থেকে পুব প্রান্তরের তালের সারের দিকে এক লক্ষ দানবের অট্টহাসি হাসতে হাসতে যেন

ছুটে আসে। প্রচণ্ড সেই ঘূর্ণি, ঝড়ের শেষে আসে বৃষ্টি। রুদ্র তান্ত্রিক সন্ন্যাসীর কোটরাগত রক্তচক্ষুতে তখন যেন নাচে এক প্রলয়ঙ্করী চামুণ্ডা দেবী। কুঁড়ের চাল উড়িয়ে উত্তাল ঝড়ের আতঙ্ক জাগিয়ে এক সময় দিগন্তে শান্ত হয়ে আসে প্রকৃতি। পাতা ছেঁড়া তালের সার যুদ্ধে মৃত সৈনিকের মত স্তব্ধ হয়ে থাকে। তরঙ্গায়িত লাল কাঁকরের মাটি তখন তৃণগুল্মহীন খোয়াই-এর পিঠ তুলে জেগে ওঠে প্রকট হয়ে—প্রাগৈতিহাসিক যুগের এক-একটা অতিকায় মৃত জন্তু যেন।

তাই বলছি, মাটির চরিত্র এখানকার আলাদা। আলাদা এখানকার আকাশের রঙ। আলাদা এখানকার আদিম মানুষদের চলনবলন। তাই নিয়ে এখানে অফুরন্ত বৈচিত্র্য—কলকাতার চোখে একেবারে নতুন। বিচিত্র এখানকার জীবনও, ধর্মচিন্তাও বৈশিষ্টপূর্ণ। ইতিহাসের আদি-পর্বকালের প্রাচীনত্ব নিয়ে এ দেশ যেন বঙ্গ সংস্কৃতির চিরকালীন পীঠস্থান।

বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, মেদিনীপুরের মাটির ওপরে এই ইতিহাস, আর এখানকার বনেদী মাটির তলায় তার আর এক ঐতিহ্য। '—আছে কত সুরের সোহাগ যে তার স্তরে লগ্ন।' সিন্ধু পাঞ্জাবের মহেঞ্জোদাড়ো আর হরাপ্পার ৫০০০ বছরের ইতিহাস নিয়ে উত্তর-পশ্চিম ভারতের দিকে চোখ পেতে বসেছিলেন সারা ভারতের প্রত্নতাত্ত্বিক। শুক্‌নো কতকগুলো বইএর সাগর মন্থন করে তাঁরা একদা বার করে এনেছিলেন হিন্দুকুশ সুলেমানের কন্দরে কোন এক Chalcolithic সভ্যতার গুপ্তধন। রাজস্থান, মালয়, সৌরাষ্ট্রের প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার করলেন সিন্ধু সভ্যতার এক স্পষ্টতর ধারা। আজ বর্ধমানের পাণ্ডুরাজার ঢিবিতে সেই আর্য সভ্যতার বিলীয়মান ধারা চিহ্নটি মাটির গভীরতম অংশ হতে বেরিয়ে এসে মহেঞ্জোদাড়ো সভ্যতাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। তবে কি অজয়ের উপত্যকা থেকে আরব সাগরের কোল পর্যন্ত একদা বিস্তৃত ছিল এই সভ্যতা?

পশ্চিমবঙ্গ ও কেন্দ্রীয় প্রত্নতত্ত্ববিভাগ নৃতত্ত্ববিভাগের সহযোগিতায় সম্মিলিতভাবে পাণ্ডুরাজার ঢিবিতে কাজ করে সেই ৫০০০ বছর পূর্বের সভ্যতার সঙ্গে পূর্বভারতের নিবিড় সম্বন্ধ আবিষ্কারের কথা ভাবছেন। এ ভাবনার যথেষ্ট কারণ আছে, কারণ আবিষ্কৃত ভাঙা মৃৎপাত্রের অংশ, সচ্ছিদ্র মৃৎপাত্র, তামার অস্ত্রশস্ত্র ইত্যাদিতে সে কালের নিদর্শনটুকু আজও অবিকৃত রয়েছে।

রাজার ঢিবির স্তর ভেঙে আজ থেকে অতি সুদূর কালের যে সভ্যতার চিহ্ন বেরিয়েছে—তা' দেখে তৎকালীন জীবনধারার একটা সামান্য ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। তাদের উপনিবেশে পাওয়া গেছে মাটির কয়েকটি 'বিরাট পাত্র'—"grayish or pale-red wares thickly mixed with husks suggesting that they knew agriculture beside being naturally a hunting community in pre-chalcolithic times."

রাজার ঢিবির স্তরে পাওয়া গেছে একসময়ের বসবাসের চিহ্ন, সেখানে পেটা মেঝের একদিকে কতকগুলো উনুনের সার, চিত্রিত কালো ও লাল রঙের মাটির পাত্র। জ্যামিতিক ত্রিভুজ, তরঙ্গরেখা প্রভৃতি অঙ্কনের রীতি অনুসরণ করে এদের তাম্রপ্রস্তর যুগধারার অবিচ্ছিন্ন অংশ বলে মনে করা যেতে পারে।

পাওয়া গেছে লোহার তীরের ফলা। খ্রীষ্ট পূর্ব ষষ্ঠ শতকে বর্ণিত হেরোডোটাসের বৃত্তান্তে যে ভারতীয় তীরন্দাজদের কথা আছে—দেখে মনে করা যেতে পারে তার সমকালীন যুদ্ধাস্ত্র হিসেবে এই ধরনের লোহার ফলা ব্যবহৃত হয়েছে।

একধরনের মৃৎপাত্র, যাকে Channel-spouted bowl বলা হয়—আদি ইতিহাসে সম্ভবতঃ এগুলো পূজাদির কাজে বারি সিঞ্চনে ব্যবহৃত হত। সিন্ধু উপত্যকায় এ জিনিসের ব্যবহার হয়েছে। নর্মদা-গোদাবরী তীরের খননে, নাভ্‌দা-টোলীতে Channel-spouted bowl এই আদি-ইতিহাস যুগের বড় সাক্ষী।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের রেডিও কার্বনের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে প্রমাণিত হয়েছে আজ, এই 'পাণ্ডুরাজার ঢিবির' দ্বিতীয় যুগ তিনহাজার বছরের বেশী প্রাচীন। এখানকার প্রথম যুগের সভ্যতা আরও ২০০০ বছরের পুরোনো।

আমার চোখের সামনে সেই প্রাচীন পৃথিবীর অংশ-ভাগ উদ্ঘাটিত হল সেদিন।···

এমনিই হয়। মাটির বসুন্ধরার ওপরে একটার পর একটা কালের পলিমাটিতে সহস্র বৎসরের গড়া কৃষ্টি আর সভ্যতা হারিয়ে যায় পরবর্তী কালের প্রবাহ ধারায়। ইতিহাসের কোন অজ্ঞাত অধ্যায়ে শত শত বৎসরে পার্থিব বিভিন্ন কারণে বিলীন হয়ে যায় তারা। হয়ত তেমন কোনকালে বহিঃশত্রু সে উপনিবেশকে নিশ্চিহ্ন করে গেছে। পদাতিকের দল যাযাবর জীবনের ধারা বহন করে কত দিন ধরে উটের পিঠে, ঘোড়ার পিঠে, নদী উপত্যকার পথ ধরে নেমে এসেছিল এখানে—গড়েছিল এক সুন্দর জনপদ। হয়ত কোনদিন আবার তারা কোথায় চলে গেছে কোন ঐতিহাসিক কারণে।

তবু সেই লুপ্ত গৌরবের রোমাঞ্চকর দিনগুলো এখন অতি দূর অতীত হয়ে গেছে। রেখে গেছে একালের চোখের সামনে এক অদ্ভুত অনুভূতি—কল্পনা আর সত্যের মিশ্রণে যা অপরূপ হয়ে আছে।

এই সত্য কল্পনার রূপটুকু সংগ্রহ করবার জন্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রত্নতত্ত্ববিভাগের ডিরেক্টার শ্রীদাসগুপ্ত, সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীচক্রবর্তী এবং কেন্দ্রীয় সরকারের অ্যাসিস্ট্যাণ্ট সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রী আর. পি. দাসের চোখ আমাকে ধার করতে হল। রাজার ঢিবির স্তরে স্তরে এই বিদগ্ধ ব্যক্তিদের সাহচর্য না পেলে আমার কাছে সবই গ্রীক ভাষার মত দুর্বোধ্য থেকে যেত। ক্যাম্পে সহযাত্রী বন্ধুস্বভাব শ্রীদাস বিগত ৪,০০০ বছরের গাঢ় অন্ধকারের অতলে হাত ধরে পৌঁছে দিয়ে গিয়েছিলেন আমাকে।

পূর্ব থেকে পশ্চিমে বিস্তৃত এই রাজার ঢিবিতে ঘুরতে ঘুরতে এরাই একদিন পেয়েছিলেন 'মাইক্রোলিথ' আর অজস্র প্রস্তুরীভূত কাঠের টুকরো। পেযেছিলেন Black & red potteries। অনুভব করেছিলেন এক প্রাচীনত্বের স্মৃতিচিহ্ন। কিন্তু কে জানতো সার সার নরকঙ্কাল শুয়ে আছে এখানকার মাটির এগারো ফুট নীচে। ঘুমিয়ে আছে এক ঐতিহাসিক ঘুমে natural soilএর ঠিক ওপরে। সঙ্গে আর একটি সমাধি পাওয়া গেল এদের ভাষায় যাকে বলা হয় secondary burial, মানে প্রাথমিক সমাধিস্থ করার কিছুকালের মধ্যে তৎকালীন প্রথা মত সমগ্র কঙ্কালাস্থি সংগ্রহ করে বিশেষভাবে সেগুলো সাজিয়ে রাখা সমাধি। এমন একটি সমাধির মাথার কাছে রক্ষিত আছে একটি সচ্ছিদ্র মৃৎপাত্র। অথর্ববেদে উল্লেখ আছে—মৃতদেহ সমাধিস্থ করার পর সচ্ছিদ্র পাত্র দ্বারা অস্থির ওপর পুণ্যবারি নিষিক্ত করা রীতি ছিল তখন—কোথাও কোথাও ঘৃত বা মধুও। সচ্ছিদ্রপাত্রটি তারই নিশ্চিন্ত সাক্ষী। তা যদি হয়—তাহলেও আমরা বৈদিক যুগেব আগে চলে যেতে পারি, সেও খ্রীষ্ট পূর্বাব্দের যুগের কথা।

আগেই বলেছি, রাঢ়ের ভূগোল আলাদা, ইতিহাসও আলাদা। নানান রাজকাহিনী, নানান ধর্মচিন্তা, নানান শ্রুতিসুখকর উপাখ্যান বাংলার দক্ষিণাঞ্চলেব থেকে রাঢ়ে যেমন স্বতন্ত্র ধারাবাহী—তেমনি মাটির তলেও এখানে ফল্গু নদীর মতন এক অখণ্ড ঐতিহ্য স্রোত। বৈজ্ঞানিক মানদণ্ডে হয়ত আজ তাদের সকলের পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সত্যাসত্য নির্ণয় দুঃসাধ্য। তবু তাম্রপ্রস্তর যুগের চরণচিহ্নমণ্ডিত ভারতের পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে উত্তরপশ্চিমের ঘনিষ্ঠতার কথা আবিষ্কৃত হলে আমরা আনন্দিত হব। খ্রীষ্টপূর্ব ১০০০—২০০০ বছর আগেকার হরপ্পার যে সভ্যতা পৃথিবীর ইতিহাসে এক বিরাট দলিল উদ্‌ঘাটিত করেছিল—তার প্রবাহধারা বহমান নদী স্রোতের মত লোকচক্ষুর অন্তরাল দিয়ে যে এদিকে এসেছিল—তা প্রমাণিত হলে একটা বড় সত্যের সংবাদ আমরা পাব।

কিছুদিন আগেও জয়দেব কেঁন্দুলীর কাছে জনহীন পরিত্যক্ত মন্দিরা-গ্রামের উঁচু ঢিবি অজয়ের উত্তরকূলের প্রসারিত বালিয়াড়ির দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখেছি। শ্রীদাসগুপ্ত সেগুলো দেখিয়ে বলেছেন, ওদের গর্ভে লুকানো আছে এক প্রাগৈতিহাসিক জগতেব ঐশ্বর্য।

একদিন তাম্রলিপ্তিতে বন্দর ছিল আমাদের। তরঙ্গায়িত মাটিব গভীরে অজয়েব উত্তরে সুরত রাজার ঢিবি ইশাবা জানিয়েছিল এক প্রাচীন সভ্যতার। কুনুর নদী বিধৌত অঞ্চলে বসন্তপুর আর অজয় কুনুর মিলন ক্ষেত্রের কাছে মঙ্গলকোটের প্রাগৈতিহাসিক ধ্বংসাবশেষ একদা আমাদের উৎসাহিত করেছিল। আজ বাজা পোতার ডাঙা এ বিশ্বাসের দলিলে স্বাক্ষরোদ্যত যেন।

প্রাগৈতিহাসিক তো বটেই। ঢিবিটা একটা প্রাগৈতিহাসিক জলজন্তু যেন—জলের ওপর পিঠ জাগিয়ে পড়ে আছে যুগযুগান্তর ধরে। ঢিবির শেষে ধানের ক্ষেত; দূরে দূবে ছু'একটা ক্লান্ত তালগাছ একপায়ে দাঁড়িয়ে। পরিচ্ছন্ন আকাশটা ঔদাসীন্যে থমথমে। ছুপুরের রোদে দূরে মাঠের প্রান্তভাগে বাতাস ঝি ঝি করে কাঁপতে কাঁপতে জলহীন মরুভূমির মত ভয় দেখায়। তার মধ্যে পনেব কুড়িটা লোক জীবন সমর্পণ ক'রে কাজ কবে যাচ্ছে। মাপ-জোখ, সকাল থেকে সন্ধ্যা ড্রইং আর প্ল্যান; চলছে, কালিবাবর কাল কাপড়ে মাথা মুখ ঢেকে ফিল্ড ক্যামেরায় ছবি তোলা। অতগুলো লোক, অত দায়িত্বের কাজ, সবকিছুই নিজের প্রয়োজনে যেন এগিয়ে চলেছে; তাড়াতাড়ি এবছরের মত কাজ শেষ কবতে হবে। জানুয়ারী থেকে পাতা ক্যাম্প তুলতে হবে বৃষ্টি নামবাব আগেই। অতগুলো 'এক্সপোজড্ বেরিয়াল' পড়ে আছে। মাটির মধ্যে আরও ছু'একটা নিশ্চয়ই আছে। সেগুলো নিবিষ্ট মনে বসে বসে তুলছে এ্যানথ্রপলজির অনাদি পাল।

মোটাসোটা শান্তশিষ্ট ভদ্রলোক সুপারিন্‌টেণ্ডেন্ট চক্রবর্তী। বললেন, 'তা, কুড়মুন না কোথায় মানুষের তো মাথা নিয়ে নাচ দেখে এলেন। এখানে কি আমাদের ওই পচা কঙ্কালগুলো দেখে আশ মিটছে ?'

বললুম, 'দেখেশুনে মনে হচ্ছে এখানকার মাটির সঙ্গে যেমন ভাবে লেগে আছেন—আপনারাই খুব কয়েক দিনের মধ্যেই কঙ্কাল বনে যাবেন।' ওইটাই ইনটারেষ্টিং।

দেখতে দেখতে কাল-বোশেখের ঝড়ে দূরের আকাশ ঝাপসা হয়ে এলো। বিকেলের দিক। সূর্যকে ঢাকা দিয়ে অনেকক্ষণ আগে থেকেই মেঘলা হয়ে আছে। দূরের আকাশ দেখে সাঁওতাল কুলিগুলো বলল, 'বাবু ঝড় আসছে!'

সে ঝড় সত্যিই এলো। এক নিমেষে উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম, আকাশের ঈশান অগ্নি নৈঋত আর বায়ু সব কোণ থেকে একটা প্রমত্ত ঝড় ক্ষুধিত শ্বাপদের মত হুঙ্কার দিয়ে ছুটে এলো! সামনে যতদূর দেখা যায় রাঙা ধুলোয় পাঁশুটে আকাশটা একটা কূলহীন সমুদ্রের রূপ নিয়েছে! যে যতখানি পারল বাঁচাবার চেষ্টা করল নিজেকে। জিনিসপত্র গোছগাছ করে ট্রেঞ্চ ছেড়ে বেরিয়ে আসবার সময়ও পাওয়া গেল না। কোনরকমে সেই ঝড়ের দাপটে হামাগুড়ি দিতে দিতে সামনের ভাঙা স্কুল বাড়িটায় আশ্রয় নিলাম সকলে।

সেই ঝড়ের মাতলামোর সঙ্গে এবার আরম্ভ হল বৃষ্টির এলোমেলো আলুথালু হাওয়ার কি আক্রোশ তখন! এতক্ষণ ধুলোয় চারচত্বর ঢাকা ছিল; এবার জলকণিকা দৃষ্টিপথ আচ্ছন্ন করে দিল।

ওধারে তালপুকুরের পাড়ে সার বাঁধা তাল গাছগুলো যেন সাঁই সাঁই ঝড়ের সঙ্গে হাততালি দিতে দিতে আত্মহারা হয়ে টলে পড়ছে—আবার উঠে দাঁড়াচ্ছে। রাস্তার ওপাশের ওই খড়ের ঘরের সার থেকে এক ঝড়ের হাহাকার একখানা চালাকে ছিঁড়ে দূরে টেনে ফেলে দিল; চারদিক খোলা টিনে-ছাওয়া ভাঙা স্কুল

বাড়িটার দাওয়ায় দাঁড়িয়ে, ভিজে কাঁপছি আর ভগবানকে বলছি, ভগবান, আমাদের চালখানাকে যেন তুমি উড়িও না।...

এমনি করে চলল অনেকক্ষণ।

হঠাৎ এক সময় দেখা গেল ট্রেঞ্চের মধ্যে থেকে সোলার টুপিপরা একটা মাথা উঠে আসছে। সাবধানে মাটির ওপর উঠে এলো লোকটা। তারপর কোনরকমে ওই জল আর ঝড়ের মধ্যে দিয়ে গুঁড়ি মেরে মেরে আমাদের দিকে এগিয়ে এলো।

এতক্ষণ কেউ খেয়াল করেনি। এই জল ঝড়ের মধ্যে ওই পনের ফুট ট্রেঞ্চের মধ্যে ভদ্রলোক এতক্ষণ বসে ছিলেন। সকলে নানাভাবে ভর্ৎসনা করল।—সত্যিই তো এতটা সাহস ভাল নয়। এই জল ঝড়ে দেওয়ালে ধ্বস নামতে পারত! কিন্তু ডিপার্টমেন্টের সাইটের দায়িত্ব এড়াতে পারেননি পরেশবাবু! অকস্মাৎ এই অবস্থা দেখে বিমূঢ় হয়ে রয়ে গিয়েছিলেন ভেতরে।

ভদ্রলোক উত্তেজনার সঙ্গে বললেন, 'জানেন এক্সপোজড্ বেরিয়ালগুলো এমনভাবে তেরপলে ঢেকেছি—এক ফোঁটা জল লাগবেনা। সেই জন্যেই তো দেরী হয়ে গেল,'—বলে ভাবভোলা হাসি হাসতে লাগলেন।

বর্ষণ আর ঝড়ের তাণ্ডব তখনও সমানভাবে চলেছে। আমরা ভিজে পাখির মতন ঝাপটা বাঁচাতে একপাশে একপায়ে দাঁড়িয়ে কাঁপছি।

কিন্তু ঘন্টা কয়েক যেতে না যেতে কোথায় গেল এই বর্ষণ আর ঝড়ের তাণ্ডব।

রাত দশটায় খাওয়া-দাওয়া শেষ করে রোজকার নিয়মমত কেউ আর খাটিয়া বার করে আনল না বাইরে। পরিবর্তে ইজিচেয়ারগুলো বার করতে বলে পরেশবাবু বললেন, 'আজকের আকাশের চাঁদ দেখে আমার গান গাইতে ইচ্ছে করছে যে।'

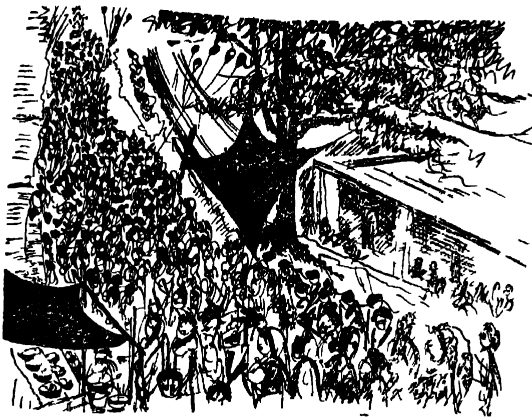
রাজেন্দ্র রসিকতা করে বলল, 'অন্যকিছু নয় তো?'

মৃদু হেসে পরেশবাবু ধরলেন, 'আজ জ্যোৎস্নারাতে সবাই গেছে বনে—বসন্তের এই মাতাল সমীরণে'।

কোন কথা না বলে সকলে নির্বাক হয়ে শুনতে লাগল। এত ভাল লাগল কেন? পরেশবাবু গায়ক নন। আজ বসন্তের পূর্ণিমাও নয়···তবু ভাল লাগল সকলের। রাজেন্দ্র ম্লান হেসে বলল, 'সত্যি গর্ব করার মত গান আপনাদের আছে।'

পরিস্কার ঝকঝকে আকাশের চাঁদের আলোর নীচে গানে আর গল্পে অনেকক্ষণ কেটে গেল।





দশ

আর দু'দিন দেরী বৈশাখী পূর্ণিমার। মনে মনে বাড়ি যাবার তোড়জোড় করেছি। দাসেরও ফিরে যাবার তাড়া আছে। পবের দিন সকালেও যাবার পথ আটকে দাঁড়ালেন পরেশবাবু—'যাবেন কোথা? এত বৃষ্টির পর পথঘাট কি কিছু আছে?'

'কিন্তু—'

'কোন কিন্তু নেই, আজকের দিনটা শুকতে দিন! কাল সকালে গরুরগাড়ি বলা আছে!' গম্ভীর হয়ে বললেন, 'আপনারা স্বজন অতিথি নেমন্তন্ন করে এনে ভাল মন্দ খাওয়াব কোথা।·· তা নয়।···'

বললাম, 'আপনি কি ভাবলেন নেমন্তন্ন খাবার জন্যেই এসেছি?'

পরেশবাবু কথার ওপর থাবা দিয়ে বললেন, 'আমি আপনাদেব ওই ধারণাটাই পাল্টে দোব। আপনাবা বলেন, আমরা প্রি-হিষ্ট্রী করি বলে, খাওয়া-দাওয়া তুলে দিয়েছি!' আমার দিকে চেয়ে বললেন, 'আপনার কুড়মুনে রাত একটার ভুরিভোজনের গল্প শুনিয়ে আপনি প্রথমেই আপনার আসল বক্তব্য শুনিয়ে দিয়েছেন। এখন আতিথ্য গ্রহণে ত্রুটি হলে আমার প্রেস্টিজ থাকবে কোথায়?'

সকলে সমস্বরে হো হো হাসাতে আরও লজ্জা একেবারে কোণঠাসা করে দিল আমায়।

পরের দিন গরুরগাড়িতে মাইল ছয় পথ পার হয়ে ধান কাটা মাঠের মধ্যে দিয়ে ভেদিয়া স্টেশনে পৌঁছন গেল। আপাততঃ আব কোথাও নয়। সোজা বাড়ি যেতে হবে। অন্তত বাড়ির ভাত খেয়ে আমতার-মেলাই চণ্ডীটা সেরে নিতে পারবো।

দাস বলল, 'সখ তাহলে মিটেছে বলছেন।' বললুম, 'সখ কি মশাই, এমন একটা মহৎ কাজ করছি জানলে, সরকার থেকে শিরোপা পেয়ে যেতে পারি। আমার কি এনার্জি উবে গেছে ?'

অনেকদিন ধরেই মনে হচ্ছিল গভীর ও গম্ভীর পরিবেশের মধ্যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থ গৃহের একান্ত নিভৃতে বসে জ্ঞানার্জন করে সে জ্ঞান বিতরণ করা এক জিনিস আর নির্দিষ্ট কোন উদ্দেশ্য না নিয়ে সরেজমিনে বাংলার সুদীর্ঘ কালের প্রচলিত জীবনছন্দের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় লাভ করা আলাদা এই দুটোতে গাঁটছড়া বাঁধার প্রয়োজন যে কত বড়—আমাদের মধ্যে সে বোধটুকু লুপ্ত হয়ে এসেছে। এখন গবেষক যেমন একদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থগৃহের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবেন—অন্যদিকে তেমনি কষ্ট স্বীকার করে সোজাসুজি সংস্কৃতির পাদপীঠের একেবারে সামনে তাঁকে উপস্থিত হতেই হবে।

দাসের ওখান থেকে বাড়ি হয়ে সোজা আমতা এসে উঠেছিলুম সেই সংস্কৃতির পাদপীঠের সামনে।

বাংলাব এক অতি প্রাচীন আদিবাসী গোষ্ঠী ওঁরাও সম্প্রদায়ের ইতিহাস পড়তে গিয়ে পাঠকের অতি সহজেই চোখে পড়বে, তাদের ধর্মজীবনে মৃগয়া বা যুদ্ধের দেবী হিসেবে এক 'চণ্ডী' দেবীর উল্লেখ আছে। আবাব ওঁরাওদের 'চণ্ডীদেবী'র সঙ্গে দ্বাদশ, ত্রয়োদশ শতাব্দীর 'চণ্ডীমঙ্গলে'র ব্যাধ কাহিনীর মিলও কপোলকল্পনা নয়। অতএব ধরে নেওয়া যেতে পারে হাজার হাজার বছর প্রাচীন আদিবাসী কল্পনায়

'চাণ্ডীবোঙ্গা' এক নতুন রূপ ধারণ করে বাংলার নানাস্থানে মঙ্গলচণ্ডী, ওলাই চণ্ডী, ব্রাহ্মণী চণ্ডী, কুলুই চণ্ডী, শুভচণ্ডী, নাটাই, ঘোর, এমনকি উড়ন চণ্ডী হয়ে ছড়িয়ে আছেন গ্রামের হাটতলায়, মাঠের শেষে, বারোয়ারি তলায় কিংবা গাছের কোটরে। এঁদের নিবাসও সুদীর্ঘ কালের ; কোন কোন লৌকিক সত্যকে অবলম্বন করে লৌকিক দেবতা রূপে ইনি বিভিন্ন নামে পূজিতা। বোধকরি জনশ্রুতি ও ঐতিহাসিক পটভূমিকা থেকেই এদের উদ্ভব। আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় যথার্থই বলেছেন, 'বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানীয় অবস্থা হইতে অনেক সময় পরস্পর স্বতন্ত্র প্রকৃতির যে সকল স্ত্রীদেবতার পরিকল্পনা করা হইয়াছিল, তাহাই কালক্রমে এক সাধারণ চণ্ডী নামের মধ্যে আসিয়া স্থান লাভ করিয়াছে। পুরাণে দেখা যায় সকল শক্তি দেবতাই কালক্রমে শিবের একমাত্র পত্নীরূপে পরিণতি লাভ করিলেও ইহাদের উদ্ভবের ইতিহাস পরস্পর স্বতন্ত্র ছিল।'

কালক্রমে আরও হল, আদিবাসী সংস্কৃতির ধারক ও বাহকদের হাত থেকে এই পূর্ব ভারতীয় দেবী আর্য সমাজে আসন পেয়ে এক নতুন বৈশিষ্ট্যে ও নিজস্বতায় একেবারে স্বতন্ত্র হয়ে গেলেন এই চণ্ডী নামে। মূলে তিনি শক্তি দেবীই। অতএব শক্তি আরাধনায় তাঁর স্থান সর্বাগ্রে। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে তিনিই দুর্গা, নারায়ণী, ঈশানী, বিষ্ণুমায়া, শিবা, সতী, নিত্যা, সত্যা, ভগবতী, সর্বাণী, সর্বমঙ্গলা, অম্বিকা, বৈষ্ণবী, গৌরী, পার্বতী, সনাতনী। এবং ইনিই চণ্ডী—পুরাতন কালের সঙ্গে সূক্ষ্ম সূত্রে গাঁথা।

কিন্তু হাওড়ার মেলাই চণ্ডীর মেলায় এসে সুদীর্ঘ কালের গবেষণার এইসব তথ্যগুলি মাথা থেকে লুপ্ত হয়ে গেল। এক কালের ইতিহাস অন্যকালে লুপ্তপ্রায় হবেই—এটা সত্য কথা। কিন্তু তার চেয়ে সেদিন যে সত্য-কথাটা ভীষণভাবে মন এবং শরীরকে পীড়িত করেছিল—সেটা বৈশাখী পূর্ণিমার সকাল থেকে দর্শনার্থী যাত্রীদের

ভিড়। তবু স্থানীয় ভদ্রলোকদের জবানবন্দী,—'এ আর কি ভিড় দেখছেন। অন্যান্য বারের থেকে কম।'

হাওড়া ময়দান স্টেশনের সাতটা বাইশের ট্রেন বেলা সাড়ে দশটা নাগাদ আমতা পৌঁছেছিল মাত্র গোটা পঁচিশ মাইলের পথ অতিক্রম করে। যাত্রাপথটি খুবই সহজ। আরও সহজ মার্টিন কোম্পানীর মনুষ্যবাহী বাষ্পীয় শকটগুলি! তাদের চলাফেরা কলকাতার রাস্তার দুর্মদ দস্যু রয়েল বেঙ্গল মার্কা বাস কিংবা হাওড়া স্টেশনের দুর্ধর্ষ দূর পাল্লার ইঞ্জিনগুলোর মতন কোনকালে বেহিসেবী আর অশালীন নয়। কলকাতার ইতিহাসে লালিত, ভাগীরথী বিধৌত, বারাণসী সমতুল গঙ্গার পশ্চিমকুলের বেশ কিছু দান আছে বাংলার সংস্কৃতিতে। এ দিক দিয়ে হাওড়া জেলাকে দধিচী মুনির সঙ্গে উপমিত করা চলে। কাব্যে উপেক্ষিতার মত হাওড়ার অঞ্চল কলকাতার আলংকারিকের কাব্যলোকে অস্পৃশ্য ; কারণ আর যাই হোক, পদ্মাপারের মত গঙ্গাপারের কথা শুনলে উত্তর কলকাতার বিবর-বাসিন্দাদের মনও ছায়াচ্ছন্ন হয়ে আসে যেমন, দক্ষিণাঞ্চলের প্রাণে সাপ, মশা, মাছি অধ্যুষিত এবং সর্বোপরি নিশি যোগে শিবাকুলের করুণ রোদনধ্বনি পরিপ্লাবিত হাওড়া দারুণ ত্রাসের সঞ্চার করে। অতএব বিশ্বকর্মার শিল্পাঞ্চল হিসেবে সংস্কৃতির দেবীমূর্তির কাছ থেকে শতহস্ত দূরে অবস্থান করে অন্ধকারাচ্ছন্ন 'ডার্ক কন্টিনেন্টের' মত অধস্তন হাওড়া জেলা পড়ে আছে।

অবশ্য আমাদের আলোচনা থেকে ক্রমশঃ দূরে সরার আগে আমতার মেলাই-চণ্ডীর উৎসবের কথাই বলা উচিত। অবজ্ঞাত এই হাওড়া জেলার উত্তর পশ্চিম সীমানা বরাবর আমতা মাহিষ্য প্রধান মেদিনীপুর জেলার সংলগ্ন থাকার ফলে প্রাচীন কাল থেকেই এই অঞ্চল মাহিষ্য ধীবর প্রভৃতির সংস্কৃতিতে অত্যন্ত পুষ্ট। এবং মনে হয় অন্যান্য অনেক অঞ্চলের মতই আমতার চণ্ডীঠাকুরাণী সেই আর্যেতর

সমাজ থেকে ক্রমশ সরতে সরতে নব কলেবরে এখানে ব্রাহ্মণ্য সমাজের হাতে আত্মসমর্পণ করেছেন। এমন অনেক হয়; সামাজিক কারণে বহুযুগ পূর্বের এক জাতির দেবতা যুগান্তে ভিন্ন জাতির হাতে চলে আসেন। যেমন দেখছি, সুন্দরবনের ওঁরাও লক্ষ্মী পূজা করছে; মুসলমান সম্প্রদায়ের অনেক লোক ধর্মরাজের গাজনে মানত করছে; তেমন ভাবে অবৈদিক এই আর্যেতর দেবী ক্রমে নানাপ্রকার প্রভাবের আশ্রয়ে থেকে প্রাচীন দিনের সেই আদিমতম রূপের রূঢ়তাটুকু হারিয়েছেন।

যাক সে কথা।··

ট্রেন-সমাজ অপাংক্তেয় মার্টিনের ট্রেন গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দিয়েছিল বৈশাখী পূর্ণিমার দিন সকাল সাড়ে দশটায়। এমনিতেই নাকি এই লাইট রেলওয়ের যাত্রীরা ভিড় বাঁচিয়ে চলন্ত গাড়ির ছাদে বসে নির্বিঘ্নে তাশ খেলতে খেলতে চলেন তার ওপর এই বিশেষ দিনটির খ্যাতিতে মেলা দর্শনার্থীদের ভিড়ে গাড়ির ভিতরে দাঁড়ানোই এক কষ্টসাধ্য ব্যাপার। চলন্ত থার্ড ক্লাশ কম্পার্টমেণ্টেই উপবাস-জীর্ণা রোগগ্রস্তা কাউকে কাউকে জ্ঞান হারাতে দেখেছিলাম।

এখানকার মেলাইচণ্ডী ঠাকুরাণীর আবির্ভাব একদা দামোদরের ওপারে, ইদানীং কালের মন্দির থেকে প্রায় মাইল খানেক দূরে, জয়ন্তীতে। কাহিনী হল, উন্মত্ত মহাদেবের স্কন্ধে বিষ্ণুচক্রে সতীদেহের ছিন্নাংশ থেকে আবির্ভূত অন্যান্য পীঠস্থানের মধ্যে একটি হল জয়ন্তীর এই মেলাই চণ্ডী। এখানে নাকি পড়েছিল সতীর জানু। তখন দেবীর পূজা করতে আসতেন ওপারের ব্রাহ্মণ প্রধান অঞ্চলের সেবাইত। নিত্য এই আসা-যাওয়ার পথে বাধা থাকা স্বাভাবিক; বিশেষতঃ মধ্যে যদি দামোদরের মত নদ নানা মূর্তিতে বিরাজমান থাকেন বৎসরের বিভিন্ন ঋতুতে। অতএব

বাংলাদেশের সেই অতি প্রচলিত রীতিতে দেবীকে স্থানান্তরিত করে স্বপ্নাদেশে এপারে নিয়ে আসা হল। (আমার মনে হয়েছে পূর্বকালে দামোদরের তীরভূমি জুড়ে যে আদিবাসী গোষ্ঠী বা অন্ত্যজ শ্রেণীর আধিপত্যের উল্লেখ পাই, চণ্ডী যদি তাদের লৌকিক দেবী, এঁবং পরবর্তীকালের ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি প্রভাবে এবং একাধিপত্যে যদি অন্ত্যজ শ্রেণী প্রভাবিত হয়ে থাকেন, তবে নিজেদের অধিকারের মধ্যে টেনে আনার একটি ঐতিহাসিক বিবৃতি এই ঘটনার মধ্যে অতি স্পষ্ট হয়ে আছে।)

অতঃপর দেবীর এ স্থানে আগমনের পর দামোদর নদে কোন এক বণিকের নুনের নৌকাডুবি হল। বণিকের প্রার্থনায় সন্তুষ্ট দেবীর বরে নুনের নৌকাগুলি উদ্ধাবের পর বণিক কর্তৃক মেলাই চণ্ডীর মন্দির নির্মিত হয়েছিল আজ হতে ৩১৫ বৎসর পূর্বে—অর্থাৎ বাংলা ১০৫৬ সনে। মন্দিরে লিপি বোধকরি কিছু ছিল। কিন্তু দীর্ঘ দিনের সংস্কারের মার্জনার ফলে সেটি আজ বিলুপ্ত। সম্ভবতঃ নির্মাতা কোন এক কর্মকার। মন্দিরটি এবং চণ্ডী দেবীর প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে 'কবিকঙ্কণের' চণ্ডীতে উল্লেখ দেখে বোঝা যাবে।

ও, ম্যালীর 'ডিষ্ট্রীক্ট গেজেটিয়ারে' আমতাকে বাংলার একটি বিখ্যাত শিল্পকেন্দ্র বলে বর্ণনা করা হয়েছে। দামোদরের পথে এখানে মেদিনীপুর থেকে নুন এবং রাণীগঞ্জের কয়লাখনি অঞ্চলের কয়লার যে একদা একটা বড় ঘাঁটি এখানে ছিল—তা নদীতীরের একটি অঞ্চলকে বন্দর বলে অভিহিত করার মধ্যে পুরাতনের সেই সৌরভটুকু বজায় আছে।

কিন্তু একদা যা ছিল—আজ তা নিঃশেষে বিলীন। হয়ত মা-চণ্ডীকে কেন্দ্র করে একদা যা ছিল না—আজ তাই আছে। আছে দেশ বিদেশ থেকে আগন্তুক হাজার হাজার দর্শনার্থী। মা-র বাড় বাড়ন্ত হতে হতে বেশ খানিকটা ভূসম্পত্তির বাৎসরিক আয়। গ্রামভরা সেবাইত। এবং দশ বিশ পঞ্চাশ রকমের মোকদ্দমা আর পাঁচটা

গ্রাম দেবতাকে জড়িয়ে যেমন পল্লবিত হয়ে থাকে। এগুলো পূর্ব কালে থাকে না, পরে যুক্ত হয়।

সে কথা থাক। আমতার মেলাই চণ্ডীর অঙ্গনে বৎসরান্তিক যে অধিবেশন বসে তার আবেদন যেমন পূর্বে ছিল এখন তার থেকে কিছু বেড়েছে। ধর্মপ্রাণতা সেই অনুপাতে কম হলেও ইদানীংকালের উৎসব-গুলির সাজসজ্জা উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে। আধুনিক বিজ্ঞান পরিবেষ্টিত মানুষের মনে দেবতা সংক্রান্ত যে প্রতিক্রিয়াই থাকুক না কেন—কেবল মাত্র আপন গ্রামের, আপন ক্ষেত্রের মানুষের জন্যে নিছক পরোপকারীর চেতনা নিয়ে একদল নিঃস্বার্থ যুবককে এগিয়ে আসতে আজও দেখা যায়। তাদের প্রয়োজনই সর্বাগ্রে। এমন সর্বত্রই আছে এবং সেইটেই এক বিষয়ে ধর্ম সাধনার নামান্তর। ঢাকীর পিঠের জয়ঢাক যেমন বাদকের দৃষ্টির আড়ালে থেকেও যথানির্দিষ্ট নিয়মে বেজে চলে—এরাও তেমনি কোনদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ না করে আপন কর্মপ্রাণতায় উচ্ছল হয়ে কাজ করে চলেছেন দেখেছি। যাত্রীকে কেবলমাত্র যন্ত্রণা দেবার ষড়যন্ত্র যে সব তীর্থক্ষেত্রে নজরে পড়ে—আমতার মেলাই এর মেলায় তা চোখে পড়েনি। অবশ্য আছে। সীমান্তের সিঁদূরের মূল্য আদায় করার জন্য জোড়-হস্ত-ধারিণী সাবিত্রীর পাশে যেমন ছদ্মবেশী ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি দণ্ডায়মান আছেন—যেমনি শিবমন্দিরের দাওয়ায় রং-চটা অতি জীর্ণ নারায়ণের মূর্তিকে দাঁড় করিয়ে সনাতন ব্রাহ্মণ্য রীতিতে ভিক্ষার্জনের ব্যবস্থা চোখে পড়বে। সেখান থেকে চোখ ফিরিয়ে নেওয়াই অবশ্য আমাদের কর্তব্য।

বিবরণী অনেক দেওয়া যেতে পারে। বাংলা দেশের বোধকরি সব মেলাই একই রকমের বৈচিত্র্যহীন মনে হতে পারে। কিন্তু মেলাই-এর বৈশাখী পূর্ণিমার উৎসব এমন একটা পুরাতন শতকের ঐতিহ্যকে আজও ধারণ করে আছে—যা আমাদের সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ

করবে। সেটি হোল লাঠিখেলা। এককালে বাংলার বাহুবল তেল চকচকে পাকা বাঁশের লাঠির মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। গ্রামীণ বাংলা সাহিত্যে তার নজীরও আছে। সেই আদিবাসী সংস্কৃতির একটি ধারা মরণোন্মুখ হয়ে আমতার মেলায় আজও অংশ গ্রহণ করে আসছে বছরের পর বছর—দেখে আনন্দ হল। দূর দূর অঞ্চল থেকে দল বেঁধে লাঠিয়ালরা আজও আসে। আমোদ উত্তেজনা সবই করে অসংখ্য দর্শক পরিকীর্ণ পোনাবাজারের উন্মুখ আসরে। তাতে দর্শককে বিস্মিত করে দেবার মত অনুশীলনও হয়ত থাকে এবং লাঠির ঘায়ে মাথা ফাটানো ইত্যাদি নয়ন-মনকে খুব তৃপ্তিও দেয় না। তবু এতকাল ধরে এর অস্তিত্বটুকু যে আজও বজায় রয়েছে—তাই দেখে আনন্দ পাওয়া যায়।

দেবীর মন্দিরের অঙ্গন আজ ত্রিপলের ছাউনিতে ঢেকে দিয়েছে। মন্দির থেকে বেরিয়ে একদিকে সেই ছায়ায় একটু দাঁড়ালাম। দেখি বারান্দার ওপর এক প্রৌঢ়া মহিলা বসে আছেন। চেহারা দেখে মনে হয় এই অঞ্চলের মহিলাদের তুলনায় বেশ-বাসে বেশ কিছুটা মার্জিত। দু একবার মুখের দিকে তাকাতেই মহিলা বললেন, 'বাবা তুমি কি কলকাতা থেকে এয়েছ।'

বললাম, 'হ্যাঁ।'

'বাগবাজারের ঘোষের বাড়ী থাকা হয় বুঝি?' প্রশ্নকর্ত্রী তৃতীয় পুরুষে প্রশ্ন করলেন।

এবার সত্য গোপন করে বললাম, 'হ্যাঁ! কাগজের হয়ে এসেছি!'

'ওঃ ঠিক ধরেছি। বাগবাজারের কাগজ তো!' ভদ্রমহিলা এবার নিজের কৃতিত্বে পুলকিত হলেন।

ভদ্রতায় পাল্টা প্রশ্ন করলাম, 'আপনিও কি বাগবাজারের?'

পান খাওয়া দাঁত বার করে—হাতের চুড়ির গোছ নেড়ে মহিলা বললেন, 'আমার কথা আর বলনা। এখেনে বোন থাকে। মনের অবস্থা জেনে বোন বললে, 'চল দিদি আমার কাছে।' মহিলাব

কণ্ঠস্বরে এবার বাষ্পের আভাষ পেলাম। কিছু প্রশ্ন করার আগেই আবার ভদ্রমহিলা আরম্ভ করলেন, 'তা বাবা তোমাদের আপিসে ভাল পাত্তর টাত্তর নেই!'

প্রশ্ন শুনে আমি খানিকটা থমকে গেলাম। এ আবার কী? এখানে মেলার ভিড়ে প্রচণ্ড গরমের মধ্যে দাঁড়িয়ে এই মুহূর্তে আমি উপযুক্ত পাত্রেব খবব দিই কি করে। চুপ করে থাকতে দেখে ভদ্রমহিলা আবাব বললেন, 'তা বাবা খরচ করব মোটামুটি। ধর বরাভরণ দানসামিগ্রী, নগদ নিয়ে হাজার পনের!' খানিক আমার মুখের দিকে চেয়ে অপেক্ষা করে: 'তা' দেখবে তো?'

সম্মতি জানিয়ে আমি ভিড় কাটিয়ে বেরিয়ে এলাম। দেবী চণ্ডীর কৃপাতেই বুঝি ভদ্রমহিলা আমার মতন এক হিতৈষীর সাক্ষাৎ পেয়েছেন। দু' পা এগোতে না এগোতেই আবার পেছন থেকে ডাক 'বাবা শুনছ! আমার বাড়ি ঐ মদনমোহন তলাতেই! বলবে চাটুজ্যেদের বাড়ি। যেও একদিন আপিস ফেরতা। যাবে তো?'

'নিশ্চয়ই!'

জানিনা, কোনদিন চাটুজ্যে গিন্নীর আকর্ষণ এড়াতে না পেরে আমি 'চণ্ডালিকা' নৃত্যনাট্যের মা-র মায়াদর্পণের প্রভাবে মদনমোহন তলায় উপস্থিত হব কি না; চণ্ডালিকা সন্দর্শনে মনে মনে সেই আশঙ্কাই প্রবল।

যাবার পথে আমতার ট্রেনে বসে ওই কথাটিই মনে হচ্ছিল। যতটুকু দেখেছি, জাগ্রতা মা চণ্ডীর রূপটি তেলে সিঁদুরে একেবারে চাটুজ্যে গিন্নিব মতন পাথবে কোঁদা। অতএব আকর্ষণের ভয় আমার থাকবারই কথা।

মেলাই-এর মেলায় বৈশাখী পূর্ণিমার গোটা দিন কোথা দিয়ে কেটে গেল; রাত কাটানোর দরকার নেই আমতার মেলায়। অতএব ফেরার ট্রেনে উঠলাম; সারাদিনের ক্লান্তি; ঠিক দুপুরের

রোদ লেগে মাথাটা ধরে আছে; চোখ দুটো বুঁজে আসছে আপনি। মার্টিনের ট্রেন। ধিকধিকি চলতে চলতে যতটুকু দোলা দিচ্ছে—তাতে বেশ আরাম অনুভব করতে করতে চলেছি ; এর ওপর অতি সংক্ষেপে দু'ফোঁটা বৃষ্টিও হয়ে গেল কোন সময় ; কতক্ষণ ধরে জানিনা, শরীরটাকে বিছিয়ে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম,—একজন পায়ের বুড়ো আঙ্গুলটা ধরে হ্যাঁচকা টানে জাগিয়ে দিয়ে বেশ সজোরেই বলল, 'বাঃ বাঃ বাবা। দিব্যি ঠ্যাং ছড়িয়ে ঘুমচ্ছ ?' ধড় মড় করে উঠে পা গুটিয়ে বসতেই লোকটা একমুখ দাড়ি গোঁফের মধ্যে থেকে খি-খি করে হাসতে হাসতে শূন্য জায়গায় বসে পড়ল।

দেখি সন্ন্যাসী। সেই সন্ন্যাসী—১৯৪৭ সালে আমার চেয়ে দু'-বছরের উঁচু ক্লাসে কলেজে বাংলা অনার্স পড়ত। তার চেয়ে সন্ন্যাসীর বড় পরিচয়, এক পাড়ার ছেলে সন্ন্যাসী, ছোটবেলা থেকেই একটা আদর্শ মানুষ হিসেবে আমাদের কিশোর মন অধিকার করেছিল সে এমনই দিন ক্রমে ক্রমে এসে গিয়েছিল তখন, সন্ন্যাসী না হলে ফুটবল জমে না, সাঁতার জমে না, ঝিলে তাল গাছের ডিঙ্গি বাওয়া চলে না। আরও বড় হলে, নাটক জমে না ; গানের দল জমে না! বয়েসে কিছুটা বড় হলেও তাকে কোনদিন দাদা বলে ডাকিনি হয়ত, কিন্তু একটা সম্ভ্রমবোধ ছিল ; সেটা ওই ওর মধ্যে জীবনের আদর্শকে খুঁজে পেতাম বলেই। যাক, সে সব কৈশোরের আদর্শ কোথায় এখন ধুয়ে মুছে গেছে। যা পড়ে আছে তাই বলি।

অনার্স সন্ন্যাসী দিল না। পাস কোর্সে বি-এ সেরে রেলে ঢুকে পড়ল। আর চাকরি নিবি ে া নে একেবারে কাটিহারে! সেখানে খুব বেশি না হোক বছর চারেক কাটিয়ে কলকাতায় চাকরিতে ফিরে এল সন্ন্যাসী। আবার তার সঙ্গ পেলাম। আবার হাসিতে, আনন্দে বেশ কাটতে লাগল দিনের পর দিন। সন্ন্যাসী পাল্টায় নি।

আরও বোধহয় বছর চার পাঁচ এমনি করে কেটে গেছে। কাজে কর্মে তার কাছ থেকে এ কবছরে খানিকটা দূরেই সরে গিয়েছি

হয়ত; দেখলাম, সন্ন্যাসী সত্যিই ক্রমে ক্রমে সন্ন্যাসী হয়ে যাচ্ছে! কিছুতেই আসক্তি নেই। ওর মধ্যে যে জীবনের স্পন্দনটুকু ছিল, উৎসাহের প্রাণবন্যা অহরহ হাসিতে, গানে সবাইকে সজোরে ঠেলে নিয়ে চলত—তা যেন স্তিমিত হয়ে আসছে; নিঃস্পন্দ হয়ে আসছে ক্রমশ।

সকলে বলল, স্বাভাবিক পরিবর্তন। কিন্তু যা করবার ওপরওলা করেছেন। কদিনেই বোঝা গেল পরিবর্তম নয়, কিছু নয়—সন্ন্যাসী পাগল হয়ে যাচ্ছে। কলকাতার লুম্বিনী পার্ক—রাঁচির এ্যাসাইলাম থেকে ফিরে এসে সন্ন্যাসী নিরলঙ্কার সন্ন্যাসীই রয়ে গেল। সেটা ১৯৫৬।৫৭ হবে। তারপর থেকে আজও সন্ন্যাসী কেবল ঘুরছে। পায়ে হেঁটে যতদূর যাওয়া যায় যাচ্ছে। রোদ, জল, ঝড় উপেক্ষা করে যাচ্ছে। আজও ও সকলকে চেনে। নাম ধরে ডাকে। দেখা হলে আজও দশ পনের বছরের স্মৃতিচিত্র ওর কাছে ঠিক ঠিক শুনি। শুনে মনে হয়,—তাহলে কি ভাল হয়ে গেল সন্ন্যাসী? কিন্তু না। ভালও হয়না। একমুখ কাঁচা-পাকা দাড়ি, এক মাথা রুক্ষ চুল; মাঝে মাঝে হাত বাড়িয়ে এককাপ চা খাবার পয়সা চাওয়া—আর মাঝে মাঝে গরঠিকানায় কোথাও কোথাও চলে যাওয়া।

পায়ের কাছে বসে সন্ন্যাসী তখন অনেক কথা বলবার চেষ্টা করছে। যথাসম্ভব সংক্ষেপে তার প্রশ্নের উত্তর দিয়ে সময় কাটাতে কাটাতে চলেছি। সন্ন্যাসীর বেশ-বাস দেখে কম্পার্টমেণ্টে যে দু'চার জন লোক আছে—তারা ওর দিকে, আমার দিকে চেয়ে, কথোপকথন শুনে কি জানি কি ভাবছে।

সন্ন্যাসী এক সময় বলল, 'ডাকঘরের অমলের পার্টটা কিন্তু আমায় দিতে হবে এবার। তুমি পত্যেকবার করবে তা হবে না?' খানিক থেমে, 'এবার কালীপূজোয় কি ঝোলাচ্ছ? নিজে লেখ না?'

সন্ন্যাসীর চিন্তাভাবনা এখনও ওর মাথার কোষে কোথাও বেঁচে আছে। র-ফলা সেদিনও উচ্চারণ করত না—আজও করেনা। সেদিন অভিনয় করাকে বলতো 'ৰই ঝোলানো'—আজও তাই বলে।

'আচ্ছা!' বলে উত্তর সংক্ষেপ করেছিলুম।

আরও এটা সেটার পর সন্ন্যাসী বলল, 'আচ্ছা, ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট কি আবার আসবে না? শাঁখে ফুঁ দিয়ে ওই স্বাধীনতা করলুম—জনগণমন গাইলুম—শিবুদের পাঠা চুরি করে ফিষ্টি খেলুম—ব্যস হয়ে গেল? স্বরাজ হয়ে গেল?'

যাক কে বোঝাবে সন্ন্যাসীকে। আমি জানিই বা কতটুকু? ওকে দেখলে, ঠায় ওর মুখের দিকে তাকিয়েই থাকি! আর ভাবি, হায় মানুষের কী পরিণতি!

সারা আকাশ ভরে বৈশাখী-পূর্ণিমার চাঁদ ওই বৃষ্টি ভেজা আকাশে ধোয়া-মোছা অঙ্গন পেয়ে একেবারে গা এলিয়ে দিয়েছে সেদিন। দেখতে দেখতে ফিরে এলাম সে রাতে। সন্ন্যাসীকে ছাড়তেও মায়া হল। হয়ত এই রাতে আবার কোথা চলে যাবে। সঙ্গে করে দোকানে বসে পেট ভরে খাওয়ালাম। সঙ্গে করে বাসে তুলে ওর বাড়ির রাস্তায় পৌঁছে দিয়ে বাড়ি ঢুকলাম। সন্ন্যাসী সারা পাড়া সচকিত করে উচ্চৈঃস্বরে গান ধরল,—'শুভ্র-জ্যোৎস্না পুলকিত যামিনীম্ ফুল্ল-কুসুমিত দ্রুমদল……।' তারপর বাঁকের অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল ও।

যাক, সন্ন্যাসী এখনও মরেনি।

কিন্তু মনে মনে কখনই এ-কথা মানতে পারিনে! এ কী বাঁচা? প্রশ্ন করে উত্তর পাইনে, এ কিসের অভিশাপ?

এই সন্ন্যাসীর প্রসঙ্গেই মনে পড়ে গেল আমিনুরের কথা। সেও আজকের কথা নয়। বছর দু'-তিন আগে গড়মন্দারণে বেড়াতে গিয়েছিলুম আমি আর বিশু। গড়ের বন ঝোপ পেরিয়ে ঢাল পথ ধরে ওপরে উঠেছি—দেখি ওই জনশূন্য দুপুর বেলা, লোকবসতিহীন গড়ের মাথায় একটা লোক। কেবল তার সম্বন্ধে একটা উপমাই মনে আছে, চাষা-ভূষোদের ক্ষেত-খামারে দেখা যায়, বাঁশের গায়ে খড়

জড়িয়ে আড়াআড়ি বাঁখারি বেঁধে হাত তৈরী করে কালো জামা পরিয়ে এক একটা মূর্তি করা হয়; তার মাথায় একটা কালো হাঁড়িতে চুণ দিয়ে চোখ মুখ আঁকা।—লোকটা অনেকটা তেমন দেখতে। এর বাড়তি আছে একজোড়া হিংস্র জন্তুর মতন চোখ—আর চিবুক থেকে লম্বা লম্বা কতকগুলো কাঁচাপাকা দাড়ি। বিচিত্র চেহারা। মানুষের পক্ষে যতখানি রোগা হওয়া সম্ভব তত রোগা। দেহটি একটি শক্ত বাঁশের মত লম্বা! হঠাৎ দেখলে মনে হয়—যেন হাঁটু পর্যন্ত কালো আলখাল্লা পরা লোকটা একটা রণ-পা করে চলা ফেরা করছে।

ওপরে শ্যাওলা ধরা একটা পোড়ো সমাধি স্থান। লোকটা সেখানে একটা কালো মাটির প্রদীপে একান্ত নিবিষ্ট মনে আগুন জ্বালাবার চেষ্টা করছে। কিন্তু কেবল দেশলাই-এর কাঠিই জ্বলছে। প্রদীপের পলতেতে তার ছোঁয়াচ লাগছে না। চুপ করে দু'জনে দাঁড়িয়ে আছি। এক সময় দেশলাই নিঃশেষ হয়ে গেলে লোকটা আমাদের দিকে চাইল সেই তীক্ষ্ণ সরীসৃপের মত দুটো চোখ দিয়ে। তারপর সরাসরি জিজ্ঞেস করল, 'ম্যাচ আছে?'

বললাম, 'না। তাছাড়া ওতে তো তেল নেই। গতরাতে বৃষ্টি হয়েছিল। জল জমে আছে, জ্বলবেনা।'

লোকটা বিড় বিড় করে কি যেন বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল।

মনে মনে ভাবছি, কোথায় এলাম রে বাবা? যুগেযুগে অনেক দেশনায়কের পায়ের চিহ্ন পড়েছে এখানে। মোগল সৈন্য যখন দাউদ কররাণীকে বাংলা দেশ থেকে উড়িষ্যার দিকে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছিলেন; তখন টাণ্ডা (মালদহ) প্রধান ঘাঁটি হলেও বর্ধমান ছিল অগ্রগামী মোগল সৈন্যদের সম্মুখ ঘাঁটি। এ পথ তারা অতিক্রম করেছে। রাজা তোডরমল নিজে এখানে এসেছিলেন। এ পথ দিয়ে গেছেন ফা হিয়েন, হিউয়েন-শাং। 'দুর্গেশনন্দিনীর' বীরেন্দ্র সিংহ একদা ছিলেন এ গড়ের বাসিন্দা। ৯৮৬ অব্দে আকবর বাদশা কর্তৃক বাংলার কর আদায়ের নতুন প্রণালীতে অসন্তুষ্ট হয়ে বাংলার জায়গীর-

দাররা বিদ্রোহ করলে—পাঠানরা—যারা দিল্লীশ্বরের প্রতিনিধি কর্তৃক পরাজিত হয়ে উৎকল ত্যাগ করল—তারা উড়িষ্যা মেদিনীপুর অধিকার করল; পাঠান সম্রাট হোসেন শাহের প্রধান সেনাপতি ইসমাইল গাজী নির্মাণ করলেন এই গড়মান্দারণ দুর্গ—সেখানে কার সমাধিতে কে 'চেরাগ' জ্বালাবার চেষ্টা করছে বাবা?

কোন কথা না বলে লোকটা একপা একপা করে নামবার পথের দিকে সরে গেল। বিশুকে বললুম, 'কি করবি? লোকটার চোখ দুটো দেখছিস? যদি কোন মৎলব থাকে!'

বলতে না বলতেই লোকটা ঘুরে আবার খানিক এগিয়ে এসে বলল, 'বাবু, একটা কথা বলবেন? সাহেবরা কবে আসবে বলতে পারবেন?'

অত্যন্ত সপ্রতিভ প্রশ্ন। খানিকটা সহজ হয়ে বললাম, 'তাই কি চান? তাহলে এতদিনকার এত কষ্টের স্বাধীনতার কি দরকার ছিল?'

বিশু আমাকে বাধা দিল। '—থাম, যত্তো সব পাগল।' লোকটাকে বলল, 'আপনি যান। খবরটা জেনে আপনার বাড়িতে বলে আসব।'

লোকটা সত্যিই চলে গেল।

ফেরার পথে রিক্সাওলা বলেছিল আমিনুবের কথা। আজ নয়, এমন অনেকদিন ধরেই ও প্রদীপ জ্বালাতে আসে; জল ঝড় উপেক্ষা করেই আসে। আর ওই এক প্রশ্নই সবাইকে করে, সাহেবরা কবে আসবে বলতে পারেন! লোকটা পাগল।

যাক সে সব কথা। সন্ন্যাসীর মুখেও ওই প্রশ্ন শুনে আমিনুবের কথা মনে পড়ে গেল। দুজনেই পাগল। কিন্তু জানিনা কি ধরনের! বৃটিশের পদানত হয়ে স্বাধীনতা হারানোয় ওদের এত উৎসাহ কেন?





এগারো

সেবার বৈশাখী পূর্ণিমা পড়ল জ্যৈষ্ঠে !···

এধার ওধার ঘুরে ফিরে দেখে এলাম আকাশে কোথাও জল নেই। সেই যে চৈত্র সংক্রান্তির আগে পাণ্ডুবাজার ঢিবিতে উন্মত্ত অদৃশ্য ঝড়ের দাপট তালগাছগুলোকে মাতাল করে ধুলোয় লোটাচ্ছিল ;—এক লক্ষ সাপের ক্রুদ্ধ গর্জনের সঙ্গে জলের ঝাপটায় একেবারে চোখের সামনে একটা সাগর দেখিয়ে দিয়েছিল ;—তারপর এই বুদ্ধ পূর্ণিমার দিন একেবারে পুড়ে যাওয়া, জ্বলে যাওয়া ক্ষেত খামারের অজ্ঞান গাছগাছালীর ওপর যেন একটা জলের ঝাপটা দিয়ে দিল। ব্যস। কর্তব্য শেষ।

অনেকদিন কেটে গেল তারপর।

কোন কোনদিন ডিস্ট্রিক্ট হ্যাণ্ডবুক ঘাঁটি। নিজের বাড়িতে বসে বসে দুপুর কাটাই। লাইব্রেরীতে সন্ধেবেলা বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আড্ডা মারতে রাত গভীর করি। কোথাও যেন আর নড়তে ইচ্ছে করে না। তবু এক একবার বাঁকুড়ার তরুণের কথা মনে হয়। ছেলেটা কথা দিল বেলেতোড়ের গাজনের খবর আর থাকবার ব্যবস্থার কথা জানিয়ে চিঠি লিখবে ; কিন্তু কোথায় ?

এমনি দিন যেতে যেতে জ্যৈষ্ঠ চলে গিয়ে আষাঢ়ের অনেকগুলো দিন পেরিয়ে গেল। তারপর অনেকদিনের দুঃখের সান্ত্বনার মত

একদিন অঝোরে নামল বৃষ্টি। কিন্তু আমার সান্ত্বনা কোথায়? তরুণের চিঠি কোথা? খবর নিয়ে অবশ্য দেখছি বুদ্ধ পূর্ণিমায় না হয়ে আষাঢ় পূর্ণিমায় বেলেতোড়ের বিখ্যাত ধর্মরাজের গাজন। আষাঢ় পূর্ণিমাও শ্রাবণের প্রথম সপ্তাহে। অতএব দেরী আছে।

অতএব হাতে এখনও সময় আছে। কিন্তু চিঠি না পেলে ভরসা পাই কি করে? শেষ পর্যন্ত যদি কোথাও স্থান সংকুলান না করতে পেরে চিঠি লেখে তরুণ!

একদিন চিঠি এল। ফরেস্ট বাংলোয় আহার বাসস্থানের পরোয়ানা নিয়ে খসখসে বালির কাগ", পেন্সিলের কটা অক্ষরে দিন তিনেকের অবস্থানের নির্দেশ নিয়ে বাঁকুড়ার সরকারী আপিস চিঠি লিখল। তরুণ পোস্টকার্ডে লিখল, 'আপনি এলে হয়ত আমার সঙ্গে দেখা হবে না। আমি বদলী হয়ে চললুম জলপাইগুড়ি। তারই জন্যে এতদিন ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল। চিঠি দিতে পারিনি।...'

ব্যস্! মনে মনে অদৃশ্য ধর্মরাজকে প্রণাম জানিয়ে আবার বিছানার বাণ্ডিল বগলে তুলে নিলুম।

সকালে শিয়ালদহে ট্রেন। সেখান থেকে দুর্গাপুর হ'য়ে বাঁকুড়াগামী বাস ধরে মাইল তের গেলে বেলেতোড় গ্রাম। সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত চলা; বেশ মনে আছে, মেঘ রোদ বৃষ্টির মধ্যে দিয়ে এতটা পথ পার হতে কেমন একটা রোমঞ্চকর অনুভূতির মধ্যে দিয়ে চলে এসেছিলাম। অজস্র অশরীরী চিন্তা সেদিন আমায় পেয়ে বসেছিল।

অনেকদিন পরে বাড়ি থেকে বেরিয়েছি। গত মাঘ থেকে এক নাগাড়ে বৈশাখ পর্যন্ত ঘোরার সময় যে নেশাটা পাগল করে রাখত—সে আজ নেই। মনের কোনখানেও নেই সেই গরঠিকানা গগন হরকরার কান্না 'আমি কোথায় পাব তারে—।' কিন্তু আর একটা মন আর এক সাজে সেজে গুজে এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে যেন উত্তর দিচ্ছে,

'জানোনা কোথা পাবে? তোমার বাড়ির পাশে আরশী নগর—সেখানে এক পড়শী বসত করে। তাকে ধরো, সেই বলে দেবে তুমি কোথায় পাবে তারে!—'

অদ্ভুত! মন থেকে সে ভূত নড়তে চায় না।

বিকেল বেলা ফরেস্ট বাংলোর দরজায় চাবি লাগিয়ে গুটি গুটি পায়ে হাজির হলাম ধর্মতলায়! পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আকাশ। কে বলবে শ্রাবণ মাসের দিন।

আমরা কেউ বলি শৈব, কেউ বলি বৌদ্ধ, আবার কেউ বা বলি তান্ত্রিক প্রভাবে প্রভাবিত ধর্ম রাজের গাজন। আর ওরা, মানে বেলেতোড়ের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা কেবল একটি কথাই বলে, বলে ধর্মরাজ। যুগের পর যুগ নিরবছিন্ন ধারায় এদের জীবনের কেন্দ্রে যিনি প্রতি মুহূর্তে আসীন, তিনি বাবা ধর্মরাজ। শোকে-দুঃখে, আনন্দে-বিষাদে এদের জীবন-মরণের সাথী তিনিই। প্রত্যক্ষে-অপ্রত্যক্ষে তিনিই চির বিরাজমান।

পূর্ণিমার দিন বিকাল হতে সারারাত পেরিয়ে পরের দিনের প্রভাত পর্যন্ত এই ধর্মপূজার অনুষ্ঠান পর্ব। ভক্তদের মন্দিরদ্বারে হত্যে দেওয়ার পর অনুষ্ঠানের সমাপ্তি। সমস্ত অনুষ্ঠানটি গভীর ও নিবিড়ভাবে দেখতে দেখতে কেবল একটি কথাই মনে হল, ধর্মরাজের গাজনের শোভাযাত্রার যে-কোন রাজকীয় শোভাযাত্রার সঙ্গে এমন মিল হল কেন? কেন, তার উত্তর নিশ্চয়ই আছে। সঙ্গে সঙ্গে মধ্যযুগীয় সামন্ত তন্ত্রের কথাই মনে হয়েছিল বেশি। মনে হয়েছিল গোষ্ঠীবদ্ধ প্রাচীন আদিম যুগরীতিতে এর কোন স্বাতন্ত্র্য থাকলেও কালক্রমে তা নিশ্চয়ই বিলীন হয়েছিল বর্ধমান, মেদিনীপুর, বীরভূম, বাঁকুড়া প্রভৃতি অঞ্চলের সামন্তরাজাদের প্রভাবে। সমগ্র অনুষ্ঠানটির মধ্যে যেন প্রাচীন এক অনার্য সংস্কৃতির বহুদূরাগত প্রতিচ্ছবি চোখে পড়ে। যাক, সে কথা পরে বলছি।

দুর্গাপুর-বাঁকুড়ার পথের ধারে নগণ্য একখানি গ্রাম এই বেলেতোড়। বাঁকুড়া থেকে বরাবর একটি ছোট লাইনের সংযোগও আছে এর। রাঢ়ের মাটির বিচিত্র বর্ণসম্ভারে বেলেতোড়ের রাঙা মাটির দেশে আষাঢ়ের পূর্ণিমার সারারাতব্যাপী ধর্মরাজের গাজনের মেলা বহু শতাব্দীর প্রাচীনতা নিয়ে আজও জেগে আছে। সমগ্র অনুষ্ঠানটি গ্রামের একান্ত নিজস্ব। গ্রামের প্রত্যেকটি জনসাধারণের ওপর এর প্রভাব অপরিসীম, প্রত্যেক বছর আষাঢ় পূর্ণিমা আসে, আর আসে দেশ-বিদেশ থেকে বেলেতোড় গ্রামের প্রবাসী বিভিন্ন মানুষ। ভিন দেশ থেকে বাপের বাড়ি আসে মেয়ে। কলকাতার হস্টেলে থাকা এ গ্রামের ছেলেরা ঘরে আসে। ভিন দেশের চাকুরীজীবিরা স-সংসার চলে আসেন গ্রামের বসত বাড়িতে। তবু কি অন্যেরা আসে না? আসে। পাড়া-পড়শীব আত্মীয়-স্বজনও আসে। কেবলমাত্র প্রত্যক্ষদর্শীর চোখ নিয়েও আসে অনেকে। আসে আর চলে যায়। গ্রামের পাথুরে লাল মাটিতে তাদের শেকড় বসে না।

ধর্মরাজ নামক প্রাচীন এই লৌকিক দেবতাটি রাঢ়াঞ্চলের বিখ্যাত গ্রাম্য দেবতাদের মধ্যে বুঝি সবচেয়ে প্রভাবশালী। মনসা পঞ্চানন্দের মত পাশাপাশি গ্রামে তিনি বিরাজ করেন। বৎসরের প্রতিটি দিন নিত্য পূজা পান। বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনে ভক্তকে স্বপ্নাদেশ দেন। নিত্যকাল জাগ্রত থেকে ভক্তদের আধি-ব্যাধির উপশম করেন। মানতকারীকে কঠিন .মলায় জিতিয়ে দেওয়া, পুত্রহীনকে পুত্রদান করা, অনাবৃষ্টির দিনে বৃষ্টি আনয়ন করার গুরুদায়িত্ব নিয়ে এবং প্রত্যেকের আধিব্যাধির উপশম করে প্রপিতামহ ধর্মরাজ নির্বাক বসে থাকেন।

বেলেতোড় গ্রামের ধর্মঠাকুরটি গ্রামবাসীদের কথামত প্রায় শ' পাঁচেক বছর আগেকার; ব্রাহ্মণদের পাড়া এটি। কায়স্থও আছেন অনেক ঘব। পূজা কবেন ব্রাহ্মণ পুরোহিত। ডোম বা কোন নিম্নবর্ণের পুরোহিত নয়। গ্রামখানি রাঢ়ের অন্যান্য অঞ্চলের মত ডোম, বাউরী, কাহার, খয়রা ইত্যাদির বাসভূমি। এদেরই সৃষ্ট দেবতা যদি ধর্মঠাকুর

হন তাহলে আর্য হিন্দুদের সঙ্গে তাদের সমন্বয় ও সংস্কৃতির আদান-প্রদানের ফলে আজ এর আধুনিক রূপ অনেকখানি মার্জিত এবং মানতকারী বহু ক্ষেত্রে উন্নত শিক্ষায় শিক্ষিত। একশ বা দেড়শ বছর আগে যে সংস্কার থাকুক না কেন আজ বিংশ শতাব্দীর দিনে মাত্র তের মাইল দূরের দুর্গাপুরের মত বিস্ময়কর লৌহ নগরী থেকে এসে যাকে ধর্মরাজের গাজন দেখতে হয়, তাকে ভীষণভাবে অবাক করে।

এখন লোকমুখে শোনা এ গ্রামে ধর্মরাজের আবির্ভাবের উপাখ্যান বলি। কাহিনীটি ওখানকার প্রহ্লাদ পালের মুখে শোনা। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী ধর্মরাজ পালদেরই নিজস্ব দেবতা। তের পুরুষ পূর্বে নিমাই পাল—তাঁদের বংশের আদি পুরুষ—এ গ্রামে মুদীর দোকান করতেন। ওই-ই ছিল তাঁর জীবিকা। একদা রাণীগঞ্জ অঞ্চল থেকে মালপত্তর কিনে ফিরবার পথে দামোদর নদের তীরে এসে জল পানের জন্যে গরুর গাড়ি থেকে নেমেছিলেন। জলধারার পাশে বালি সরিয়ে গর্ত করে জল পান করবেন অঞ্জলি ভরে—অঞ্জলিতে জলের সঙ্গে উঠল পোকা, দ্বিতীয়বারও তাই হল। জল ফেলে দিলেন। তৃষ্ণার্ত নিমাই পাল প্রমাদ গুণলেন। আবার জলধারার থেকে অঞ্জলি ভরে জল নিলেন। সেই পোকা। সজোরে হাতের মধ্যে পোকাটিকে পিষলেন। এবার হাত খুলতেই দেখা গেল একটি ক্ষুদ্র মসৃণ পাথর খণ্ড। মুদী লোক। পাথরখণ্ডটি জলে না ফেলে বাড়িতে এনে ওজনদাড়ির পাষাণের কাজে লাগালেন। মজা হল। দাঁড়িপাল্লায় পাথরখণ্ডটির ওজন প্রতিবারই বিভিন্ন হয়। অতএব কাজে লাগানো গেল না। বিরক্ত হয়ে পাল সেটিকে রেখে দিলেন নুনভরা কাঠের বাক্সের মধ্যে!

এবার এক অন্য বিপদ। রাত্রে স্বপ্নাদেশে ঠাকুর বললেন, আমাকে নুনের বাক্সয় বন্দী করে রেখেছ, আমার কষ্ট হচ্ছে। বার করে প্রতিষ্ঠা করে আমার পূজার ব্যবস্থা কর। স্বপ্ন পেলেন পালেদের কুলপুরোহিতও। ঠাকুর বালকেশ্বর নামে সর্বসাধারণের পূজা পেতে চান। ভোগ হবে মুড়ি, কড়াই ভাজা, চালভাজা, খৈ ইত্যাদি।

অতএব ব্যবস্থা হল; পালেদের দুর্গা মেলায় অধিষ্ঠিত হলেন ঠাকুর ধর্মরাজ! পূজা পেতে লাগলেন নিত্য। এসব ঘটনা নিমাই পালের আমলের। তাঁকে এ বংশের প্রথম পুরুষ ধরলে—এখন এ বংশের ত্রয়োদশ পুরুষ বর্তমান। তাঁর সময় থেকেই বেলেতোড়ের তমাল বনে ধর্মরাজের প্রতিষ্ঠা। নিমাই পালের ছেলে ছ'কড়ি পাল, তাঁর ছেলে দামোদর পাল। তাঁরই চেষ্টায় আধুনিক কালের ধর্মরাজ মন্দিরের প্রতিষ্ঠা। অতএব মন্দিরের বয়স আজ থেকে প্রায় পাঁচশ বছর হবে।

পূর্ণিমার দিন বিকাল থেকে মেলার শুরু। তখনই ধর্মরাজ ঠাকুরকে মন্দির থেকে বাইরে বার করে সামনের আটচালা ছাউনির বেদীর ওপর নিয়ে আসেন পুরোহিত। তারপর মানতকারীর হত্যা দেওয়া, মালসা পোড়ানো ইত্যাদি অনুষ্ঠানের পর সামনে অপেক্ষমান কাঠের ঘোড়ার ওপর বসানো রাজছত্রের তলে সিংহাসন সমেত ধর্ম-রাজকে বসানো হয়। ধর্মরাজের সঙ্গে অনুচর হিসাবে আসেন বিল্বনারায়ণ ও ষোলুকনারায়ণ। তাঁরাও এক একটি অশ্বের পৃষ্ঠে আসন গ্রহণ করেন। তারপর শুরু হয় যাত্রা। আগে আগে লোক-লস্কর সৈন্য-সামন্ত সমেত চলে ধর্মরাজের পাট। এটি একটি লম্বা কাঠের পাটাতন। তাতে সারি সারি পেরেক পোঁতা, এটি হল শল্যাসন। সকলে একে স্কন্ধে ধারণ করে হাতের ছড়িগুলি দ্রুত নাড়তে নাড়তে চলেন। পেছনে চলেন চাকা বাঁধা ভিন্ন ভিন্ন কাঠেব ঘোড়ায় চড়ে ধর্মরাজ নিজে এবং অনুচরেরা।

এর পরে গ্রামের পথের ধারে অগণিত জনতার মধ্যে দিয়ে সমস্ত শোভাযাত্রাটি এসে উপস্থিত হয় দুর্গাপুর-বাঁকুড়া রাস্তার অপর পারে বাউরী পাড়ার তাঁতি পুকুরের ধারে। রাজছত্র আবার বসানো হয় মাটিতে; ধর্মরাজ তার তলে বেদীতে বসেন। এবার সর্বাগ্রে ধর্মরাজের ঘট মাথায় করে যিনি শোভাযাত্রায় সকলের আগে আগে আসেন—তিনি সোজা জলে নেমে যান এবং বৎসরান্তিক ঘটটি বিসর্জন দিয়ে নতুন ঘটে জল ভরে আনেন তীরে। ধর্মরাজের সামনে সেটি স্থাপিত

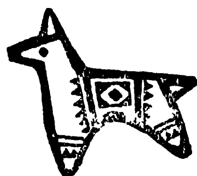
করেন। প্রাচীন এবং গ্রামীণ সংস্কৃতি এটি। তাই উপকথা, অলৌকিক কাহিনী অনেক কিছু এর সঙ্গে জড়িত আছে। সেটুকু বাদ দিয়ে প্রচলিত অনুষ্ঠানের কথা বলছি। এর পরবর্তী হল পাটস্নান। স্কন্ধস্থিত শল্যাসনটি দিয়ে সোজা এক হাঁটু জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে ঘটিতে জল তুলে তার ওপর ঢালা হয়। এর পূর্বেই অগণিত মহিলা জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছেন। জিজ্ঞেস করতে জানা গেল, এঁরা অনেকেই বন্ধ্যা স্ত্রীলোক। ' পাটস্নানের জল তাঁদের মাথায় পড়লে বন্ধ্যাত্ব অভিশাপ ঘুচবে—এই আশায় অপেক্ষা করছেন। সত্যিই তাঁরা ধারাস্নান করলেন। এখন পাটটিকে তীরে রাখা হয় এবং তারপর শুরু হয় বিভিন্ন মানতকারীর বিচিত্র ব্রত উদযাপন।

তাঁতিপুকুব থেকে দণ্ডী খেটে অনেকে মন্দির পর্যন্ত মাইলখানেক পথ অতিক্রম করেন। কারও সারাদিনের উপবাসের পর রাজপথে গড়িয়ে গড়িয়ে আসার মানত। পেছনে আসে বাণ বেঁধা মানত-কারীরা। এই বাণ হল এক ইঞ্চি পরিমাণ সুঁচালো একটি ধাতুখণ্ড হাতে, গলায়, বুকের চামড়ায় ফুটিয়ে এরা পথ অতিক্রম করে আসে মন্দির অবধি। আরও আছে। একটি বাঁশকে লম্বালম্বি আট ফালা করে চিরে প্রতি বাঁখারীর প্রান্তভাগ এক-একজন নিজের শরীরে পুঁতে নাচতে নাচতে আসে। নিজের জিহ্বাকে ফুঁড়ে নৃত্য করা আছে। আর আছে ঢেঁকি বাণের মত বিভৎস মানত।

এর পর সেদিন দেখেছিলাম, হিন্দোল বাণ। একেবারে সকলের পেছনে শেষ রাতে একখানা গরুর গাড়ির ওপর একটি লোককে ওপরে পা এবং নিচে মাথা ঝুলিয়ে দেওয়া হল। লোকটা নিচে মাথা করে রইল হাত জোড় করে। গাড়িতে বসে ধূপ-ধূনা সহযোগে একজন ধোঁয়া করছে লোকটির নিচু মুখের কাছে। ঝুলন্ত লোকটাকে মাঝে মাঝে দুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সেভাবেই সে চলেছে। অমানুষিক কৃচ্ছ্রসাধন। সন্দেহ হয় লোকটা বাঁচবে কি না। কিন্তু বাঁচে এবং দিব্যজীবন লাভ করে ধন্য হয়।

ধর্মরাজের মেলা এখানেই শেষ। ভোরের বেলা তিনি আবার ঘোড়ায় চেপে ফিরে আসেন মন্দিরে।

বিভিন্নকালে বিভিন্ন লোকাচারের মধ্যে দিয়ে ধর্মের মত লোক প্রসিদ্ধ দেবতাকে চলে আসতে হয়েছে যুগের পর যুগ। যুগে যুগে তার পরিবেশ পাল্টেছে। তার ফলে পূজারীতিতে, পূজানুষ্ঠানে কিছু কিছু পরিবর্তন স্বাভাবিকভাবে এসেছে। বিভিন্নকালে বিভিন্ন ধর্মমতের মানুষের কল্পনার প্রভায় ধর্মরাজ আজ যে অবস্থায় এসেছেন, আরও অনেককাল পরে হয়ত আরও নতুন কিছু এর পূজা-পদ্ধতিতে যুক্ত হবে। হয়ত এর চলতি আচরণেও পরিবর্তন হবে। আর আজকাল যখন নতুন নতুন দেব-দেবীর আবির্ভাব হচ্ছে, তাতে মনে হয় ধর্মঠাকুরকে একটা নতুন চেহারা দিয়ে দেখতে শুনতে আরও ভাল করাও চলতে পারে।





——————বার

সেবার আষাঢ় পূর্ণিমা পড়ল একবারে আষাঢ় পেরিয়ে শ্রাবণের ১০ তারিখে। বেলেতোড়ের ফরেস্ট বাংলোয় দিন তিনেকের মধ্যে এক ফোঁটা বৃষ্টি পড়ল না। তার বদলে এক আগামী সুদূর হেমন্ত দিনের রাতগুলো যেন অন্ধকার নীরব নিস্তরঙ্গ এক বন্য জীবনের আতঙ্ক আর গন্ধ বয়ে আনত; ভাল লাগত; নিঃসঙ্গতা এক এক সময় ভালো লাগে আমার! সারা দিনের মধ্যে কটা কথা বলি, যেন গুণে রাখতে পারি। সঙ্গে বই আছে; তাতে মন বসে না। সে এক বিচিত্র দিন, বিচিত্র রাত! অনেকদিন আগে যে সব দিন হারিয়ে গেছে—যে সব দিন ম্লান হয়ে একদিন ঝরে গেছে জীবনের ফাঁক দিয়ে—তারা চোখের সামনে এসে দাঁড়ায় এক নতুন রূপে। কিন্তু তাদের দেখেতো কৈ দুঃখ পাই না। আনন্দের দিনও আসে। কোন একদিন যে আনন্দ উচ্ছ্বাসে জীবনের মুহূর্তগুলো উড়িয়ে পুড়িয়ে হারিয়ে যেতে দিয়েছি—তারাও আসে; কিন্তু বাঁকুড়ার ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের অত বড় চত্বরটার মধ্যে ফরেস্ট বাংলোর লাউনজে বেতের ইজিচেয়ারে বসে দেখি সে সব প্রাক্তন আনন্দগুলো কত নিস্তেজ কতখানি অর্থহীন হয়ে কী পরিমাণ অদরকারী হয়ে গেছে আজ। জানিনা নির্বাসনের বিরক্তি কত

ক্লান্তিকর! কিন্তু আর মাত্র দুটো রাত্ পরে যাকে ফিরে যেতে হবে অপেক্ষমান পৃথিবীর চক্রতীর্থে—তার কাছে বেদনাময় হবে কেন এ সব? নিশ্চিন্তে কাটিয়ে দিলাম দুটো রাত।

বেলেতোড়ে আমার দিন এমনি করেই একদিন শেষ হয়ে গেল! আত্মীয় বন্ধু পরিজন সবার থেকে একেবারে অলক্ষ্যে মাত্র কটা দিন খরচ করে—একদিন সত্যি ভোরবেলা বাঁকুড়ার বাস ধরলাম। তরুণ বলেছিল থাকবে না। তবু মনে হল একবার তার বাঁকুড়ার বাড়িতে দেখা করে সোজা লালচাঁদের লাল রং-এর বাস ধরবো কলকাতা যাবার। কিন্তু হায় রে দুর্ভাগ্য! বাঁকুড়ায় তরুণের সঙ্গে দেখা হল না। ছেলেটা জরুরী সরকারী তলবে সত্যিই চলে গেছে জলপাইগুড়ি; আমাকে জানাবার সময়টুকুও পায় নি। হায় রে জীবন! কে জানে এখন হয়ত নিজের বাড়িতে দু'দিন জিরিয়ে নিয়ে তোড়জোড় করছে জলপাইগুড়ি যাবার।

সে থাকলে একদিন তার বাসাতেই কাটত। হয়ত ভালই হত এই নিষ্কর্মাটার। কিন্তু আবার কোন রকমে হোটেলে নাকে মুখে গুঁজে বেলা বারোটার বাস ধরলাম কলকাতার।

কিন্তু তারপর?

তারপরে অনেকদিন কোন কাজ নেই হাতে। কাজ নেই ভালই। ওই বেলেতোড়ের ফরেস্ট বাংলোর নিস্তরঙ্গ মেঘের মত নির্বাক দিনগুলো শ্রান্ত আর শান্ত হয়ে মৌনতার রেশ টেনে থাকতে পারত। কিন্তু ঘরে কি তাই হয়? লোকজন, পাড়া-পড়শি, উল্লাস কোলাহল, আর সময়ের বাজে খরচ নিয়ে একটার পর একটা দিন সরবে কেটে গেল। সেখানে শান্তির অবকাশ কোথায়? সেখানে শান্তির মানেই যেন আলাদা! তবু, হোম হোম সুইট হোম।

সুইট হোমেই একাকীত্ব খুঁজে খুঁজে শ্রাবণের কটা দিন কাটিয়ে দিলাম।

আকাশ ভরে বৃষ্টি নামে। শ্রাবণের সবখানি উজাড় করে এক একদিন স্তব্ধ পৃথিবী জুড়ে সারা রাত বৃষ্টি ঝরে যায়। অন্ধকার রাত, মেঘলা দিন, দুঃখের আনন্দের বিষাদের গল্প করতে করতে একের পর এক পার হয়ে যায়! কিন্তু কেমন একটা শ্রান্তি, জড়তা সারা শরীরটাকে অবশ করে দিচ্ছে! একি দিনের পর দিন এই শুয়ে বসে থাকার বিশ্রাম কি সহ্য হচ্ছে না আমার? নাকি এতদিনকার এই ঘোরাঘুরি—শরীরের ওপর অত্যাচার, প্রতিশোধ নিতে আসছে? মনে নানা কথা এসে জোটে। আমল দিতে গেলেই আরও জবু থবু হয়ে পড়ি! কাজ এখনও অনেক বাকি! এখনও যে বাকি অনেকখানি পথ!

মনটা এমনি নানাভাবে বিক্ষিপ্ত হয়ে গেছে তখন।

সময় কিছুতে যেন কাটতে চায় না। কোন কোন দিন সন্ধেবেলা রামরাজাতলার রাম মন্দিরে গিয়ে বসি। সকালবেলা আলু পটল পেতে ওখানেই বাজার বসে; আর সন্ধেবেলা রূপ একবারে পুরোপুরি পাল্টে যায়। শনিবারে শনিবারে রাতের বেলা যাত্রা হয়। অন্যান্য বার এক সৌম্য মূর্তি বৃদ্ধ কথক এসে বসেন উঁচু বেদিটায়। চারদিকে শ্রোতারা ভিড় করে কথকতা শোনেন।

বৃদ্ধ বলে যান—

'দেশে দেশে তাঁর কীর্তি কথা··
লোকে লোকে তাঁর যশোগাথা··
যুগে যুগে সেই অবাঙমানসগোচরের জয়গান···
মুখে মুখে তাঁর প্রেমময় বাণীর অমিয় কথন···'

বলেন, 'ব্রহ্মাদিষ্ট দুর্ধর্ষ দস্যু রত্নাকরের ওষ্ঠাগ্রে শোক উচ্ছ্বসিত শ্লোকে তিনি হলেন আবির্ভূত! তিনিই ব্রহ্মার চতুর্মুখে, দেবাদিদেবের পঞ্চমুখে, এবং মহাভক্ত নারদের সহস্র মুখে,—জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে সদাকীর্তিতে কীর্তিমান। ত্রেতায় বৈকুণ্ঠ ত্যাগ করে তিনিই দেখা দিয়েছিলেন অযোধ্যায় দশরথাত্মজ হয়ে। শুক্লা বাসন্তী নবমী

সেদিন—বাসন্তী-বাস-পরা ধরণীর রক্ষাকর্তার প্রতীক—তাই তাঁর রূপ নবদূর্বাদলঘনশ্যাম।'

বলেন, 'ত্রিকালজ্ঞ কবির বাণীরূপ এই রামচন্দ্র। পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্, যুগে যুগে তিনি কেবল অবতীর্ণই হন নি —তিনি জন জীবনের সঙ্গে নিগূঢ় ভাবে যুক্ত থেকে অতি নগণ্য সাধারণ মানুষের সকল সুখ দুঃখের অংশীদার হতে পেরেছিলেন।'

এবাবে বাংলা ১৩৬৯ সালের মাঘে আমি ছিলাম মহিষাদলে! পোষ সংক্রান্তির মেলায় গঙ্গাসাগর যাইনি। নামখানায় অন্নপূর্ণা রাইস মিলে গদাধরের পাদপদ্মে পড়েছিলাম। সেখান থেকে গেলাম মহিষাদল হয়ে তমলুক। মাঘের শ্রীপঞ্চমী সেখানেই কেটেছে। সেদিন এখানে রামরাজাতলার চৌধুরীপাড়ার মনসা মন্দিরে দেবী সরস্বতীর অর্চনার দিন শ্রীবামচন্দ্রের পূজার উদ্বোধন হয়েছিল। অদ্ভুত যোগাযোগ। দেবীর বরে মহাঋষি বাল্মিকীব জিহ্বাগ্রে বামায়ণের আবির্ভাব হল। তাই শ্রীপঞ্চমাতেই শুরু হবে মৃন্ময় সীতারামের বিগ্রহের প্রস্তুতি পর্ব। রামচন্দ্রের মূর্তিতে ব্যবহারের জন্য বাঁশটি পূজা করা হয়; আর তাই দিয়েই সে দিনই মূর্তি নির্মাণের কাজ শুরু হয়ে যায়। তারপর বিরাট মন্দির প্রাঙ্গণেব একপাশে তিনমাস ধরে মূর্তিগুলি একে একে নির্মিত হয় রামনবমীর শুভ লগ্নটিব অপেক্ষায়। বৈশাখের শুরুতে সাড়ম্বরে হয় বাজ্যাভিষেক পর্ব। দলে দলে তীর্থ যাত্রী আসে। পাত্র মিত্র অমাত্য পারিষদ-বর্গ পরিবেষ্টিত অগণ্য অসংখ্য প্রজাকে আশীর্বাদ করেন রামরাজা রাজ সভায় বসে।

বৈশাখের সেই তাপদগ্ধ দিনটি থেকে শ্রাবণের শেষ দিন রবিবার পর্যন্ত নিত্য পূজায়, আরতিতে দীর্ঘ চারমাস শ্রীরামচন্দ্র রাজ্য পরিচালনা করে যান। যতটুকু জানি এমন দীর্ঘস্থায়ী পূজা অন্যত্র কোথাও প্রচলিত নয়। এতে যেন প্রবল প্রতাপান্বিত শ্রীরামের প্রবল প্রভাবটিই সূচিত হয়!

মেলা-মেলা-মেলা···

এ দেশের ধর্ম চিন্তার একটি বিশেষ প্রকাশই যেন মেলা। অনন্ত-কাল ধরে ধর্মচেতনার ঐতিহ্যের দণ্ডবাহী অগণিত মানুষের জনতা জীবনের এক উন্মুক্ত ক্ষেত্রে এসে সম্মিলিত হচ্ছে। এক প্রকৃতির তীর্থপথিক মিলছে ভিনদেশী ভিন্ন প্রকৃতির মানুষের সঙ্গে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়, সমস্ত রকম ভয় তুচ্ছ করে তারা মেলায় এসে মিলিত হয়ে জীবনের ক্ষেত্রটিকে প্রশস্ততর করেছে, প্রসারিত করেছে। এর মধ্যে অনেক বিরুদ্ধ শক্তির প্রভাবও পড়েছে। অর্থনীতি কিংবা বিজ্ঞানের গতিময় প্রবাহ ধারায় তাদের সংস্কারের ভিত ধ্বসেও যাচ্ছে না। কিন্তু অন্তবে অন্তরে গ্রাম কেন্দ্রিক বাংলার ঘরে ঘরে নিত্যকালের এই ধর্ম-চেতনা চিরকাল বহে চলেছে। এ দেশের মানুষ জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে যেন নিজের ধমনীতে শুনতে পায় এই ধর্মপ্রাণতার কলতান। জীবনেব ভিত্তিমূল থেকে অনুভব কবে দেবতার আহ্বান।

লৌকিক দেবতা তাই আমাদের অতি আপন জন। এদের রূপ কল্পনায়ও আমরা অত্যন্ত স্বচ্ছন্দ হয়েছি। দেবতারা আমাদের ঘরে আপন পরিজনের মত সম্মান পাচ্ছেন।

এমনি একটি সহজ দেবতা শ্রীরামচন্দ্র। যদিও বাংলাদেশে এঁকে বহিরাগতই বলব—বলব উত্তরভারত হতে আগত তবু বাঙালীব মন জুড়ে, দেশেব আপামর জনসাধাবণের মনেব মণিকোঠায় এই দেবতাটির স্থান বেশ উঁচু বেদিতে: আমাদের নিজেদের অজ্ঞাতসারেই তিনি যেন একটি বিবাট সেতু নির্মাণ করে একটি সংহতি ও সমন্বয়ের প্রতীক হয়ে রয়েছেন। তিনি আর্য অনার্য সমন্বয়ের প্রতীক। তাঁর জীবনের নাট্য কাহিনী থেকে আমাদের দেশের মানুষ জীবন সম্পদ কুড়িয়েছে। তিনি শিখিয়েছেন, আত্মস্বার্থ ত্যাগ কর, ত্যাগ ব্রত গ্রহণ কর। কল্যাণী সর্বংসহা, পবিত্র-চরিত্রা নারীর আদর্শ আমাদের মেয়েরাই গ্রহণ করেছেন জনক দুহিতার কাছে। এই যে এক সুমহান আদর্শের মধ্যে নিজেদের নিমজ্জন—এর তুলনা ভারতের পর্ণকুটিরের দাওয়া থেকে সুসভ্য মহানগরীর আলোকজ্জ্বল প্রাসাদের মানুষের ঘরেও খুঁজে পাওয়া

যাবে। মহাকাব্য এমনি এক চিরন্তনী শাশ্বত রূপে বহমান কালের স্রোতধারায় এ দেশের প্রতিটি মানুষকে অবগাহনে ধন্য করেছে।

সব সত্য।

তবু এর পরেও কথা আছে। শ্রীরামচন্দ্র তবু বাংলার নিজস্ব নন। বাংলার ঘরের কুলদেবতার সম্মান তিনি কারও কারও ঘরে পেয়েছেন বটে, কিন্তু চণ্ডী, মনসা, শীতলা বা লক্ষ্মী দেবীর মত তাঁর আবেদন এখনও যেন প্রতি ঘরে পৌঁছয় নি। রামনবমী তিথিটি পাঁজির পাতার মধ্যে আজও নির্বাসিত হয়ে আছে। এরই মধ্যে হাওড়া জেলার সদরের শিবপুর থানায় রামরাজাতলা গ্রামে—বারাণসী সমতুল গঙ্গার পশ্চিম কুলে শহরের অনতিদূরে বাংলার বরেন্দ্রভূমি হ'তে আগত সিদ্ধশ্রোত্রিয় এক বাৎস্যগোত্র চন্দ্রশেখর সান্যাল বংশোসম্ভূত পরিবারবর্গ বসবাস আরম্ভ করেছিলেন অনেককাল পূর্বে এবং সম্ভবতঃ তাঁরই গৃহদেবতা রূপে শ্রীরামচন্দ্রও তাঁর সঙ্গে এসেছিলেন এখানে এবং বসতি স্থাপন করেছিলেন। গ্রামের নাম তখন রামরাজাতলা না থাকবারই কথা। এবং ৺চন্দ্রশেখরের আগমন কত বছরের প্রাচীন তার আলোচনা এখানে না করে—সেই ৺চন্দ্রশেখর বংশোদ্ভব ৺অযোধ্যারামের আমল থেকে এই বারোয়ারি পূজার প্রবর্তন ধরা যেতে পারে। আসলে সান্যাল হলেও নিজের ক্ষমতায় তিনি এ গ্রামে আধিপত্য বিস্তার এবং জমিদাররূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে 'চৌধুরী' খেতাবধারী হয়েছিলেন।

এ সব ইতিহাস খুব বেশি প্রাচীন নয়। সান্যাল বংশের ইষ্টদেবতা শ্রীরামচন্দ্রের সাধারণ্যে প্রতিষ্ঠা য ৺অযোধ্যারাম চৌধুরীর আমলে—তিনি ২০০।২৫০ বছরের বেশি প্রাচীন হবেন না। বাংলার অন্যান্য ব্রাহ্মণ অধ্যুষিত অঞ্চলের মত এ গ্রাম তখন সংস্কৃতিতে যে বেশ খানিকটা উন্নত ছিল—তার পরিচয় আছে। মনে হয় আজকের এই রাম বিজয়ার রাজকীয় অনুষ্ঠান মহাসমারোহে তখন থেকেই চলে আসছে।

এর মধ্যে চৌধুরীদের কুলপঞ্জীতে নানা কাহিনী সমন্বিত ইতিহাস থাকতে পারে; কিন্তু সে সব আলোচনার মধ্যে না গিয়ে ওই ৺চন্দ্রশেখর বংশ-সম্ভূত হলধর ন্যায়রত্ন মহাশয়ের উত্তরপুরুষ এবং আধুনিক কালের শ্রীরামচন্দ্রের পুরোহিত শ্রীপবনচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়ের বক্তব্য সমর্থন করে বলা যায়, অযোধ্যারাম প্রতিষ্ঠিত শ্রীরামচন্দ্রের মৃণ্ময় প্রতিমার সঙ্গে কালক্রমে ব্রহ্মাদি দেবগণ এবং ভরতাদি ভ্রাতৃবর্গ, হনুমান, জাম্ববান, বশিষ্ঠ বাল্মিকী নারদাদি স্থান গ্রহণ করেছেন। সমগ্র কাঠামোটিতে আরও একটি বৈশিষ্ট্য আছে। শীর্ষদেশে এর অক্ষরস্বরূপা বেদগায়ত্রী সরস্বতী দেবী সমাসীনা। এটি নাকি কোন একটি স্থানীয় গ্রাম্যবিবাদের নিরসনের নিদর্শন। সে যাই হোক, এই সমন্বয়ের ফলে ভ্রাতৃবর্গ, পারিষদ, হনুমান, জাম্ববান পরিবেষ্টিত সিংহাসনাসীন শ্রীরামচন্দ্রের রাজসভায় যেমন একটি অখণ্ড চিত্র পাই—তেমনি ব্রহ্মা, মহাদেব, নারদ, বশিষ্ঠ, বাল্মিকীর উপস্থিতিতে এবং হিন্দু'কল্পনার রামায়ণ সৃষ্টির কাহিনীর সঙ্গে জড়িত বীণাপাণির মূর্তি-পরিবেশ সমগ্র রূপটিকে একটি মূর্তি-পরিকল্পনার নিপুণ নিদর্শন করে রেখেছে।

রামনবমী শ্রীরামচন্দ্রের জন্মতিথি। এ তিথি কোটি সূর্য গ্রহাধিক। বৈশাখে সে উৎসব গেছে। তারপরে গেছে জ্যৈষ্ঠ। পার হয়েছে আষাঢ়। আমি আবার ফিরে এসেছি শ্রাবণের সংক্রান্তির শেষ রবিবারে। আজকের রামরাজাতলা বছরের অন্যান্য দিনগুলি থেকে স্বতন্ত্র হয়ে সকাল হতে সন্ধ্যা কাটাচ্ছে।

একটা দিনের মেলা; মেলাও এমন অনেক হয় বাংলাদেশে। কিন্তু রাজা রামচন্দ্রের বিসর্জনের শোভাযাত্রাটিতে যে রাজকীয়তা থাকে—বৈশিষ্ট্য থাকে তার মধ্যে। রামরাজাতলা থেকে,মল্লিক ফটকের গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড পেরিয়ে শ্রীরামচন্দ্র বিসর্জনে যাবেন গঙ্গার ঘাটে। এই দীর্ঘ সাড়ে তিন, চার মাইল পথের শোভাযাত্রা চালাতে বাস ও

অন্যান্য যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যাবে, কয়েক ঘণ্টার জন্যে। লোহার চাকা পরানো গাড়িটায় শ্রীরামচন্দ্রকে নিয়ে জি. টি. রোড পার করতে বিশেষ ব্যবস্থায় শিবপুর গামী ট্রামের তারও খুলে নেওয়া হবে। এত বিরাট এর কাঠামোর গঠন। রাস্তার ওপর থেকে বিশ পঁচিশ ফুট হবে।

শ্রাবণের দিন। বৃষ্টি মাঝে মাঝে হয়। কালোদাদের বাড়ির ছাদ থেকে দেখি বিরাট শোভাযাত্রাটি। রামচন্দ্রের আগে আগে চলেছে অজস্র লোকের বিরাট শোভাযাত্রা। ব্যাগ পাইপের গান, দেশি ঢাকের দল, বিচিত্র সংএর নাচ। ভটচার্জ্জি পাড়ার গলি থেকে বেরুচ্ছে 'সোমাই-চণ্ডীর' বিরাট মূর্তি। বাকসাড়ার দিক থেকে আসছে 'নবনারী'। সে মূর্তির আকৃতিও বিচিত্র। ন'টি নারী একত্র সমবেত হয়ে একটি হস্তীর রূপ দিয়েছেন। তার ওপর বসে আছেন শ্রীকৃষ্ণ আর শ্রীরাধা। সুন্দর সুগঠিত। সব বিশাল দেহি দিব্যাননা এই সব দেবতাদের পথে ঘাটে চলন্ত দেখে অকস্মাৎ মনে করা যেতে পাবে, কলি যুগ থেকে অনেক পেছিয়ে আমরা যেন সত্যিই ত্রেতা যুগের রাম রাজত্বে এসে পড়েছি। কিন্তু একটু ভেবে বাস্তবে নেমে এলে সলজ্জে মনে পড়বে, না তার সেবকই আছি বটে, অনার্যত্বও হয়ত লুপ্ত হয়েছে, প্রজা হিসেবে শরীরের প্রান্তস্থিত বাড়তি অংশটুকু উহ্য হয়েছে হয়ত বা—কিন্তু যে তিমিরে সেই তিমিরেই এখনও পড়ে আছি। রামচন্দ্র আছেন; তার রাজত্ব কিন্তু দূর অস্ত্।..

সন্ধ্যায় গঙ্গার ঘাটে পৌঁছে ভিন্ন ভিন্ন দেবতাকে কাঠামো থেকে বিচ্ছিন্ন করে গঙ্গায় জলাঞ্জলি দেওয়া হয়। সমস্ত ঘটনাটি ঘটতে যে পরিমাণ অর্থ, সময় ও পরিশ্রমের ব্যয় হয়—তা রাজকীয়ই বটে। তাই বলছি, বৈশাখে রাজা রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক থেকে শ্রাবণে বিসর্জন পর্যন্ত চার মাসের সমগ্র অনুষ্ঠানটির মধ্যে যে রাজকীয়তা আছে—তার মিল কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না।

প্রাসঙ্গিকভাবে বলে রাখি বিসর্জনের আগের রবিবার অসংখ্য দরিদ্রকে অন্নদান করানোর যে রীতি আজও এখানে বর্তমান—তার মধ্যেও রাজকীয়তা সুপরিস্ফুট। অতএব রামরাজাতলার বাসিন্দারা উজীর ফকির যে যাই হোক না কেন—অন্তত এই চারমাস ধরে তারা বলে যেতে পাবে, 'আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রামের রাজত্বে'; সে আধুনিক ভারত কাহিনীতে কাল্পনিক রামরাজত্বের সঙ্গে মিলুক আর নাই মিলুক।—

"রাম শক্তিযুত রক্ষা যে সুকৃতী পড়ে
দীর্ঘ আয়ু, সুখ, পুত্র সেই লাভ করে॥
সর্বত্র বিজয় মান লভিবে বিনয়।
ইহ পরলোকে সুখ, রামের সেবায়॥

অতএব—

"ইক্ষাকুনন্দন কুক্ষি নয়নাভিরাম।
অন্তরে সতত রাম, মুখে বল রাম॥"

রাম চলে যাবেন। আবার আসবেন আগামী বৈশাখে। এ-শ্রাবণ-সংক্রান্তি চলে গেল,—আবার আসবে। নতুন মানুষ পুরাতন মানুষেব সঙ্গে আসবে যাবে। এ বছরের পুরোন শালপাতার খাবারের ঠোঙা উড়ে যাবে বাতাসে; আবার পরের বছরে নতুন আসবে। এ-বছরের তালপাতার বাঁশি তারস্বরে চিৎকার করতে করতে আগামী নবমীর দিনে সুর মেলাবে। মেলার দোকানগুলো ক'দিনের মধ্যেই উঠে অন্যত্র আস্তানা পাতবে। যাঁরা গত চার মাস ধরে নিত্য নিয়মিত রাম দর্শন করে গেছেন—তাঁরা দেখবেন শূন্য বেদি খাঁ খাঁ করছে! মন্দিরের অঙ্গনে আজকের রাতের মত আস্তানা পাতবে মেলা-দেখতে আসা মেয়ে শিশুদের ভিড়।

চার মাসের প্রাচীন কৃষ্ণবর্ণ তেলে নতুন করে ভাজা পাঁপর আর

গুড়ের জিলিপি আজ শেষ বারের মত বিক্রী শেষ করবে। আর আমি আস্তে আস্তে ঘরে ফিরে আসব। 'বন্দরে বন্ধনকাল এবারের মত হল শেষ।'



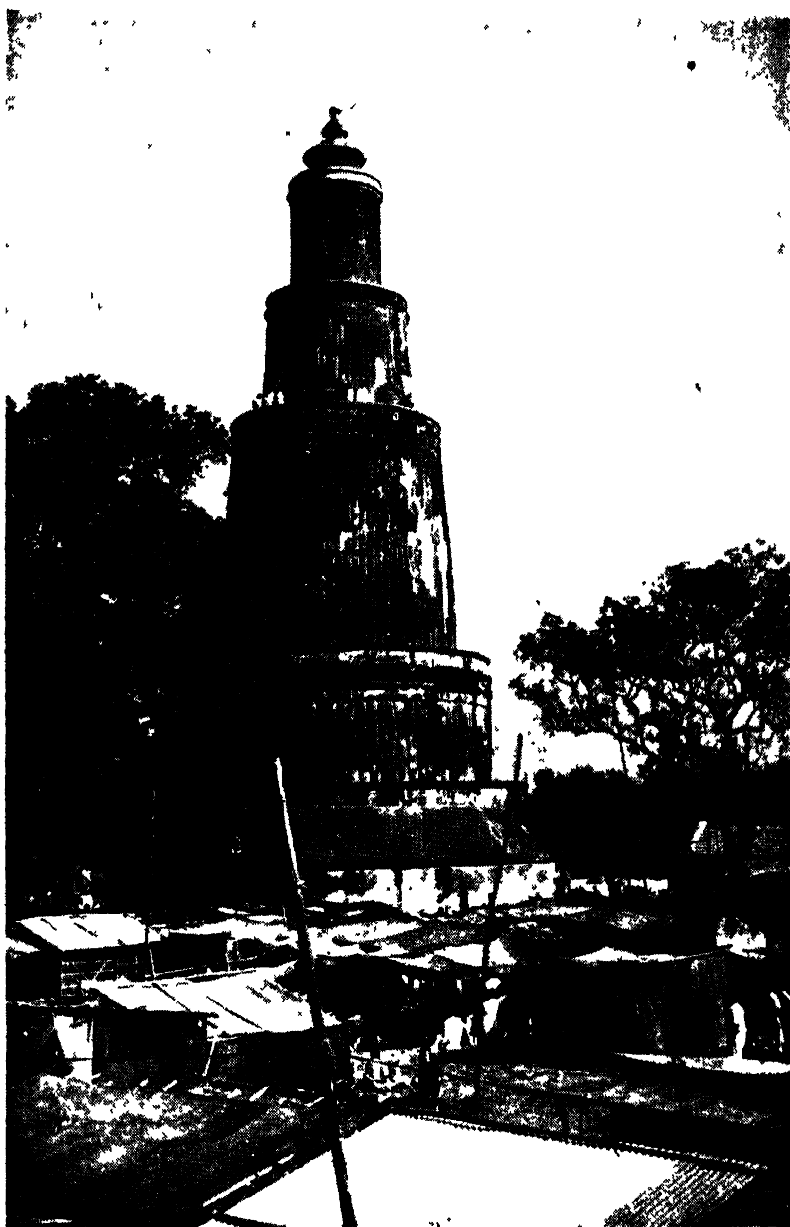


তের

বন্দরে বন্ধনকাল এবারের মত সত্যি শেষ হয়ে গেল বুঝি।

নিশ্চিন্ত নিরুপদ্রব বেকার জীবন। তার ওপর হালছেঁড়া পালভাঙার মতন অস্থানে কুস্থানে ঘুরে বেড়াই! মা দিদিরা এবার সত্যিই নিঃশ্বাস ছেড়ে বাঁচল। যাই হোক ছেলেটার মতি গতি বোধ হয় ফিরেছে; এবার ঘরমুখো হয়েছে মন। কিন্তু আশ্বাস কোথায়? মন ঘরে থাকবে কেন! তার জন্যে আত্মীয়সুলভ যতগুলি বাঁধন দিয়ে একটা সচল পদার্থকে কড় কড় করে বেঁধে অচল করা সম্ভব— সেগুলো আমার ওপর খাটেনা; কন্যাপক্ষ এই বড়-সড়ো চেহারার নড়বড়ে ছেলেটার কথা অতর্কিতে ভূত দেখার মত শুনে নিজেদেব আখের সামলান। আর আমি নির্বিঘ্নে, অনায়াসে দিনের পর দিন অতিবাহিত করে যাই।

এই বেকারত্ব ঘোচাতেই আমি একদিন উঠে পড়ে লেগেছিলুম সত্যি! তখন সম্ভব অসম্ভব প্রত্যেক জায়গায় গিয়ে দাঁড়াতাম। সকাল থেকে কালো খ্যাবড়ামুখো সু-জোড়া ঘষে ঘষে চকচকেতর করতাম। গুঁফো ওস্তাগরের তৈরী একখানি সাদা প্যান্ট নিজে সাবানে কেচে ভাতের ফ্যানে ডুবিয়ে পাশের বাড়ির মড়চে-পড়া লোহার ইস্ত্রী চেয়ে এনে সেটা একটা সকাল ধ্বংস করে ইনটারভিউ এর প্রস্তুতি



শাহসুফীর মিনার—পাণ্ডুয়া, হুগলী



শ্রীমায়ের বসতবাটি—জয়রামবাটি, বাঁকুড়া

পর্ব চলতো। তারপর বেরিয়ে পড়তাম ; আর প্রত্যেক বারই বেরবার সময় নিজের দিকে অপাঙ্গে চেয়ে ভাবতাম, কোন ব্যাটা চাকরী না দেয়। কিন্তু ওই একই ব্যাপার! পাত্রপক্ষ মেয়ে দেখতে আসেন। মেয়ের চুল খুলে, হাঁটিয়ে, পায়ের তলায় ঝ্যাঁটার কাঠি ঢুকিয়ে, মেয়েকে গাইয়ে, হাতের লেখা লিখিয়ে ফিরে যাবার সময় যেমন বলেন, 'গিয়ে জানাব'। তারপর সব চুপচাপ। আমারও তেমনি। 'নো ভেকেন্‌সি'র বেড়া টপকে যদিও বা একজামিনটা দিয়ে আসি—দিনের পর দিন চলে গেলেও ওদিক থেকে কোন উত্তর নেই।

যাই হোক এমনি করেই তবু জুটেছিল কিছু কিছু! কিন্তু যার কপালে বৈধব্য যোগ, কোন জ্যোতিষার্ণব তাকে বাঁচাবে! পর পর গোটা দুই কোম্পানী উঠে গিয়ে, একটার থেকে ছাঁটাই-এর গলা ধাক্কা খেয়ে প্রচুর আস্ফালন করতে করতে বাড়ি ফিরে খবরের কাগজে দিস্তে দিস্তে চিঠি লিখে খুব কম সময়ের মধ্যে নিস্তেজ হয়ে বাড়িতে বসে পড়লাম আমি।

এখন বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দেখা হলে, বিবাহিতেরা বলে, 'বেড়ে আছিস। সংসারের ভাবনা ভাবতে হয় না।' চাকুরীজীবিরা বলে, 'বেঁচে গেলি ; পরের দাসত্ব করতে হল না!'

কিন্তু কেন করতে হল না যদি জানতে! আর হায় তাত, যদি জানতে তার বদলে কি করতে হচ্ছে আমায়।

শরীরটা কিছুদিন ধরেই খারাপ চলছিল। ভাদ্রের কটা দিন যেতে না যেতেই বিছানায় শুলাম। কোথায় রইল ফুলবেড়ের হাফিজ মিঞার বাড়ির বিছানায় শুয়ে মুরগির ঠ্যাং চোষা—কোথায় রইল শালছত্রিতে কানমনির অন্ধ ঠাকুমার মুখে ঘণ্টার পর ঘণ্টা হাঁস হাঁসিলের গল্প শুনতে শুনতে ফাল্গুনের রাতে নায়েবের খাটিয়ায় ঘুমিয়ে পড়া। এক, দুই, তিন, চার করে দিন দশ কেটে গেল জ্বরের ঘোরে! লোকে

বললে, 'ডেঙ্গু'। তারপর মোটা মোটা ওষুধ খাইয়ে গায়ের তাপ একবারে পাঁকাল মাছের মতন ঠাণ্ডা করে দিয়ে ডাক্তার সাহেব হাত গুটিয়ে বললেন, 'হয়েছে! আমার সঙ্গে চালাকি!'

সত্যিই তো ডাক্তারের সঙ্গে চালাকি! শরীরের কোথায় কি আছে—তাদের সব নখদর্পণে। ব্লাড, স্পুটাম, ইউরিন, উল্টে পাল্টে এক্সরে—এসব ছেড়ে অসুখ পালাবে কোথায়! বরং দেখে শুনে রোগীর আত্মীয়স্বজনেরই রক্ত শুকিয়ে যাচ্ছে। এর ওপর ধর—আমাদের দেশে কত সুবিধে? রক্ত পরীক্ষা করবে? কর না! দরজা খোলা। টাকা ফেল! সকালে ব্লাড রিপোর্টে দেখলে মারাত্মক টাইফয়েডের বীজ একবারে রক্ত ছেয়ে ফেলেছে; আর বিকেলেই সেই রোগীব জ্বর ছেড়ে ক্রমশ ভালর দিকে আসতে আরম্ভ করল। রিপোর্ট ভুল? কর প্রমাণ? দামী দামী এক্সরের যন্ত্রপাতি। নাম করা রেডিও-লজিস্ট! রাজ-রোগে বুক ঝাঁজরা। অথচ চমৎকার রিপোর্ট! 'নো এভিডেন্স অব ইন্‌ফিলট্রেশন!'

অত দূর গড়াল না! গণ্ডা গণ্ডা টেংরির জুস, পাঁঠার কল্‌জে আর দুষ্প্রাপ্য মাছের ঝোল খেয়ে টলে টলে উঠে দাঁড়ালাম উনিশ দিনের মাথায়!

১৯৩৩ সাল চলছে! গরীবরা আরও গরীব হচ্ছে। ধনী আরও ফেঁপে উঠেছে! এভারেষ্ট অভিযানের মত এক একটা জেদ টুঁটি টিপে ধরেছে মানুষকে! হুড় হুড় করে পয়সা আসছে—হু-হু করে স্রোতের মত বেরিয়ে যাচ্ছে সে পয়সা। বাজারের মাথা যেখানেই উঠুক হাজার হাজার তেনজিং ছুটছে তার মাথায় চড়তে। আর মনে মনে মগজে মগজে ঠাণ্ডা-লড়াই গুঁড়ি মেরে মেরে ঢুকছে!......

এ অবস্থায় আবার আমি পায়ের ওপর দাঁড়ালাম। আবার খবরের কাগজের মিথ্যে আজগুবি মন ভোলানো খবর পড়তে, মহম্মদ ঘোরীদের রাজত্বের একপ্রান্তে এক অতি দীন হতদরিদ্র প্রজা হয়ে

আমি আবার বেঁচে উঠলাম! আর তলে তলে চাগাড় দিয়ে উঠল সেই মাতাল চিন্তা—পালাতে হবে।

বন্ধুরা বললে, 'হিউয়েন শাং এবার?'

বললুম, 'তোরা কি খোঁড়া মানুষটাকে ব্যঙ্গ করছিস? মাথা মোটা রুগ্ন পাঁটাগুলো নিজেদের জোড়া জোড়া পা দান করেও আমার পায়ে জোর আনতে পারছে না! নড়ি কি করে?'

ঘরে বসে বসে কল্পনা করি। আকাশের দিকে চেয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলি। এত সুন্দর রোদ্দুরের দিন নিয়ে শরতের পূজো আসছে; সেই অনাগত দিনের কাশ ফুলগুলো হাওয়ায় অদৃশ্য বন-দেবতাকে ব্যজন করছে; সেই বেলে পোলের ধারের ঝিলের পাশটাতে ফিঙ্গে উড়ছে: মেঘে উড়ছে! আর আমি ঘবে বসে আছি! জানি না কোন অপরাধে কোন বিধাতা অভিশাপ দিয়ে রেখেছে আমাব! কারও পবে তো ক্রোধ করা যাবে না; হিংসা করা যাবে না। কেবল বসে বসে ক্লান্তি কাটাতে কাটাতে একদিন আলোকিত পৃথিবীর মুখ দেখবো আমি! একদিন এই নোংরা সংশয় ভরা অসংযত পৃথিবীর কোন দ্বাব উদ্বোধন করে এক আশান্বিত আলো পড়বে আমার চোখে। সেদিনের পথ চেয়েই বসে থাকি আমি।

বন্দরে বন্ধনকাল এবার শেষ হবেই হবে।...

মনে মনে এই সেদিনকার কল্পনা! তন্ন তন্ন করে নিজেব ভেতরটা খুঁজে ওই একটাই উত্তর আসে—শেষ হয় নি! গগন হরকবা এখনও বলছে, 'আমি কোথায় পাব তারে—।'

জোটেও! এক যায় আর এক আসে—এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস! আকাশবিহারী কল্পনার মৃত্যু হয়; উত্তুঙ্গ উচ্চাশায় অপমৃত্যু মানুষকে দলে পিষে দিয়ে যায়। তাব চেয়ে বর্তমানকে ভালবেসে, বর্তমানের দুঃখ আনন্দের জেব না টেনে দিনের পর দিন কাটিয়ে দেওয়া ভাল। একদিন কেউ দিতে আসবেই। দু'হাত ভরে দিয়ে যাবেই। তখন নেবার জন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে। নিজেকে ভারবাহী

পশুর মতন স্থাণু করে রাখলে চলবে না। মুক্ত রাখতে হবে। চলতে চলতে নিজেকে পূর্ণ করতে হবে।

হয়ত এসব আশাবাদী এক ক্লান্ত মনের চিন্তা। অবসন্ন মন বিছানায় বসে বসে রিটায়ার্ড বুড়োর মত হয়ত এই সবই ভাবে।

. কিন্তু সে যাই হোক। এক যায় আর এক আসে—এ আমি দেখেছি। নইলে পাশের বাড়ির লোক নিখিলদা এমন করে আসবেন কেন হঠাৎ।

পূজোর পরে কথায় কথায় মাসিমা বললেন, 'ওরে নিখিলের পেটে যে গল-ব্লাডারে ষ্টোন হয়েছিল—এবার তুমাস ছুটি নিয়ে সে এখানে আসছে; ডাক্তার দেখিয়ে সারিয়ে সুরিয়ে আবার ফিরে যাবে সিউড়ি।'

নিখিলদা সিউড়িতে রেজিষ্ট্রার অফিসের চাকুরে।

তখন মনে হয় নি সিউড়ি গেলে হয়।

ক'দিন পরে অমিয় এলো। গত ক' বছর পূজোর কটা দিন কলকাতার ভিড় এড়াতে কাছাকাছি এমন কত অখ্যাত গণ্ডগ্রামে তুজনে যেতাম,—সেখানে তুর্গাপূজোর চাঁদা চায় না—সারারাতব্যাপী মাইক সুস্থ জীবনকে ব্যতিব্যস্ত করে না উৎসবের নাম করে। কিন্তু এবারে ও যেতে পারে নি। গত শীতে ঝাড়গ্রাম থেকে রেবেকা অনেকখানি সুস্থ হয়ে এসেছিল—কিন্তু আবার যে কে সেই। সেই অম্বল এবং আনুষঙ্গিক। ডাক্তার নাড়ী নক্ষত্র দেখে আবার বলেছে, হাওয়া পরিবর্তন কর। অতএব ছুটি নিয়ে তারই তোড়জোড়ে অমিয় তখন ব্যস্ত। কোথায় যাবে এখনও স্থির করতে পারেনি। এবার ইচ্ছে আমাকে সঙ্গে নেবে।

নিখিলদার ঘটনাটা শুনে ও যেন সেই মুহূর্তেই সব ঠিক করে ফেলল। নিখিলদা তু'মাসের জন্যে ছুটি নিয়ে এখানে এলে ওর সিউড়ির বাসা ফাঁকাই পড়ে থাকবে। অফিসের পিওন তুজন থাকবে সেখানে। নিখিলদার সাজানো সংসার। গোয়ালা ঝি পর্যন্ত

বরখাস্ত হবার দরকার নেই। অমিয় সব শুনে বলল, 'এখুনি চিঠি লেখ। নিখিলদার কোন অসুবিধে না থাকলে আমরা সকলে মিলে সেখানেই থেকে আসি!'

সকলে মানে অনেক!

অমিয় আছে; তার সঙ্গে রেবেকা আর ওদের পাঁচ বছরের মেয়ে সিমকি। অমিয় জোগাড় করেছে বিশু আর উমাকে। তাদের সঙ্গে যাবে ওদের এক বছরের ছেলে কুমার। ভূপেনকে বলেছিল। ও যেতে পারছে না। আর আমি আছি নির্ঝঞ্ঝাট পাহারাদার। ওদের হোটেলে দিব্যি কাটিয়ে দোব। শীত পড়ো পড়ো। সময়টাও ভাল লাগবে বীরভূমের জলহাওয়ায়।

এমনি করে একদিন সাঁইথিয়া হয়ে সিউড়ি এসে হাজির হলাম সদলবলে। বৌদি সিউড়ির ঘরের চাবি দিয়েছিলেন। কোনো অসুবিধেই রইল না। চাল, ডাল, কুকার, জ্বালাবার কেরাসিন তেল পর্যন্ত কিনে রেখে এসেছেন বৌদি। সিউড়ির বাড়িতে নিশ্চিন্তে সংসার আরম্ভ হয়ে গেল।

সিউড়ি দেখলাম। জেলা বীরভূমের প্রধান সহর। মুণ্ডারী ভাষায় 'বীর' অর্থাৎ জঙ্গলভূম আগেও দেখেছি; সেবার নলহাটি, রামপুরহাট হয়ে তারাপীঠ নান্নুর কীর্ণাহার ঘুরে বীরভূমের একটা রূপ আমি দেখে গেছি। দেখে গেছি, এক বিচিত্র চেহারার মাটি, বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আদিম বাসিন্দাদের চলন-বলন, দেবীর পীঠস্থান, আর প্রত্নতাত্ত্বিকের 'সাইটে'র আনন্দময় প্রাগৈতিহাসিক সংস্কৃতির সাক্ষ্য। বাংলার একটা প্রান্তে সামান্যতম অংশ জুড়ে এর অবস্থান; কিন্তু আপন সম্পদে বীরভূম যেন বাংলার অনেকখানি স্থান অধিকার করে নৃবিজ্ঞানী, সমাজ বিজ্ঞানী আর সংস্কৃতি বিজ্ঞানীদের টান দিয়েছে যুগে-যুগে।

এ বৈচিত্র্য নানা কারণে! এর পশ্চিমাঞ্চল জুড়ে সাঁওতাল পরগনার পাহাড় অঞ্চল অনাদি কাল হ'তে এক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সংস্কৃতি সৃষ্টির জনকের মত দাঁড়িয়ে আছে। ছোট বড় অসংখ্য নদীপথে সেই আদিম-

তম সংস্কৃতি ধারা নেমে এসে বাংলার অনেকখানি অঞ্চলে বিস্তৃত হয়ে উন্নততর সংস্কৃতির সঙ্গে মিলে মিশে একাকার হয়ে এক নতুন রূপ নিয়েছে। অসংখ্য দেব-দেবী, আর্যেতর থেকে উন্নততর, একত্রে বিরাজ করে বীরভূমের সিউড়ি যেন অজ্ঞাতসারে এক সংস্কৃতির জাদুঘরে* পরিণত হয়েছে। মনসা, ধর্মঠাকুর, ব্রাহ্মণী চণ্ডী প্রভৃতি অতি জীবন্ত দেবতা যেমন আছেন এখানে, তেমনি রাধাবল্লভের মন্দির, উন্নততর শিল্প নিদর্শন হিসেবে পোড়ামাটিতে তৈরী অপূর্ব 'ঘুনসা' মন্দিরও আছে।

দাস কলকাতা অপিস থেকে ভাস্কর সেনকে চিঠিতে জানিয়েছিল আমাদের কথা। এক্সপ্লোরিং অ্যাসিস্টেণ্ট ভাস্কর সেন সিউড়িতে বসবাস করে আর আর্কিওলজির কাজে বীরভূমের খ্যাত অখ্যাত সমস্ত জায়গা চষে বেড়ায়; অতএব ভাস্করের সাহায্য পেয়ে সিউড়ির দিনগুলো আরও ঘনিষ্ঠ মনে হবে আমাদের। যেখানে সেখানে এক্সপ্লোরেশনে যাবার দরকার নেই; বন্ধু-বান্ধব স্ত্রী-পুত্র দিয়ে একটা পুরোপুরি সংসার; অতএব মোটামুটি বিখ্যাত স্থানগুলি ঘুরে নিতে পারলেই আমাদের চলবে। সেন সেই মতই ব্যবস্থা করল। ট্যাক্সির বন্দোবস্ত করে একদিন সোজা ময়ুরাক্ষীর ব্যারেজে পাঠিয়ে দিল। সমতলের আবহাওয়া ছেড়ে ম্যাসেন্‌জোড়ের পাহাড়ে উঠে রীতিমত কাঁপুনি ধরে গেল সকলের; সন্ধের অন্ধকার চারদিক কালো করে দিচ্ছে। দূরে ছবির মত বাংলোর থেকে আলো বেরিয়ে আসছে। আলো আসছে বিহার সরকারের বাংলো থেকে। জনমানবহীন ব্যারেজে বেড়াতে বেড়াতে ময়ুরাক্ষীর বিস্ফারিত জলধারার একটানা অনন্ত জলকল্লোলের আড়ালে আধুনিক বিজ্ঞানের রোমাঞ্চে ভরা ব্যারেজে বেড়াতে বেড়াতে এর বিরাটত্বে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

ওপারের পাহাড়গুলো শীতের কুয়াশায় ক্রমে অস্পষ্ট হয়ে আসছে; ঠাণ্ডা হাওয়া মাঝে মাঝে কাঁপন ধরিয়ে দিচ্ছে বুকের মধ্যে। আস্তে আস্তে নেমে এলাম নিচে। পাহাড়ে ওঠা নামায় ক্লান্ত হয়েছি।

নিচের বাগানটায় কিছুক্ষণ বসে থেকে ফিরে আসতে হল গাড়িতে। যথারীতি আবার বিহার বাংলার বর্ডারে চেকপোষ্ট। ড্রাইভারের চেনা মুখ। গাড়ির কাঁচগুলো তুলে উন্মুক্ত বাইশ চব্বিশ মাইল রাস্তা পার হয়ে এলাম। যথারীতি আবার সংসারে মন দিল সকলে।

দেখতে দেখতে কার্তিকের অনেকগুলো দিন সিউড়ির বাড়িতে নির্বিঘ্নে কেটে গেল। এ-বাড়িতে আরও অনেকগুলো দিন কাটাবার অনুমতি আছে এখনও। অতএব যার জন্যে আসা সেই রেবেকাও অনেকখানি সুস্থ হয়ে গেল—বাজারে মিষ্টির দোকানে আমলকী, শতমূল, পাতিলেবু, লঙ্কা, উচ্ছে প্রভৃতি খাদ্য অখাদ্য যাবতীয় তরি-তরকারির মোরব্বা খেয়ে যখন শারীরিক অসুস্থতা দেখা গেল না, তখনই প্রমাণ হয়ে গেল এ কথা। এর ওপর সাংসারিক হেফাজৎ নেই, বিরোধ বিসংবাদ নেই। কেবল সিমকি আর কুমার, ছুটো শিশুর দিকে কিছুটা দৃষ্টি রেখে চললেই হল।

সেন একদিন এসে বলল, 'আমাদের নান্নুরে ক্যাম্প পড়েছে জানেন তো?'

দাসের মুখে কলকাতা থাকতে শুনেছিলাম বটে এ কথা। নান্নুরে চণ্ডীদাসের ঢিবিতে কিছুটা কাজ করে ওরা জানুয়ারী নাগাদ উঠে আসবে মহিষডালে! নান্নুরের কথা শুনে একবার গিয়ে উপস্থিত হতেও ইচ্ছে করল নান্নুরে। কিন্তু বাধা দিল সকলে; সংসারের একটা নতুন স্বাদ অনুভব করতে করতে, অমিয়র হোটেলের ভোজ নিত্য খেয়ে খেয়ে বেশ নিরবিচ্ছিন্ন সুখে সিউড়ির দিনগুলো কাটছিল। নান্নুরে ওরা আরও কিছু দিন থাকবে। অতএব আপাতত নান্নুর মুলতুবি রেখে চেপে থেকে গেলাম আরও কিছুদিন। বুঝলাম সংসারের একটা মোহ আছে; সেইটেই নড়তে দিচ্ছে না।

এর মধ্যে একদিন বক্রেশ্বর যাবার ব্যবস্থাও করে দিল ভাস্বর বাবু। সিউড়িতে আছি; বক্রেশ্বর মাইল চোদ্দর রাস্তা। অথচ এত খ্যাতনামা জায়গায় যাওয়া হয় নি—সেটা যেন কেমন লাগত!

ওখানে দিন দুই থাকবার মত ইনসপেকশন বাংলোর ব্যবস্থাও করে এসেছে সেন। বলল, 'সকালে চলে যান! সঙ্গে গাড়ি রইল। ওখানে একটা রাত কাটিয়ে কুণ্ডে স্নান করে, দশভুজার পুজো দিয়ে, এধার ওধার বেড়িয়ে পরের দিন সকালে ফেরার পথে দুবরাজপুর ঘুরে চলে আসুন। শীতকালের দিন—সঙ্গে বিছানা যতটুকু নেবার দরকার নিয়ে যান—। কোন অসুবিধে হবে না।'

চমৎকার একটা ব্যবস্থা।

সকলে আমরা দারুণ আশ্বস্থ হলাম।

কিন্তু অমিয় একটা 'কিন্তু' তুলল। বলল, 'জানেন তো শিশু পশুর সমান! এই দুটোকে নিয়ে মুস্কিলে পড়বো না তো?'

হিসেবী সাবধান ছেলে। এক কথায় চট করে নতুন ব্যবস্থার মধ্যে উপস্থিত হতে সাহস পায় না অমিয়।

তবু কেউ আমল দিল না। কুকারে কিছু কিছু খাবার দাবার, কিছু কিছু বিছানা বালিশ, পশুর সমান শিশুদের জন্যে তিনটে ফ্লাস্ক ভর্তি দুধ নিয়ে একদিন সকালে গাড়িতে গাদাগাদি করে বসা গেল। সেন বক্রেশ্বর অবধি যাবে নিজের কাজে। আমাদের থাকবার খাবার বন্দোবস্ত করে দিয়ে ও বাসে ফিরে আসবে। আমরা পরের দিন ইচ্ছে মত দুবরাজপুর ঘুরে ফিরে আসব সিউড়ি।

শীর্ণ বক্রেশ্বর নদীর ব্রিজ পেরিয়ে বাঁ-হাতে ইন্‌সপেকশন বাংলো। দু-পা বাড়ালেই সার সার মন্দির। চোখের সামনে মানুষের বাসস্থান নজরে পড়ে না—পড়ে দেবতার। বংশপরম্পরায় স্থানীয় পাণ্ডারাই এখানকার আদি বাসিন্দা হয়ে বক্রেশ্বরের দেবতাদের এই দেবস্থানে আবদ্ধ রেখেছেন।

সঙ্গে মেয়েরা আছে অতএব পাণ্ডারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে দেবদর্শন করাবার ভার গ্রহণ করলেন। সঙ্গে যা জিনিসপত্তর নিয়ে আসা হয়েছে—তাতে আহারের কোন অসুবিধে হবে না। জ্ঞানী লোকেরা বলেন, পথি নারী বিবর্জিতা। কিন্তু আজকের দিনে পথের সঙ্গী

হিসেবে তাদের বর্জন করা সত্যিই শাস্ত্রমতে নিষিদ্ধ। লেডিজ কাউণ্টার থেকে টিকিট কেনানো, গাড়িতে অসংরক্ষিত আসনে তাদের পাশে সামান্য পরিসর জায়গায় সামান্যতম স্থান সংকুলান হয় কেবলমাত্র সঙ্গে নারী থাকলেই। অনেক জায়গায় দেখেছি, সঙ্গে মহিলা না থাকলে রাত্রিবাস করবার অনুমতি মিলতে চায় না—বিশেষ করে আমার মত যাদের গ্রামে গ্রামে ঘুরতে হচ্ছে। যাক সে কথা—সব কিছু ছেড়ে দিলেও এই নারীযুগল বর্জন করে অন্তত বক্রেশ্বরে স্নানান্তে থালা সাজিয়ে বসা চলত না। জয় বাবা বক্রেশ্বর বলে কম্বল মুড়ি দিয়ে দিবানিদ্রাও সহজলভ্য হয়ে গেল।

শিব শিব আর শিব বক্রেশ্বরে।

বক্রেশ্বরনাথ নিজেও শিব।

অনেককাল আগে স্বর্গে লক্ষ্মীদেবীর স্বয়ংবর সভায় লোমশ আর সুব্রত বলে দুই মুনির নিমন্ত্রণ হয়েছিল। সেই সভায় নিমন্ত্রণ রক্ষাকারী মহামুনিদের ঠিকমত আপ্যায়ন করা হল না। তাইতে সুব্রত মুনি নিদারুণ অসন্তুষ্ট হয়ে সভাস্থল পরিত্যাগ করলেন। আর ক্রোধের এমনই প্রচণ্ডতা—নিজের শরীরেরই আটটি অঙ্গ বিকৃত হয়ে গেল। তাই তার নাম হল অষ্টাবক্র মুনি।

পুরাণের কথা। বিশ্বাস কর আর নাই কর।···মনের মত শ্রোতা পাণ্ডা পেয়ে বেশ গুছিয়ে গল্প আরম্ভ করেছে। বিশু রেবেকাকে বলল, বুঝলে, কথায় কথায় তোমার ক্রোধ। দমন না করলে কিন্তু ওই অষ্টাবক্র মুনির দশা হবে। সাবধান।'

অমিয় বলল, 'বলিস কি রে। আজকাল যা প্লাষ্টিক সার্জারী বেরিয়েছে অষ্টাবক্র হলে তো আমারই ক্ষতি। খরচ করে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আবার সোজা করে দিতে হবে।'

উমা পাণ্ডাকে নিয়ে পড়েছিল। বলল, 'চুপ করুন। গল্প এখনও শেষ হয় নি।'

পাণ্ডা আবার শুরু করল, 'তখন মুনি সেই চেহারা নিয়ে ঘুরতে

ঘুরতে গেলেন কাশীতে—শিবের আরাধনা করবেন বলে। সেখানে অনেক কাল তপস্যা করার পর মুনি জানতে পারলেন কাশী নয়—তাঁকে যেতে হবে গুপ্ত কাশী। বাংলা দেশের কাছাকাছি রাজধানী গৌড়ের সন্নিকটে একটা জায়গায়। মুনিবর তীর্থযাত্রীর মত চলতে চলতে এসে পৌঁছলেন এখানে এই বক্রেশ্বরে। এখানে দশ হাজার বছরের তপস্যার ফলে শিব সন্তুষ্ট হয়ে বর দিয়ে বললেন, এর পর আমাকে পূজো দেবার আগে লোকে তোমাকে পূজো করবে। আর তোমার নামেই আমার স্থিতি হবে এখানে। এখন থেকে সিদ্ধপীঠ নামে খ্যাত হবে এই বক্রেশ্বর। তারপর বিশ্বকর্মা অষ্টাবক্রের মন্দিরটি নির্মাণ করে দিলেন।'

সকালে ওরা দুজনে পূজো দিয়ে এসেছে। দেখে এসেছে একই মন্দিরে শিব এবং অষ্টাবক্রের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত। অষ্টাবক্রের মূর্তিটিই সেখানে বড়।

বললাম, 'বিশ্বকর্মার তৈরী যখন—তখন কয়েক হাজার বছর বয়স হল নিশ্চয়ই মন্দিরটির—তাই না!'

সবই গল্প কথা। ঐতিহাসিকরা বলেছেন, দুশ, আড়াই-শো বছরের বেশি বয়েস হবে না এ মন্দিরের।

"গৌড়দেশে মহৎ ক্ষেত্রং
বক্রেশ্বরং সুসঙ্গতং।
যন্নাম স্মরণে নাপি মুচ্যতে সর্বপাতকাৎ॥"

গৌড়দেশে অবস্থিত এই মহৎ তীর্থ। একদিকে এর পাপহরা নদী, অন্যদিকে জাহ্নবী-বেষ্টিত এই বক্রেশ্বরকে বক্ষে ধারণ করে, গৌড়দেশের সব পাপ ধুয়ে মুছে গেছে। মহাতীর্থ বক্রেশ্বর কিন্তু কোন পীঠস্থান নয়। এখানকার শ্মশানও বিখ্যাত; অতি-বিখ্যাত এখানকার পাপহরা গঙ্গা—কিন্তু কোন তন্ত্রশাস্ত্রে বীরভূমের বক্রেশ্বর পীঠস্থান বলে উল্লিখিত নয়।

যাক সে কথা; খ্যাতি বক্রেশ্বরের একদা ছিল। দেশ বিদেশ

থেকে সাধক ও তীর্থযাত্রীদের চিরকাল বক্রেশ্বর আকর্ষণ করে এনেছে; শৈবতীর্থ বক্রেশ্বর। তন্ত্রে উন্নতির দিনে বক্রেশ্বর-সাধকদের এক বিরাট আসন পেতে রেখেছিল শ্মশানের বুকে। কিন্তু আজ বক্রেশ্বরের খ্যাতি অন্য কারণে। আধুনিক কালে এখানকার উষ্ণকুণ্ডগুলিই যাত্রীদের কাছে প্রধান আকর্ষণ। বিশেষত শীতকালের দিনে পাপহরা গঙ্গার উষ্ণ জলধারা আগন্তুককে তৃপ্তি দেয়।

বক্রেশ্বরের খ্যাতি অনেক দিনের। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আজকের দিনের সরকারী বিজ্ঞাপন! বিজ্ঞাপিত বক্রেশ্বরের উন্নতির পরিকল্পনাও অনেক। এবং এর উন্নয়নের কাজ এর মধ্যে শুরু হয়ে গেছে। পিচের চমৎকার রাস্তা হয়েছে। নদীতে সেতু হয়েছে; সুন্দর ইনসপেকশান বাংলো হয়েছে। এখানে পরিকল্পনার মধ্যে আছে —লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করে দুটি স্নানের ঘাট, পাপহরা গঙ্গার জলের উষ্ণতা নিয়ন্ত্রনের জন্য 'লকগেট'—পাপহরা গঙ্গাকে আরও গভীর করা—এবং পর্যটনকারীদের সুবিধার জন্যে অন্যান্য আনুষঙ্গিক উন্নয়নের কাজ হবে বক্রেশ্বরে। এ সব কিছু হলে, থাকবার, স্বাস্থ্যো-দ্ধারের জন্যে বসবাস করবার সুযোগ সুবিধে করে দিলে, রাস্তা ঘাট আরও মনোরম, মন্দির সুন্দর করে সংস্কার করলে বক্রেশ্বর আরও আকর্ষণীয় হবে।

সারা বীরভূম অঞ্চলটাই স্বাস্থ্যকর।

বিকেল বেলা বেড়াতে বেড়াতে গিয়ে আর একবার স্নান করা গেল উষ্ণকুণ্ডে। রেবেকার অম্বলের ব্যামো। মেয়েটা লোকচক্ষের অন্তরালে গিয়ে কোন সময় পাণ্ডাকে দিয়ে সূর্য কুণ্ডের জল তুলিয়ে এক পেট খেয়েছে আর মেয়েটাকে খাইয়েছে। মাটির কলসী জোগাড় করে জল ভরে ঘরে নিয়েছে। উদ্দেশ্য, যে কদিন পারে সিউড়িতে বসে বসে গোপনে বক্রেশ্বরের জল পান করে নিজেকে ব্যাধিমুক্ত করবে। আহা! হায় শূলপানি-দেবী অম্বল-নাশিনী; তুমি বাংলার ললনাকে কোন পথে নিয়ে চলেছ! মেয়েটা সত্যিই দুর্ভাগা! এত বাবার থান

ধুলো মাটি, জলপোড়া, জড়িবুটি, কবচ, কুণ্ডল ইত্যাদি, মায় কলকাতার তাবড় তাবড় অম্বল স্পেশালিষ্ট, সবাই পরাভূত হয়ে গেল! এখন দেখা যাক, সূর্য, ভৈরব, অগ্নি, জীবিত কুণ্ডের জলে 'ককটেল' বানিয়ে দশভূজা অম্বল-বাহিনীকে সায়েস্তা করা যায় কিনা।

স্নান শেষ করে আবার সকলে দশভূজার অষ্টধাতুর মূর্তি প্রণাম করে সকলে ফিরে আসা গেল। কুমারের ছোট্ট ছোট্ট পা হয়েছে; ছোট্ট ছোট্ট পায়ে টলে টলে সে কেবলি পাপহরা গঙ্গায় ছোট ছোট নুড়ি ছুঁড়ছে। একটা ছুঁড়ে বলছে, 'আবা'। মানে, আবার নুড়ি এনে দাও, ছুঁড়বে। সেখান থেকে তাকে সরিয়ে নিয়ে যায় কার সাধ্য! ছেলেটা শেষ পর্যন্ত কাঁদতে কাঁদতে আত্মসমর্পন করল বাবার কাছে।

পাণ্ডা অনেক সুবিধে করে দিয়েছে আমাদের। সুবিধে পেয়েছে —ও আমাদের কাছে। তাকে অনুনয় অনুরোধ করে আরও কয়েকদিন থাকবার ব্যবস্থা করে দিতে চাইল।

ঠিক হল পরের দিন সকালে স্নানান্তে অষ্টাবক্র শিব ও দশভূজার পূজো দিয়ে আমরা যাবার পথে দুবরাজপুর হয়ে ফিরে যাব সিউড়ি।

বক্রেশ্বর এলে দুবরাজপুর যেতে হয়।

আমাদের দেশ জুড়ে পড়ে আছে খ্যাত অখ্যাত দেব-দেবীর স্থান। যেখানে বৈচিত্র্য আছে—যেখানে বৈশিষ্ট্য আছে—সেখানেই কে বা কারা দেব দেবীর প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। ফলে হয়েছে কি। দেব-মাহাত্ম্যে বিমুগ্ধ আমরা না পারছি দেবতাকে ভাল করে দেখতে—না পারছি কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিক চোখ দিয়ে সেই স্থানের বৈশিষ্ট্য বৈচিত্র্যকে বিশেষ ভাবে দর্শন করতে।

বক্রেশ্বরে তাই হয়েছে। দেবতা নিশ্চয় আছেন; শুধু বক্রেশ্বরে নয়—সর্বত্রই আছেন। কিন্তু ভূ-প্রকৃতির কোন বিশেষ কারণে যে বক্রেশ্বরের মত উষ্ণকুণ্ডের জল এমন খামখেয়ালীর মতন গরম হয়ে আছে যুগের পর যুগ তার বিশ্লেষণে আমাদের মন যায় না।

এই নিয়ে কথা কাটাকাটি হল বিশু ও অন্যান্যদের সঙ্গে। বিশু বলল, 'তুই যে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের কথা বলছিস—তা আমাদের দেশে খুব কম লোকেরই আছে। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি দিয়ে বিচার করবার জন্যে ধর বক্রেশ্বরেই তোর আমার মত কয়েকজন যদি আসে, তাহলে কোন কুণ্ডের কত টেম্পারেচার, কোন কেমিক্যাল জলে কত পরিমাণে আছে—তা জানা একবারেই হয়ে গেল। কিন্তু দেখ, সব কিছুর পেছনে যদি কিছুটা অলৌকিকত্ব, দেব-মাহাত্ম্য থাকে, তাহলে সাধারণ মনে তার টানও থাকে দীর্ঘদিন। পুরোনো জিনিস আরও পুরোনো হতে চায় না। আমার তো মনে হয় জ্ঞানের পরিধি মানুষের যত বাড়ে—সব কিছুর ওপর তার দরদ, ভালবাসা তত কমে যায়।' মানুষ কেবল মাত্র রুঢ় নির্মম হয়ে যাবে—এ বোধ হয় ভাল নয়।'

সত্যিই ভাল নয়। বিশুর কথাগুলো সমর্থন না করে উপায়ও নেই। আমাদের যতকিছু শিক্ষা, যত জ্ঞান সমস্ত নস্যাৎ করে দিয়ে, কোন কোন বিশেষ মুহূর্তে নিজের অজ্ঞাতসারেই দেবতার দিকেই ছুটি আমরা। দেবতার শরণ নিলে কি হয় তা হয়ত জানা নেই; কিন্তু ছুটে যাই।

অমিয় রুঢ় বাস্তবপন্থী লোক। সব শুনে বলল, 'ওই ভগবানের আকর্ষণই সেবার বক্রেশ্বরের শিব চতুর্দশীর মেলায় একটা সাধুকে কুণ্ডের জলে পুড়িয়ে মারল। ওসব ভারতবর্ষীয় চিন্তাধারা ছাড়।—একটা কিছুকে কেন্দ্র ক'রে খুব হৈ-হৈ হট্টগোল, হুলুস্থুল না করতে পারলে আমাদের দেশের লোকের তৃপ্তি হয় না।'

উত্তর আর দেওয়া হল না।

গাড়ি থেকে নেমেই একপাশে পাহাড়েশ্বর শিবের মন্দির। সে-সব ফেলে রেখে সকলে ছুটলাম দূরে মামা-ভাগ্নে পাহাড়ের দিকে।

চারদিকে বিরাট প্রান্তর জুড়ে প'ড়ে আছে অজস্র ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রুক্ষ, কঠিন, উষর পাথরের স্তূপ। বীরভূমের বিচিত্র প্রকৃতির এ যেন

আর এক বিচিত্র রূপ। ভূতত্ত্ব বলছে, পৃথিবী সৃষ্টির আদিকালে সমুদ্রবেষ্টিত পৃথিবীর ওপর জেগে ছিল যে মাটির স্তরটুকু, ওরা নাকি স্মৃতিবহন করছে তারই।

গাড়িতে এই মাইল আষ্টেক পথ পার হয়ে এলাম—সর্বত্র চির-পরিচিত সমতলভূমি, হঠাৎ কোথা থেকে শুধু এইটুকু জায়গা এমন প্রস্তরাকীর্ণ হয়ে গেল, এ এক আশ্চর্য ব্যাপার।

অনেকখানি রাস্তা পার হয়ে দুবরাজপুরের তথাকথিত মামা-ভাগ্নে পাহাড়; অন্যান্য মসৃণ পাথরের স্তূপগুলোর থেকে উচ্চতাও কিছু বেশি। সেখানে এগিয়ে দেখা গেল, ওপরে পাহাড়ের কোলে ইঁটে বাঁধানো খানিকটা জায়গা। ওপরে উঠবার সিঁড়িও আছে। সিঁড়ি বেয়ে সকলে ওপরে উঠলাম—অন্তত খানিকক্ষণ বিশ্রাম করা যাবে। কিন্তু হঠাৎ আবিষ্কার করা গেল, রেবেকা আসেনি। পাহাড়ের ওপর থেকে দাঁড়িয়ে সামনের সারা পথটা নজরে পড়ে। কৈ রেবেকা তো আসছে না। ভয় পাবার কিছু নেই। অমিয় সঙ্গে ওদের মেয়ে সিমকি আছে। সকলেই বুঝলাম, দেব-দ্বিজে মেয়েটার এত ভক্তি—নিশ্চয়ই পাহাড়েশ্বরের কাছে হত্যে দিচ্ছে। অতি সাবধানে মামা-ভাগ্নে পাহাড় ঘুরে ঘুরে দেখা গেল। একপাশে একটা তালগাছ। দুটো বৃহদাকার গোলাকার পাথর ক্ষয়ে ক্ষয়ে মসৃণ হতে হতে মামা-ভাগ্নে হয়ে দাঁড়িয়ে আছে আশ্চর্যভাবে। বছরে বছরে এত ঝড় এত ঝঞ্ঝা চলে যাচ্ছে এদের ওপর দিয়ে কিন্তু একটুও নড়েনি কোনদিন।

হঠাৎ দেখা গেল—অনেক দূরে রেবেকা গাড়ির কাছে দাঁড়িয়ে আছে। হাত নেড়ে বলছে, এতদূরে ও আসবেনা। আমাদেরও যাবার সময় হয়ে গেছে। পাহাড়ের ওপর থেকে বেশ অনেকখানি পরিধি নিয়ে দুবরাজপুরকে দেখা যায়। সাবধানে ফণি মনসার ঝোপের পাশ দিয়ে—পাথর পরিকীর্ণ সিঁড়ি ধরে নেমে এলাম সকলে।

এমনিতেই বক্রেশ্বর থেকে বেরুতে দেরী হয়েছিল। তারপর দুবরাজপুরের পাহাড় দেখতে দেখতে দুপুরের সূর্য মাথার ওপর উঠে

এসেছে। কথা আছে সিউড়ি ফিরে আজকের দুপুরের মত খাওয়া হবে হোটেলে। অতএব দেরী চলেনা।

একটা বটগাছকে ঘিরে একটা বেদী। রেবেকা সেখানে বসে নেই—বেচারী শুয়ে পড়েছে। কি হল? ওর একপাশে রাখা শালপাতায় মোড়া কিছু ফল দেখিয়ে রেবেকা বলল, 'ওগুলো ঠাকুরের প্রসাদ—খেয়ে নিন।'

'খেয়ে তো নোব; কিন্তু তোর হল কী?'

রেবেকা চোখ না খুলেই বলল ওর কিছু হয়নি। এবার যাওয়া যাবে। মাকে ওই অবস্থায় দেখে সিমকির চোখ দুটো ছলছল করছে। আর বাক্যব্যয় না করে তাড়াতাড়ি গাড়িতে উঠে বসা গেল। যা হয়,—স্বস্থানে ফিরে গিয়ে হোক।

চলন্ত গাড়ি থেকেই গলা বাড়িয়ে রেবেকা একবার বমি করল। সকলে ভয় পেয়ে গাড়ি দাঁড় করানো হল। রেবেকাও ভীষণ ভয় পেয়েছে। গোপনে উমার কাছে বলেছে অসুস্থতার কারণ। পাহাড়েশ্বরের প্রসাদ হিসেবে পুরোহিত ওকে খালি পেটে খুব সিদ্ধির সরবৎ খাইয়েছে। অঞ্জলি ভরে ভরে সিদ্ধি-সুধা পান করার সময় ও বোঝেনি এমন দুর্ভোগ আছে। তার ওপর পড়েছে পাহাড়েশ্বরের চিনির মোণ্ডা, আর দুবরাজপুরের নির্মল বাতাস। বমি করে বাঁচল মেয়েটা। মুখে চোখে জল দিতে খানিক যেন সুস্থ হল।

সকলে নির্ভয়ে হাসতে পারল।

পথ আর বেশি নয়। সিউড়ির বাড়িতে এসে পৌঁছে গেলাম আমরা। বাড়ির পাশেই 'অশোকা' হোটেল। অতএব নির্বিঘ্নে সমস্ত ঘটনাটার নিষ্পত্তি।

বক্রেশ্বরের মত দুবরাজপুরেও দেব-কাহিনী আছে। সেটা সিউড়িতে এসে শুনেছিলাম।

রামচন্দ্র রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে ভাবলেন,—রাবণ রাজার

দেশ সিংহলে পৌঁছতে গেলে সমুদ্রের ওপর সেতু নির্মাণ করা উচিত। অতএব পুষ্পক-রথে হিমালয়ে এসে রথ ভর্তি পাথর কুড়লেন। তারপর চললেন সমুদ্র বন্ধন করতে। কিন্তু কি হল—উত্তরের হিমালয় থেকে দক্ষিণে উপস্থিত হতে গিয়ে—এই তুবরাজপুরের আকাশে রথের ঘোড়া আকাশ পথে ভীষণ ভয় পেয়ে যেমনি লাফিয়ে উঠল—সব পাথর দমাদম ছিটকে পড়ল চারদিকে। এগুলো সেই সেতুবন্ধের পাথর।

দেখ, তাহলে গ্রানাইটের প্রাচীনতম পাথরগুলোর কি অবস্থা !

বক্রেশ্বর তুবরাজপুর ঘুরে সকলে মজাশে নাক ডাকিয়ে ঘুমিয়ে রাত কাটিয়ে দিল।

অগ্রাণের শীতের চমৎকার দিন।

কেউ আর ফিরে যাবার কথা বলে না।

নিখিলদার এই সিউড়ির বাড়িতে ফিরে আসতে আসতে এখনও মাস খানেক দেরী। অমিয়র অপিসে ছুটি নেওয়া আছে। অতএব সেও আপাততঃ ভাবনামুক্ত। আমি ভাবি আহা আরও কিছুদিন এরা থেকে গেলে তৃপ্তি পাই। বিশু-অমিয়র হোটেলে নির্ভেজাল দিনগুলো কেটে যায়।

ভাস্কর একদিন এসে বলল, 'আমাদের দাস সাহেব তো নান্নুরে ক্যাম্প ফেলেছেন। আমার একবার যাওয়ার দরকার। নানা কাজে হয়ে উঠছে না। তা আপনি একদিন গেলেন না ?'

সেনকে মনের কথাটা কানে কানে বললাম,—'একদিন যাব কী ? তলে তলে সব খবরই রাখি। নান্নুরে গিয়ে কিছুদিন কাটিয়ে ওদের সঙ্গে যাব মহিষডাল। সেই রকমই তো প্ল্যান।'

সেন শুনে হতভম্ব। 'বলেন কি ? আপনি সবই তো জানেন। তারপর ?

বললুম, 'তারপর আপনার দয়ায় বক্রেশ্বর তুবরাজপুর ম্যাসেন্‌জোড়

করলুম ; এবার তাকে ধরব জয়দেব কেঁদুলিতে পৌষ-সংক্রান্তির মেলা দেখাতে। এখানে নবনীদাসের আঁখড়াতে গিয়ে জয়দেব আমায় টেনেছে। সেটুকু হলেই ব্যস্। আর্কিওলজির সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছেদ।'

ভাস্কর সেন হো-হো করে হেসে উঠল।

রেবেকা ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে তাকে জিজ্ঞেস করল, 'তাপরে, আপনার অম্বলের খবর কী?'

ঠোঁট উল্টে রেবেকা বলল, 'এখানকার জলটা ভাল শুনেছিলুম। কিন্তু হলে হবে কী? অম্বল মাঝে মাঝে তো হচ্ছেই। আজই দেখুন না ক্ষিদে তেষ্টা যেন একবারে নেই।'

মিনিট দুইও হয়নি। খোলা দরজা দিয়ে দেখেছি, খাটের তলা থেকে রেবেকা পর পর দুটো কি যেন মুখে তুলে জল খেয়ে বেরিয়ে এল ঘরের বাইরে। জানি, এই সময় দুটো করে রাজভোগ ওর বরাদ্দ! আমি কোন কথা বললাম না।

ভাস্কর বলল, 'তাই তো! ভাবনার কথা।' খানিক চুপ করে থেকে বলল, 'বক্রেশ্বর যাবার পথে যে রাজনগর দেখালাম সেদিন, সেখানে বেশ খানিকটা ভেতরে আরও একটা ছোট-খাট কুণ্ড আছে—তার জলটা খেলে বোধহয় বৌদির ভাল হত।'

রেবেকা বিস্ময় বিমূঢ় হয়ে বলল, 'তাই নাকি? আমায় একটু জল এনে দিন না।'

সেনের সঙ্গে চোখে চোখে কথা হল আমার। রেবেকাকে বললুম, 'কি জানিস—সে অত্যন্ত নোংরা জায়গা। ওখানকার বাসিন্দারা জলটাকে এমন অবস্থা করেছে না—একবারে থিক্ থিক্ করছে পোকা। ওসব খাসনি।'

সেন বলল, 'তা বটে। আপনি বক্রেশ্বরের জলই খান। বড় ভাল জিনিস।'

আমার ওষুধটা কাজে লাগাল।

কোন উপায়ান্তর না দেখে রেবেকা আবার রান্নাঘরে ঢুকে গেল। এখন বোধহয় ওর গরম দুধ খাবার সময়।

অমিয়, বিশু, উমা ছেলে মেয়েদের নিয়ে বেড়াতে বেরিয়ে ছিল। ফিরে এসে ভাস্করকে উপস্থিত দেখে সানন্দে চেয়ার পেতে বসতে বসতে অমিয় বলল, 'আপনার কথাই এতক্ষণ হচ্ছিল ভাস্করবাবু। এবার আমরা ভাবছি আপনাকে প্রীতিভোজে আপ্যায়িত করবো একদিন। আপনার কবে সুবিধে হবে বলুন।'

সেন অবাক হয়ে বলল, 'সেকি, তার জন্য এত তাড়া কিসের?'

'তাড়া একটু আছে; সিউড়ির বাস এবার ওঠাতে হচ্ছে। হৈ-হৈ করে মাস দেড়েক তো প্রায় পার করে দিলুম। ছুটিও ফুরিয়ে আসছে; আপনাদের আবহাওয়ায় শরীরে যে পরিমাণ রক্ত জমেছে—তাতে কলকাতার রক্তচোষা আবহাওয়াতেও বছর খানেক বেশ কাটিয়ে দিতে পারবো।' অমিয় নিঃশ্বাস নেবার জন্যে এক মুহূর্ত থামল।

সেন বলল, 'বৌদি, তারপর (আমাকে দেখিয়ে) এর, যাবার কোন তাড়া আছে বলে তো মনে হচ্ছেনা।'

অমিয় বলল, 'আমার সহধর্মিনীর,—আমার যা ধর্ম তাই। আর ওর কথা বলছেন, ওকে এনেছিলুম প্রহরী হিসেবে। মায়া হয়েছিল অসুখ বিসুখ থেকে উঠেছে। একটু জল হাওয়া পাল্টাক। কিন্তু এখন দেখছি ঠিক উল্টো। ওকে যদি পাহারা দিতে হয়—তাহলে তো আমরা খতম্। অতএব ওর ভাবনা আর আমাদের নয়। গিয়ে ওর বাড়িতে বলে দোব—ও আমাদের সঙ্গ ত্যাগ করেছে। ব্যস মিটে গেল।'

সকলে সমস্বরে হেসে উঠল।

সেন বলল, 'অসুবিধে অবশ্য নেই। ওর প্ল্যান তো আগে থেকেই তৈরী। এখান থেকে যাবে নান্নুর। সেখান থেকে শান্তিনিকেতনের কাছে মহিষডাল। সেখান থেকে পৌষ-সংক্রান্তির দিন জয়দেবের

মেলা দেখে ফিরবে। তারপর মাঝপথে অবশ্য কিছু প্রোগ্রাম পাল্টাতেও পারে।'

অমিয় আবার শুরু করল, 'ওঃ। ভাগ্য করে এসেছে মশাই; পরের ঘাড়ের ওপর দিয়ে গোটা একটা বছর চালিয়ে দিল। মোহম্মদ ঘোরীর এ রাজত্বের কোন আচই গায়ে লাগল না।'

উমা স্বভাবতই কম কথা বলে। এবার বোধহয় না বলে পারল না। বলল, 'আর এক কাজ করুন না ভাস্করবাবু। জয়দেব থেকে যদি আপনার বাড়িতে দাদা এসে ওঠে,—তাহলে আরও এটা সেটা ঘুরিয়ে ওকে একবারে বক্রেশ্বরের শিবরাত্রির মেলা দেখিয়ে বাড়ি পাঠাতে পারেন। পৃথিবীর সব মেলাগুলো তো দেখা চাই।'

আমাকে ইঙ্গিত করে বিশু বলল, 'করো। এই গুড়ের নাগরিগুলি যখন কাঁধে উঠবে, তখন গুটি স্নুটি মেরে বসতে হবে একেবারে। ঘুরে নাও যত পার যদ্দিন ফাঁকা আছ।'

রেবেকা একটা অম্বলের ঢেকুর সামলে মুখ বিকৃত করে বলল, 'সত্যি বাবা। চলুন আমাদের সঙ্গে।'

এদিক ওদিকের কথার মাকুর মধ্যে আমি নীরবে বসে রইলাম। আমার ওপর দিয়ে কথাব কাঁথা বোনা হয়ে গেল।





চোদ্দ

এমনি করে একদিন সিউড়ির সুর ভেঙ্গে গেল। শেষ হয়ে গেল নিখিলদার বাড়ি জবর দখল করে থাকার প্রয়োজন, ক্ষ্যাপা বাউলের আখড়ায় রাধারানীর গান আর কুসুমবীচি দিয়ে মুড়ি মেখে খাওয়া। শেষ হয়ে গেল, বুধু বাবুর গ্যারেজে আড্ডা—আর পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে শীতের তুপুর কাটিয়ে ঘরে আসা।

অঘ্রাণ শেষ করে কয়েকদিন পরে ভাস্কর সেনের সঙ্গে বোলপুরের বাসে চেপে বসলাম। সঙ্গে সেই সামান্য জামা কাপড়ের বোঝা আর কম্বল বিছানা। বোলপুরে বাস পাল্টে যাব চণ্ডীদাস-নান্নুর।

পরের দিন অমিয়রা ফিরে যাবে বাড়ি।

কুড়ি পঁচিশ বছর আগেও বোলপুর থেকে নান্নুরের পথটুকু তুর্গম ছিল ; চণ্ডীদাস-নান্নুর তখনও ছিল তীর্থক্ষেত্র। বাবাজী বোষ্টম আ্রে

আসতই! শান্তিনিকেতনের কাছাকাছি হওয়ায় অনেক বিদগ্ধ জনও নান্নুরের পথে এগোবার চেষ্টা করতেন। এখন নান্নুরে যা দ্রষ্টব্য আছে—তখনও তাই ছিল। সেই এক সার মন্দির। অঙ্গনের একপাশে কবির বিশালাক্ষী দেবীর মন্দির। রজকিনীর কাপড় কাচার কাঠের পাটা সেই প্রস্তরীভূত একখানি কাঠ। চণ্ডীদাসের আমলের বলেই নাকি কাঠটি প্রস্তরে পরিণত হয়েছে। অতি সামান্য 'টেরাকোটা' কাজ করা সাধারণ ধাঁচের আটচালা মন্দির। এই হল শ-পাঁচেক বছর আগেকার চণ্ডীদাসের স্মৃতি চিহ্ন। আধুনিক কালে নির্মিত মন্দিরে যাবার সিংহদ্বার রচনা করা হয়েছে আচার্য নন্দলাল বসুর শিল্পরীতিতে।

আর আছে আদি অকৃত্রিম চণ্ডীদাসের স্মৃতিবিজড়িত স্তূপটি। প্রায় পনের ষোল ফুট উঁচু এই স্তূপটিতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মাঝে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কার্য করেছেন। সে খননে গুপ্তযুগের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন কয়েকটি স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া গেছে। এবার কেন্দ্রীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ আবার নান্নুরে খননের কাজ আরম্ভ করেছেন।

আরও কদিন কাটল আর্কিওলজির ক্যাম্পে। প্রাচীন যুদ্ধ-ক্ষেত্রের মত এক সার তাঁবু পড়েছে গোটা আঠারো। একপাশে এক দিক-চক্রবাল পর্যন্ত উন্মুক্ত ধানের ক্ষেত আর একপাশে এক বিরাট পুকুর। তার ওপারে সরকারী কতকগুলো কোয়ার্টার। বি. ডি. ওর অফিস, ভেটরিনারী হাসপাতাল,—ছোট ছোট কতকগুলো ব্যাচিলার্স কোয়ার্টার সারা গ্রামটি পরিভ্রমণ করে মনে হয়, যেন চণ্ডীদাসের স্তূপটিকে কেন্দ্র করেই উচ্চতা চারপাশেই ক্রমশ নেমে নেমে এসেছে।

দুর্ভাগ্যের কথা, প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সরকারী রিপোর্টে উল্লেখযোগ্য কিছু দেওয়া গেল না। বেশ খানিকটা খুঁড়ে বোঝা গেল সমস্ত আবাসিক স্তর-চিহ্ন লুপ্ত হয়ে গিয়ে চণ্ডীদাসের ঢিবি এক বেহিসেবী গর্তে পরিণত হয়ে রয়েছে।

আমরা পৌঁছবার আগেই এসব হয়েছে। সেন পরের দিন

আহারান্তে এখানকার কাজ শেষ করে সিউড়ি ফিরে গেল। দাস ক্যাম্প গোটাবার তোড় জোড়ে উদয়াস্ত পরিশ্রম করতে লাগল। কালিবাবু, ঘোষ এরা ফিল্ড ক্যামেরা চালিয়ে আর মাফ-জোফ, প্ল্যান ড্রইং করতে রয়ে যাবে এখানে। ওদের কাজ শেষ করতে করতে আরও কিছু দিন সময় লাগবে। তারপর এখান থেকে সব দলবল নিয়ে ফিরে আবার বসবে গিয়ে মহিষডালে।

ইতিমধ্যে একদিন দেশের বোষ্টিনাথের সঙ্গে দেখা। সেই আমাকে আবিষ্কার করল রাস্তায়। কাছে এসে বিস্ময়ে ফেটে পড়ে বলল, 'আপনি ?'

আমি ততোধিক অবাক হয়ে বললুম, 'তুই !'

বোদে ভেটরিনারি পাশ করে সরকারী চাকরীতে গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে জানতাম না। স্বভাবতই লাজুক লাজুক ছেলে। ওর দাদা আমার বন্ধু স্থানীয়। ডাক্তারী পড়তে গেছে ইংলণ্ডে। ফিরবার সময়ও তার হয়ে এসেছে। দাদার বন্ধু। অতএব সসম্মানে বোদে টানতে টানতে তার কোয়ার্টারে নিয়ে গেল। তার ঘরে খাওয়া দাওয়া শোয়ার ঘরোয়া ব্যবস্থা পেয়ে দিন দুই তার ঘরে কাটিয়ে দিলাম দু-নৌকোয় পা দিয়ে। দাসের মহিষডাল ফিরতে দিন তিনেক দেরি এখনও। তার মধ্যে বোষ্টিনাথ একদিন কীর্নাহার বেড়িয়ে আনল। কীর্নাহারে ও কিছু কাল আগে পশুচিকিৎসক হয়েছিল ; অতএব তার পূর্ব পরিচিতদের আদরে আপ্যায়নে সকাল থেকে সন্ধে কেটে গেল বেশ। এর পর আরও একদিন—শেষদিনে, বোষ্টিনাথের ঘরে সকালের আহার সেরে নির্বিঘ্নে সারা দুপুর তার বিছানায় ঘুমিয়ে বিকেলে দাসের সঙ্গে জীপ গাড়িতে উঠে বসলাম। ট্রেলারে পর্বত প্রমাণ বোঝা চাপল। কদিন আগে একটা বড় ক্যাম্প নিয়ে মহিষডালে কজন লোক নিয়ে জনক চলে গেছে ; ক্যাম্প খাটানো—আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা সবই করা হয়ে গেছে। অতএব সন্ধের অন্ধকারে সেখানে পৌছলে কোন অসুবিধে হবার কথা নয়।

ফেল্টের টুপি খুলে দাস একটা চুরুট ধরিয়ে বলল, 'বল এবারে। এতদিন তো এড়িয়ে এড়িয়ে চলছিলে পাড়ার লোক পেয়ে। এবারে আমাদের ক্যাম্প জীবনের পুরোপুরি চেহারাটা একবার বুঝবে চল। খাওয়া জুটবে না—এই শীতের দিনে ভাল শোয়ার ব্যবস্থা জুটবেনা। একবারে সাউথ-পোল এক্সিপিডিশনের মতন সব শুরু থেকে তৈরী করতে হবে ফাঁকা মাঠের ওপর।'

মুখে বললাম, 'খুব রোমান্টিক। ভালই তো।'

'চল বুঝবে।' দাস বাইরে মুখ ফিরিয়ে চুরুটের ধোঁয়া ছাড়ল।

শান্তিনিকেতনের পিচের রাস্তা পেরিয়ে ক্যানেল পার হতে ড্রাইভার জগ বলল, 'বাবু কম্ফাটারটা নাকে মুখে জড়িয়ে নিন। রাস্তায় ভীষণ ধুলো।'

সত্যি ভীষণ। তার চেয়ে ভীষণ জীপ গাড়ির সিটে বসে ওই তরঙ্গিত ধুলোর রাস্তায় পুরীর সমুদ্রের মত নাচতে নাচতে চলা।

এক সময় তালতোড় ফেলে আরও খানিক এগিয়ে কোপাই-এর হাঁটু জল পেরিয়ে সশব্দে জীপ গাড়ি নিঃস্তব্ধ সন্ধ্যার সাঁওতাল বস্তিতে এসে উঠল।

নান্নুরের পর এই মহিষডাল। অন্ধকারে কিছু দেখা না গেলেও দাস রেল ব্রিজের দিকে হাত তুলে বলল, 'ওখানেই আমাদের সাইট।' তারপর খানিকটা উত্তেজিত হয়েই বলল, 'নান্নুরে কিছু হল না; কিন্তু এ-মাউণ্ডে কিছু একটা পতেই হবে। বুঝলে।'

এদিকে রাত কাটাবার মত একটা ক্যাম্প খাড়া করা হয়েছে; তাতে রাত কাটাবার সুবন্দোবস্ত হয়ে আছে। এধার ওধার ঘুরে ঘুরে দেখলাম, চারদিকে শীতের রাত জনমানব শূন্য। মাঝে মাঝে সাঁওতাল মেয়ে-পুরুষ এই অন্ধকারের মধ্যে দিয়েই গ্রামের ঘরে ফিরে আসছে।

সেদিনের মত কোন কাজ নেই আর।

জীপে আসবার পথেই দুজনের রাতের খাবার আজকের মত

আনা হয়ে গেছে। অতএব খাওয়া দাওয়া করে নিশ্চিন্তে গল্প করতে করতে এক সময় পেট্রম্যাক্সের আলো কমিয়ে ঘুমিয়ে পড়া গেল।

কোপাই-তীরে ভোরের আলোয় এসে দাঁড়ালাম। ভাল লাগছে। রাতে কিছুই বুঝতে পারিনি। কিন্তু এখন চারপাশে নীরব প্রশান্তির মধ্যে প্রাকৃতিক মহিষডাঙ্গের চেহারাটি অপূর্ব মনে হল।

দাস তার কাজে ডুবে রইল সারাদিন। আর আমি নির্বাসিত একটা মানুষের মত কখনও কোপাই-এর বালিতে ঘর করি কখনও নদীর এক হাঁটু তরঙ্গের মধ্যে মাছ যাওয়া আসা করে দেখি। আর জগন্নাথ ড্রাইভারের জীপ গাড়ি অনেক দূর থেকে গর্জন করতে করতে যখন ধুলোর মধ্যে থেকে এগিয়ে আসে ক্রমশ তখন তার আগমনের পথের দিকে এগিয়ে আসি খানিক। দুপুরের ট্রিপ হলে জগন্নাথ নান্নুর থেকে টিফিন কেরিয়ারে ভাত আনে। সন্ধের হলে রাতের আহার। তারপর খালি জীপ আবার মেটে রাস্তায় লাফাতে লাফাতে চলে যায়।

এমনি করে নটা দিন, রাত, সকাল, দুপুর, বিকেল, কাটাতে যেন আঠারোটা দিন লেগে গেল ; এর মধ্যে নতুন কিছু লোকও নান্নুর থেকে এলো সাইটে। ক্যাম্পও বসল। জনক নতুন উনুন পেতে দুধ-চিনি-হীন চা ফোটাতে আরম্ভ করল।

বলতুম, 'আচ্ছা দাস তোমার কি একটু মায়া দয়া নেই ? আমায় কোথায় আটকালে বলত ? শান্তিনিকেতনে বন্ধু-বান্ধবদের কাছে দুদিন কাটিয়ে আসব তারও উপায় নেই—চক্ষু লজ্জা। এই নির্বান্ধব পুরিতে তোমাকে একলা ফেলে যেতে ইচ্ছে করে না।'

দাস মুখ শুকিয়ে বলত, 'সত্যি তোমাকে বড় কষ্ট দিচ্ছি। তবে তুমি তো সর্ব-কষ্ট জয় করে বসে আছ। কদিন সবুর কর। পৌষ শেষ হয়ে আসছে ; তোমার জয়দেব যাবার ব্যবস্থা করে না দিলে, কি আমার ছুটি দেবে তুমি ?'

এমনি দেখতে দেখতে আবার নতুন করে লোক-লস্কর কাজে কর্মে

ক্যাম্প বোঝাই হয়ে গেল। ক্যাম্পের খাটিয়াগুলোর ওপর খড় বিছিয়ে দিব্যি আরামের বিছানা পেতেছি। খাওয়া-দাওয়া ঠিক মত পুরোদমে চলেছে। আবার নতুন উৎসাহ নিয়ে নান্নুর ক্যাম্পের লোক কাজ আরম্ভ করে দিয়েছে এখানে। কদিন আগে থেকেই সাঁওতালরা কি একটা নতুন উৎসবে মেতেছে ; অতএব স্বাইটে কাজ কর্ম সব বন্ধ। উপায় নেই ; সংক্রান্তি না গেলে কেউ কোদাল তুলবে না। ওরা সেই সংক্রান্তির দিনটির জন্যে আকুল হয়ে বসে আছে। আর আমি বসে আছি জয়দেব কেঁদুলির সংক্রান্তির মেলার পথ চেয়ে।

পুজোর সময় আত্মীয় বন্ধু পরিবেষ্টিত কটা দিন সিউড়িতে কাটিয়ে ছিলাম আনন্দে। সেন ট্যাক্সি করে ওদিকে ময়ূরাক্ষী, দুবরাজপুর, বক্রেশ্বর ঘুরিয়ে এনেছিল। তখনও জয়দেবের ওপর এত আকর্ষণ অনুভব করিনি। সিউড়িতে থাকতেই নবনীদাসের বাড়িতে আড্ডা গাড়তুম। বাউল গান শুনতুম যখন, তখনই কেঁদুলির মেলা সম্বন্ধে কেমন একটা আবছা ধারণা এসেছিল মনে। জয়দেব না দেখে কলকাতা ফেরা যেন অর্থহীন মনে হয়েছিল।

দাস একদিন সত্যিই কথা রাখল। এই শীতের পৌষ সংক্রান্তির সকালে রাত থাকতে ঘুম থেকে তুলে বললে, 'নিন রেডি হয়ে নিন। জগ রেডি আছে।'

যাবার সময় ও গাড়িতে গিয়ে শান্তিনিকেতনে নেবে যাবে। যেহেতু এবারের মত আমি মহিষডাল ক্যাম্প ছাড়ছি, ও শান্তিনিকেতনে বন্ধুর বাড়ি থেকে নিজের বউ ছেলেদের নিয়ে এসে আমার পরিত্যক্ত ক্যাম্পে নতুন করে সংসার পাতবে আর তদারকি করবে সাইটের। এখানে কাজ শেষ করতে করতে আরও দুতিন মাস কেটে যাবে। অতএব এই অজানা অচেনা অখ্যাত মহিষডালে ওই কোপাই নদী, রেলের ব্রিজের ওপর দিয়ে লুপ লাইনের গোটা কতক ট্রেন,—ওই সাঁওতালের দল আর ক্যাম্পের কতকগুলো লোকের সঙ্গে কাটিয়ে যাবে দিনের পর দিন।

ওই মহিষডাল থেকেই একদিন কংকালিতলা ঘুরে এসেছিলুম বেড়াতে বেড়াতে। বিষ্ণুচক্রে খণ্ডিত সতীর 'কাঁকাল' নাকি পড়েছিল এখানে। তাইতেই এই জাগ্রত পীঠস্থান কংকালিতলা। ছোট্ট একটি মন্দির দেবীর। তার মধ্যে কংকালি দেবীর পটমূর্তি। অদূরে কোপাই নদীর তীরে শ্মশান। বক্রেশ্বরের মত এখানেও দেবতার আকর্ষণে দূর গ্রাম শহর থেকে মৃতদেহ সংকারের জন্যে আনা হয়। লোকে বলে ও শ্মশানে চিতা নেবে না। যদিও ছোট শ্মশান তবুও নাকি ঝড়, জল, বজ্রপাত উপেক্ষা করে এখানে মৃতদেহ আনে শ্মশান-বন্ধুরা।

পাশে একটি ছোট পুষ্করিণী। কোনকালে তার জল শুকোয় না। অথচ গভীরতাও বেশি নয়। চৈত্র সংক্রান্তির দিন পুকুরের পঙ্কোদ্ধার করা হয়। মেলা বসে সেই দিন। দিক-বিদিক হতে সেদিন মেলা দর্শনার্থী আসে ; স্থানীয় লোকরা বললে, একশ আট ছাগ বলিতে এই মন্দিরের অঙ্গনটিতে রক্তের স্রোত বহে যায়। সে এক বীভৎস দৃশ্য।

হয়ত একদিন আসব কংকালিতলা চৈত্র সংক্রান্তিতে। হয়ত দেখে যাব পুকুরের মধ্যে দেবীর সেই অলৌকিক, অক্ষয় 'কাঁকালের' অবশেষটুকু।





পনের

এখন চললাম জয়দেবের মেলায়।

দাস শান্তিনিকেতনে নেমে গেল। জীপ ছেড়ে বোলপুর স্টেশনে বাসে উঠে বসলাম।

কেমন একটা অদ্ভুত রোমাঞ্চ লেগেছিল সেদিন। ওই পোষ শেষের ভোরের চলন্ত বাসে শনশনে কনকনে হাওয়া। ওই মেলার যাত্রী ভরা বাস। আর ওই সিউড়ির নবনীদাসের ঘর থেকে কুড়িয়ে আনা সামান্যতম কতকগুলো বাউল গানের কলি। আর যতটুকু শুনেছি, অজয়ের তীরে দ্বাদশ শতাব্দীর এক কবির ঘরের দ্বারে এক অপরূপ সাধনার সার্থকতার কথা।…

বাসে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল। শান্তিনিকেতনে শিক্ষকতা করেন চলেছেন জয়দেবে। তিনিও কোনদিন জয়দেবে রাত কাটান নি। তারই মতন এক সহযাত্রী পেয়ে সুনীলবাবু মন খুলে বললেন, 'রাত কাটাবার জায়গা টায়গা কিছু ঠিক করা আছে নাকি?'

বাসস্থান যে ঠিক করা যায় আমি তা জানিই না। সুনীলবাবু বললেন, 'ঠিক আছে। চলুন। একটা তো রাত। ফাঁকা আকাশের তলে পোষ সংক্রান্তি কাটিয়ে নিমোনিয়া যদি একান্তই হয় বাড়িতে এসে হবে।'

দু'জনে হেসে উঠলাম। নানান গল্প করতে করতে এক সময় জয়দেব-কেঁদুলির বাস হড়বড় ক'রে ধান কাটা ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে ধুলোর সাগরে নেমে এসে যাত্রা খতম করল। দুজনে লোটা কম্বল বগলে মেলার মধ্যে দিয়ে এসে জুটলুম একবারে অজয়ের তীরে। কেঁদুলিতে তখন ভোরের আলো ফুটছে।

ডানহাতে জেলা বর্ধমানের মাটি বাঁ হাতে বীরভূম।

মধ্যে দিয়ে অনেক কাল ধরে বয়ে চলেছে অজয়—কাটোয়ায় ভাগীরথীর সঙ্গে মিলবে বলে। বর্ষায় এর ঘন গেরুয়া জল দুকূল ছাপিয়ে ছোটে, আর শীতের টানের দিনে সেই বিরাট খাঁখাঁ করা চরের বালির ওপর সাদা রেখায় ঝিরঝিরিয়ে চলে জলের ধারা। তখন 'পার হোয়ে যায় গরু পার হয় গাড়ি।' পৌষ-সংক্রান্তির দিন অজয়ের কদম্বখণ্ডীর ঘাটে যাত্রী আসে ওপারের ভিন গাঁ থেকে। বৈষ্ণবী অজয়ের চরের বালি সরিয়ে মকবের স্নান সারে ; ঘাটের মাটি কপালে ঠেকিয়ে রোদ-পিঠে বসে নাকে রসকলি আঁকতে আঁকতে গুন্‌গুন করে গান করে নবদ্বীপধামের গোপালের মা—

'চন্দনচর্চিতনীলকলেবরপীতবসনবনমালী।
কেলি চলন্মণি কুণ্ডলমণ্ডিতগণ্ডযুগস্মিতশালী ॥'

—কবি জয়দেবের গীত গোবিন্দের গান।···

কেঁদুলীর মাটি বৈষ্ণবদের মহাতীর্থ। লোকে সুন্দর সুন্দর গল্প বলে। বলে, ভক্তকবি জয়দেব এই কেঁদুলিতে বাস করার সময় ভোরবেলা স্নান করতে যেতেন কাটোয়ার গঙ্গায়। যেতে আসতে অনেকখানি পথ। ফিরে এসে তাঁর আরাধ্য রাধামাধবের পূজা করতেন। তারপর নিয়ে বসতেন গীতগোবিন্দ।

দিনের পর দিন যায়। একদিন স্বপ্নে মকরবাহিনী গঙ্গা তাঁকে দেখা দিয়ে বললেন, 'বাছা আমার জন্যে তোর কষ্ট। অতদূর কাটোয়ায় না গিয়ে তুই এবার থেকে অজয়েই চান করিস। তোর

গঙ্গাস্নানের পুণ্য হবে। আর পৌষসংক্রান্তির দিন ব্রাহ্মমুহূর্তে আমি উজানী বইবো অজয়ে। দেখবি একটি ফুল ভেসে আসছে। বুঝবি, আমি এসেছি।'

সেদিন থেকে কবি অজয়ে স্নান করে নিত্যকর্মে বসেন। নানা দেশের নানা জাতের মানুষ সেদিন থেকে সব কষ্ট স্বীকার করে মকরের স্নানে আসে জয়দেব-কেঁদুলীতে।

ছোট নগণ্য গ্রাম কেঁদুলী।

কয়েকঘর ব্রাহ্মণ, অগ্রদানী, সদগোপ, কামার, নাপিত আর বাউরীর বাস। বোলপুর ছাড়িয়ে পাকা রাস্তায় বাস যায় ইলামবাজার। সেখানে বাঁক নিয়ে শাল জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে খানিক এগিয়ে পাকা রাস্তা ছেড়ে নেমে পড়ে ধুলোর সমুদ্রে। বাসওয়ালা দূরে একটা বটগাছ দেখিয়ে বলে, 'ও—ই জয়দেব।'

সারা বছর লোকে বড় একটা আসেনা এদিকে। এই সংক্রান্তির কদিন আগে থেকে নানান যাত্রীর পায়ের তলায় জয়দেবের মাটি ঢাকা পড়ে যায়। বিরাট বটের তলায় ধুলোর উপর আখড়া সাজিয়ে বসে বাউল; জাত ধর্ম ভুলে যেখানে সেখানে যাত্রীরা পাতা পেতে বসে যায় অন্নসত্রে। মেলার যাত্রীদের নিয়ে সারাটা গ্রাম তখন জেগে কাটায় কটা দিন আর রাত। বর্ধমান বাজারের লোহার ব্যাপারী জগন্নাথ যশ থেকে ম্যাজিক-লণ্ঠন, মরণকুয়ো সবাই এসে মেলা জাঁকিয়ে বসে। আর আসে চন্দননগরের চাঁপাকলার কাঁদি। হাজার হাজার কাঁদির ছোটখাট পর্বত তেরপলে মুড়ে মোটা করে মাটির পলেস্তারা দিয়ে কলা সংরক্ষণ হয়। সব চেয়ে অবাক করে দেয় এখানকার অন্নসত্র। কোথা থেকে চাল ডাল আসে—কোথা থেকেই বা যাত্রী আসে এত। সারাবন্দী মাটির উনুনে মেটে হাঁড়ির পর হাঁড়ি চড়েই থাকে সারাক্ষণ। রান্নারও বিরাম নেই—খাওয়ারও নয়। যাত্রী আসারও যেন শেষ নেই মেলার কদিন।

কিন্তু বার বার একই প্রশ্ন মাথায় আসে। কেন? এই গরীব

বাংলার সাধারণ মানুষগুলো জয়দেবকে চিনে রেখেছে কি করে এতদিন ধরে? দ্বাদশ শতকের কবি কেমন করে এদের মধ্যে আজও বেঁচে? বাড়ি বাড়ি চাঁদা আদায়ের নামে গৃহস্থকে উদ্বাস্তু করে প্লাকার্ড পোস্টারের প্রচুর পাব্লিসিটি দিয়ে মাইক জর্জরিত সাংস্কৃতিক বৈঠকের দ্বারোদ্ঘাটন করেনি তো এরা কোনদিন। অথচ অতি শান্ত, অতি সহজ নিরালা এক কোণে অচেনা এক প্রান্তরের ধূলিশয্যার উপরে এরা চঞ্চল হয়ে ছুটে এসেছে সীমন্তে মেটে সিঁন্দুরপরা এই ঘরণী বধুটি—কাঁধে ঝোলাঝুলি আনন্দ লহরী হাতে অতিবৃদ্ধ ঠাকুরদাস বাবাজীরা। কে বলেছে এদের—

'একদিন যদি খেলা থেমে যায়
মধুরাতে
একদিন যদি বাধা পড়ে কাজে
শারদপ্রাতে
তবু মনে রেখো—'

কেউ বলেনি। তবু মনে আছে। দেশের মাটির সঙ্গে মিশে গেছেন কবি জয়দেব। ধর্মকেন্দ্রিক গরীব মানুষের মনের মধ্যে, ধমনীতে রক্তের মধ্যে মিশে গেছেন কবি। বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাচার্যদের কাছে হতে পারেন কিন্তু সাধারণ মানুষের কাছে তিনি তো মধুর-কোমল-কান্ত-পদাবলীর স্রষ্টা নন, তিনি যে রাধা-মাধবের সঙ্গে একাত্ম। লৌকিক উপাখ্যান, শৈশবের ঘুমপাড়ানী গানের মধ্যে দিয়ে মানুষের সঙ্গে যোগ তার নিবিড়; অতএব পৌষলক্ষ্মীর অঙ্গনে নবান্নের গন্ধ-ছড়ানো দিনে জয়দেবের কথা তাদের মনে পড়বেই; ডাক দেবেই দেবে কেঁদুলীর মেলা।

কোনদিকে কিছু নেই, যা দ্বাদশ শতকের কবির সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগে যুক্ত করতে পারে আজ। আছে অজয়ের তীরে সিদ্ধাসন মন্দির। কূলেশ্বর শিবলিঙ্গ আর অষ্টদল পদ্মাঙ্কিত মন্দিরটি। জয়দেবের আরাধ্য রাধামাধবের বিগ্রহ আছেন—কবি অজয়ের ঘাট থেকে কুড়িয়ে

পেয়েছিলেন এই মূর্তি। কিন্তু কবির সমকালীন মন্দির আজ আর নেই। মূর্তিটিও জয়দেব বৃন্দাবন যাওয়ার সময় সঙ্গে নিয়ে গেছেন। শূন্য মন্দিরে শ্যামরূপার গড়ের রাধাবিনোদকে এনে বর্ধমানের মহারাজা এখানে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। আজ যে মন্দিরটি তার সামান্যতম টেরাকোটা শিল্প নিয়ে তৃপ্তি দেয় সেটি বর্ধমানের মহারাণী নির্মাণ করেছিলেন ১৬২৪ শকাব্দে।

থাকার মধ্যে আছে এক মহাবৃক্ষ প্রাচীনত্বের জটা চারপাশে ছড়িয়ে ; আর আছে 'বহতা নির্মল ধারা' অজয়। বট গাছটি ঘিরেই বাউল, দীন, দরবেশ, বৈষ্ণবের ধূলার সংসারে জমে উঠেছে গানের আসর। রাত যত বাড়ছে প্রচণ্ড শীত কন্‌কনিয়ে দিচ্ছে যত, গাঁজার কল্‌কে ভোস্ ভোস্ টানে ততই মুখ ফিরতি হচ্ছে। ধুনি জ্বলছে। তার পাশেই ক্ষেপা উদাত্ত গলায় গান ধরেছে 'ভাল করে পড়গা ইস্কুলে, নইলে কষ্ট পাবি শ্যাষকালে—।' তার সঙ্গে নাচ, আর নাচের সঙ্গে আনন্দ-লহরীর টান টান তাঁতে আঘাতের পর আঘাত।

এরই সঙ্গে জয়দেবের হাটে এই সংক্রান্তিতে দিগ্বিদিক থেকে লোক এসে জড়ো হয়। জড়ো হয় খেলনা পুতুল আর একপয়সার তাল পাতার এক বাঁশিওয়ালা থেকে বোম্বাই চলচ্চিত্রের সুগম সংগীত পর্যন্ত। ওপরে কোঁচার-পত্তন আর ভেতরে ছুঁচোর-কেত্তন আমাদের মত হাফ্-বাবু জোটেন। জোটে গরুর গাড়ির পর গাড়িতে বাল-বৃদ্ধ নরনারী। এরা সব হঠাৎ আসে আবার হঠাৎ চলে যায়। দিন কয় পরে কয়েক কোটি শালপাতা, শ'কয়েক উনুন, ধুলো-মাখা কিছু ভাঙ্গা মাটির হাঁড়ি কুড়ি সেই জনহীন সাগরের মধ্যে ফেলে নির্বাসিত যাযাবর যাত্রীর দল কোথায় চলে যায়। মাইকের গান, মরণকুয়োর প্রদর্শক, 'শীতের বন্ধু গরম চা', বর্ধমান সিউড়ি বাজারের তুলোট কম্বলের ব্যাপারিরা পাত্তাড়ি গুটিয়ে চলে অন্য মেলার সন্ধানে।

সেদিন সারাক্ষণ কলুর চোখবাঁধা বলদের মতন ঘুরে ক্লান্ত

সন্ধেবেলায় শেষ পর্যন্ত বসে পড়েছিলাম এক বৈষ্ণবীর শতরঞ্চ বিছানার পাশে। শীতের রাত। আশ্রয়ের খোঁজে তখন দিশেহারা।

হঠাৎ তারস্বরে বৈষ্ণবী খেঁকিয়ে উঠল। অন্ধকার। কেরাসিনের কুপির আবছা আলো। হয়ত অন্ধকারে বৈষ্ণবীর হাত পা মাড়িয়ে দিয়েছে।, খুব লজ্জিত হয়ে জড়োসড়ো দাঁড়িয়ে আছি একপাশে বৈষ্ণবী এবার সখেদে ঘোষণা করল ওখানে তার পানের সরঞ্জামাদি ছিল। আমাদের কি কোন দিষ্টি নেই। আর কি কোথাও জায়গা পেলাম না? ইত্যাদি

হায় জয়দেব গোঁসাই। সারা পৃথিবী যখন ঠাঁই ঠাঁই করে পাশের লোককে গলাধাক্কা দিচ্ছে তখনও তুমি নবদ্বীপের গোপালের মা, পান টুকটুকে ঠোঁটেও এ কথাটি বলে গেলে।

গোপালের মা তখনও বলছে, 'যাও না বাবা, মনোহর ক্ষেপার ওখেনে।' রইল তোমার মনোহর বাবা। আমি চেপে বসলুম। বিচিত্র পানের আসবাবপত্র গামছার কোণায় সরিয়ে নিয়ে এই গোপালের মা-ই পান সহযোগে আতিথ্য দান করেছিল আমাদের।

তারপর গান আর গান। অবিশ্রাম কেবল গান। ঠাকুরদাস বাবাজী লালনের সেই বিখ্যাত গানটা করেছিল—'আমি একদিনও না দেখিলাম তারে—আমার ঘরের কাছে আরশি নগর, সেথায় এক পড়শি বসত করে।'

শেষ হতে না হতেই একটা তের চোদ্দ বছরের ছেলে উঠল। কোন রকম ভণিতা না করেই তীক্ষ্ণ গলায়—'ওরে মন' বলে টান দিয়ে ঘুরে গেল একপাক। তারপর বলল—

'একাদশী করলে যদি
ডুব দিয়ে জল খেয়ো না—
(অমন) ভাবের ঘরে চুরি কর না।

আমাদের মতন তুটো জোয়ান সেখানে তখন বসে। শুনে একেবারে যেন কুঁচকে গেল। কি সাংঘাতিক কথা রে বাবা!

গান শুনতে শুনতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম কে জানে? সুনীলবাবুর ঠ্যালা খেয়ে এক সময় জেগে উঠলাম। কানের কাছে মুখ এনে ভদ্রলোক বললেন, 'পেছন দিকে দেখুন।' দেখলাম, ঠিক পেছনেই এক যুবক বাউল। ধুনির স্বল্প আলোয় ছেলেটাকে সুন্দর লাগছে। গায়ের রং কালো নয়। দাড়ি গোঁফে বেশ সুন্দর মানিয়েছে। তার অদূরেই একটি মেয়ে। গভীর কালো গায়ের রং। আর ওই সামান্য আলোতেও বোঝা যাচ্ছে যৌবন মেয়েটার অনেক দিন আগেই পেরিয়েছে। আপাদমস্তক কম্বলে ঢেকে বেশ নিবিড় ভাবে বসে নিজের ভ্রূ ধনুতে টংকার দিয়ে দিয়ে কথা বলছে। ছেলেটার চোখে আকূল আকুতি।

কান পেতে শুনে বোঝা যাচ্ছে, ছেলেটাকে ছেড়ে সঙ্গিনী মেয়েটা কোথাও অন্যত্র সরে যেতে চাইছে। ছেলেটা উপর্যুপরি অনুরোধ করেছে তবুও মেয়েটার দিক থেকে কোন পরিবর্তনের যেন কারণ নেই। ছেলেটা অনেক বোঝাবার চেষ্টা করেছে নিম্নস্বরে—মেয়েটা ঘটনাকে একটা সংগ্রামের পর্যায়ে এনে ফেলেছে ততক্ষণে।

কিন্তু এতবড় মারাত্মক ঘটনাতেও সকলে নির্বিকার। এমনিই বুঝি এদের ধর্ম! কারণ বেশবাস ঠিক করে ছেলের হাত থেকে মন্দিরা নিয়ে বসে বসেই গান গেয়ে যাচ্ছে গোপালের মা—

'ও মন ঘুমিয়ে রইলি ঘণ্টা হল
টিকিট ন ই নিলি।
যখন পড়বে পাখা হবি ভ্যাকা
মন রে বোকা তোরে বলি॥'

গোপালের মা সব মানুষের কথা বলছে দেহতত্ত্বের গানে। বলছে—

'গাড়ীর গার্ড ওই গোলকপতি
নামটি দয়াময়।
চরণ ইঞ্জিন চালিয়ে বেড়ান
জীবকে সমুদয়।'

এরপর উঠতে হল। ভোর হোয়ে আসছে। ওপারে বর্ধমানের আকাশে ঘন কুয়াশা। এদিকে তালগাছের মাথায় হলুদ রোদ্দুর কুয়াশার নাইলনখানা ছড়িয়ে জবু থবু। উঠে এলাম অজয়ের ঘাটে। শরীর যেন আর চলছে না সারা রাতের ঠাণ্ডাতে ভিজে।

কেঁদুলির বাসে বসে রইলাম অবসন্নের মত। বাস কখন ছাড়বে জানিনা। মনে মনে তারই মধ্যে বার বার মনে হচ্ছে বিশ্বনাথ বাউলের গানের কলি কটা।

'হাতের কাছে হয় না খবব
কি দেখতে চাও দিল্লী লাহোর
সিরাজ সাঁই কয় লালন রে তোর,
সদাই মনের ভ্রম যায় না।'

ওই যে, 'নড়ে চড়ে হাতের কাছে খুঁজলে জনম-ভোর মেলেনা— সেটিকে পেতে হলে এবার নিশ্চিন্তে ঘরের অবসর একান্ত প্রয়োজন।

বাসে বসে সুনীলবাবু বললেন, 'তন্ত্র টন্ত্র কিছু বুঝলেন।'

আগের দিন সন্ধেবেলা বাউলের মেলায় অতর্কিতে এক তান্ত্রিক দলের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল জয়দেবে। ওরা কোথা থেকে যেন জন চার পাঁচ গরুর গাড়ি করে এসেছেন। জয়দেব সেরে যাবেন তারাপীঠ। তান্ত্রিক বাবার মুণ্ডিত মস্তক। বেশ লম্বা চওড়া চেহারা। সঙ্গে দু'তিনজন পুরুষ সাঙ্গ পাঙ্গ, আব একটি মহিলা। নানা ধরনেব শারীরিক ক্লেশ স্বীকার করে শরীর তার এতই জীর্ণ—বয়স কত আন্দাজ করা কঠিন! একটা গাছের তলে খানিক পরিষ্কার করে একখানা শতরঞ্চ বিছিয়ে মাথায় একটা চটের চাঁদোয়া খাটিয়ে ভদ্রলোকেরা কি কারণে জানিনা—গ্রামে বেড়াতে গেলেন। রইলেন, তান্ত্রিকদলেব এক সমবয়সী ভদ্রলোক আর ওই মেয়েটি। ভদ্রলোক বেশ আপ্যায়ন করে বসালেন দু'জনকে। একে তন্ত্রজীবন সম্পর্কে খানিকটা কৌতূহল ছিলই। তার ওপর একথা সেকথার পর ছেলে মেয়ে দুটি সেই তন্ত্রজীবনের কথাই আরম্ভ করলেন। সিদ্ধপুরুষ বাবার

গঙ্গার ঘাটে অমাবস্যার রাতে স্রোতে ভেসে আসা গলিত শবের মাথার ঘিলু খাওয়া,—শ্মশানে শবাশনে রাতের পর রাত তন্ত্রসাধনা করার এমন সব লোমহর্ষক বীভৎস কাহিনী আরম্ভ করলেন—এক সময় তাদের পরিবেশ এড়াতে একরকম অছিলা করেই বেরিয়ে এসে দুজনে দম ফেলে বাঁচি।

সুনীলবাবুকে বললাম, 'ভাই, আমার কথা শুনে মনে করবেন না আমি ওদের উপহাস করছি। কিন্তু ওই তন্ত্রের আবহাওয়া বৈষ্ণবের এই মিষ্টি সাধন-সঙ্গটুকুকে যেন নোংরা করে দিয়ে গেল। মনের মধ্যে থেকে যেন ভাললাগার, প্রেমের আনন্দের মূল ভাবটি নষ্ট করে দিয়ে গেল। বাউল গানগুলোর মানে বুঝতেই মাথা গুলিয়ে গেল। সত্য জিনিসটা যেন বিশ্রী রূঢ়ভাবে বড় বেশি জীবনসচেতন করে দিল আজ।

'তাহলে মেলা ভাল লাগেনি বলছেন?' সুনীলবাবু হাসতে হাসতে বললেন।

বললুম, 'মেলা ভাল লাগল। গানও ভাল লাগল। কিন্তু ওই গানের কথাগুলো? এমন সত্যি কথা শুনতে যেন ভাল লাগল না —সে কেবল ওই তান্ত্রিকদের জন্যে।'

সুনীলবাবু তেমনি হাসতে হাসতেই বললেন, 'আমারও তাই!' খানিক থেমে বললেন, 'চলুন আজকের রাতটা আমার ওখানে বিশ্রাম করে সকালের গাড়িতে ফিরবেন।'

একেবারে মনের ওপর থেকে যেন উত্তর এলো হঠাৎ। নিশ্চেষ্ট ভাবে বললুম, 'চলুন।'





ষোল

একদিকে বৈষ্ণব একদিকে শাক্তের দল।

দীনবন্ধু বাউলের সেই গান,—'এলো এক রসিক পাগল বাঁধাল গোল ভবের মাঝে—এককাণে; আর এককাণে তান্ত্রিক বাবার কীর্তিকথা; ঊর্ধ্বে পৌষ-সংক্রান্তির হিম রাত আর পায়ের নিচে গোপালের মার ছেঁড়া কম্বলে বসে পান সুপুরী খেতে খেতে রাত কাটানো। এই করতে করতে জয়দেবের বহু প্রতীক্ষিত রাত কেটে ছিল আমাদের।

দ্বিতীয় দিনটা কাটল পূর্বপল্লীতে সুনীলবাবুর ঘরে সারা রাতের হিমে ভেজা শরীবে দিব্যি দিবানিদ্রা দিয়ে। শরীরটা সত্যিই ভাল নেই। সুনীলবাবুকে বললাম, 'আপনার কথাটাই মনে হচ্ছে। যদি নিমোনিয়া ধরে তো বাড়ি চলে যাওয়াই ভাল।'

সুনীলবাবু আটকাবার চেষ্টা করলেন।·· তার বাড়ির অন্যান্যরাও করলেন। কিন্তু মাথার মধ্যে তখনও ভূত দৌরাত্ম্য করে বেড়াচ্ছে; কে আটকাবে?

কেঁদুলি থেকে ফিরে কটা ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই এতদিনের এত চিন্তা কেমন করে যেন সব ওলট-পালট হয়ে গেল। মনে হল

'হারায়ে সেই মানুষে তার উদ্দেশ্যে দেশ বিদেশে যে ঘুরে বেড়ানো-তার সার্থকতা কোথায় ? কেঁদুলির বাউলটা বলল,

'হাতের কাছে হয় না খবর
কি দেখতে চাও দিল্লী লাহোর।'

বলল, 'নড়ে চড়ে হাতের কাছে
খুঁজলে জনম্ ভোর মেলেনা।'

বলে গেল, 'ঘরের পাশে আরশি-নগর
এক পড়শি বসত করে
(আমি) একদিন ও না দেখিলাম তারে।'

তবে ? সার্থকতা কিসের ? কোথায় খুঁজে পাব মনের মানুষকে ! তার বসত কি হাতের কাছে নয় ? তবে হ্যাঁ, থাকেও যদি সে ঘরের পাশে আরশি নগরে—তাকে খুঁজে পাওয়া যে বিষম দায়। তবে কি অন্তরে খোঁজ করতে হবে ! নিজের মধ্যে নিজে অদৃশ্য হয়ে যেতে হবে।

পরের দিন সকালের বর্ধমান-লোক্যালের একটা ফাঁকা বেঞ্চি দখল করে এবার আমি এসে নামলাম হুগলীর পাণ্ডুয়ায়। অনেকদিন রেল রাস্তায় এ পথে যেতে যেতে একটা বড় মিনারের মাথাটা চোখে পড়ত। আজ একবারে সোজাসুজি তার তলে এসে দাঁড়ালাম।

জয়দেব থেকে একবারে পীরের মেলা।

হ্যাঁ ! লোকে বলে পীর শাহসুফীর মেলা।

দেশের হিন্দু, মুসলমান, জৈন খৃষ্টানরাও একই কথা বলে, বলে—'বড় জাগ্রত গো পীরের মেলার পীর ঠাকুর। তোমার যা মনস্কামনা

আছে,—আধি-ব্যাধি আছে, ঠাকুরকে একবার জানাও,—সব ঠিক হয়ে যাবে।'…অন্ধ আলো পাবে, বলহীন পাবে বল, পঙ্গু লঙ্ঘন করবে গিরি। সারা বাংলা জুড়ে এত দেবতা দিবারাত্র দিব্যচক্ষু মেলে বসে আছেন, এক একবার মনে হয়, তাই বোধ হয় আমরা জাগ্রত এই সব প্রহরীর জন্যে নির্ভয়ে নির্বিঘ্নে নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাচ্ছি। আমাদের নিদ্রা আর ভাঙাতে দিচ্ছি না।

পাণ্ডুয়ায় পীরের দরগার কাছে সিমেন্টের লাল উঠানখানি পার হলেই একটি পরিষ্কার পুষ্করিণী। ২রা মাঘের দিনে ক্লান্ত হয়ে বসে পড়েছিলাম মেলা পরিভ্রমণ করে। ১২৭ ফুট উঁচু মিনারটিতে ওঠা, 'বাইশ দরজা' রাজবাড়ির টা-টা রোদে ঘুরতে ঘুরতে ঘণ্টা দুয়েক কেটে গেল ; তখন ঘাটে এসে বসেছি। আকুল প্রাণটা 'যদি গাহন করিতে চাও—এসো তবে ঝাপ দাও' করছে। এমন সময় এক বৃদ্ধার সঙ্গে চোখাচোখি। তিনিও যাত্রী। বাঙালী। বসে বসে স্নানের প্রস্তুতি করছেন তেল মাখতে মাখতে ; হঠাৎ আমাকে তার খুব চেনা মনে হল। চোখের ওপর হাত আড়াল করে রোদ বাঁচিয়ে আমাকে দেখে বললেন, 'তুমি কে বলতো বাবা ?'

বললাম।

কোন সঙ্কোচ না করেই বললেন, 'অঃ। আমি বলি আমাদের ছুলো। তা তুমি এখানে কেন বাবা ?'

এবার সঙ্কুচিত হলাম আমি। হয়ত না জেনে স্ত্রীলোকদের স্নানের ঘাটে এসে পড়েছি। অবশ্য আরও কতকগুলি পুরুষ তখনও সেখানে আছেন। উত্তর দেবার আগেই তিনি বললেন, 'তা বেশ করেছ। বস। পীরের ঠাঁই বড় জাগ্রত ঠাঁই বাবা।' বলে স্নানাহার আপাততঃ স্থগিত রেখে আমাকে আর পীরকে নিয়ে বসলেন।

তবে ঐ পর্যন্তই। সবই ইতিকথা। ইতিহাস এদের জানবার দরকার নেই। তার ধারও সাধারণ লোক ধারে না। অবশ্য ইতিহাস নির্ভুল অনুসরণ করলে পাণ্ডুয়া মেলায় না এসে যেতে হবে

ঐতিহাসিকদের গবেষণা গ্রন্থের গভীরে। সেখানে আমিও অনধিকারী। অতএব পীর সাহেবের ইতিকথা উপকথার অলৌকিকতায় রূপান্তরিত হয়ে যে লৌকিক সজ্জা পেয়েছে তার কথাই বলি।

রক্ত-মাংসের এক একটা পরিপূর্ণ মানুষকে আমাদের দেশের মানুষ মাত্র শ' খানেক বছরের মধ্যে দেবতা করে তোলে। আর শাহসুফী সাহেব তো পীর—আর কম করে ছ-সাতশ বছরের পুরাতন তো বটেই। ব্লকম্যান সাহেবের বক্তব্য সমর্থন করতে গেলে বলতে হয়, যদিও তিনি ভারত ইতিহাসে সফীউদ্দিন বা শাহসুফী নামক কোন রাজার সন্ধান পাননি কিংবা মুসলমান ফকির আউলিয়া বা কোন পীর পয়গম্বরের নাম শোনেননি, তবু পীরের ঐতিহাসিকতাকে অস্বীকার করা যাবে না। ষ্টেপল্টন সাহেবের ধারণা তৎকালীন দিল্লীর মুসলমান শাসকগোষ্ঠী গাজী সাহেব ফকির আউলিয়াদের বাংলা দেশে পাঠিয়ে হিন্দু সামন্ত রাজাদের অন্তর এবং অন্দরমহল অধিকার করতেন। সেই সুকৌশল রাষ্ট্রনীতিতে তাদের রাজ্য অধিকার করা সুবিধে হোত। এমন নাকি অনেক হয়েছে। যদুনাথ সরকার বলেছেন, ধর্ম ও নীতির দিক থেকে তাদের আন্তরিকতায় সন্দেহ করবার কোন কারণ নেই। সাধারণতঃ তাঁরা দলবল নিয়ে হিন্দু রাজাদের এলাকার মধ্যে প্রবেশ করে কোন না কোন অজুহাতে সত্যাগ্রহ করতেন। তারপর সত্যাগ্রহী মুসলমান সাধুদের উপর যে কোন অন্যায় আচরণের সুযোগ নিয়ে মুসলমান শাসকদের সেনাদল সেই রাজ্যে প্রবেশ করত বিধর্মীদের শায়েস্তা করবার জন্যে। পাণ্ডুয়া, ত্রিবেণী প্রভৃতি অঞ্চলের রোমাঞ্চকর কাহিনীর মধ্যে যদি কোন সত্যিকার ইতিহাস বলে কিছু থাকে তা হলে এই ধরনের কোন ইতিহাস থাকাই সম্ভবপর। কৌতূহলী পাঠক এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা বিনয় ঘোষের 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি'র মধ্যে পাবেন।

এই ইতিহাসের সঙ্গে পাণ্ডুয়াতে শাহসুফীর মিনার, মসজিদ,

দরগা প্রভৃতি নিয়ে যে লোক-কাহিনী প্রচলিত আছে, সেটা সেদিন সংগ্রহ করেছিলাম ওখানকার মেলার মোল্লাদের জমি যাঁকে বন্দোবস্ত দেওয়া আছে সেই স্বভাবলাজুক আলম সাহেবের কাছে। মেলার মধ্যেই তাঁর খড়ে-ছাওয়া আস্তানা। ভদ্রলোক একমুখ দাড়ি-গোঁফ, এক মাথা চুল্ নিয়ে অবসন্ন বিকেলের ঘরের অন্ধকার পট-ভূমিকায় বসে গল্প বলেছিলেন শাহসুফীর। বলেছিলেন, “আমি আর কতটুকু জানি বলেন, তবে শুনেছি···।”···অনেকদিন পূর্বে পাণ্ডু নামে এখানে এক রাজা ছিলেন। রাজা ছিলেন খুব ধার্মিক। তাঁর রাজ্যে জীববধ নিষিদ্ধ। একদা এক প্রজা ছেলের অন্নপ্রাশনের উৎসবে ছাগ বলি দিয়েছিলেন। তাইতেই ধার্মিক রাজাটি অপরাধী প্রজার শাস্তি হিসেবে তার সম্মুখেই তার শিশুপুত্রটিকে হত্যা করলেন। (ধার্মিক রাজাই বটে।) প্রজা রাগে মৃত পুত্রকে নিয়ে ছুটলেন দিল্লীর বাদশাহের কাছে প্রতিবিধান করবার জন্যে। বাদশা সৈন্য-সামন্ত নিয়ে বাংলায় পাঠালেন শাহসুফীকে। পাণ্ডু রাজার সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ হল। দুপক্ষের সৈন্যই মারা গেল যুদ্ধে। কিন্তু ভাবনায় পড়লেন শাহসুফী। তাঁর সৈন্য শেষ হয়ে এল ; কিন্তু পাণ্ডু রাজার সৈন্য শেষ হতে চায় না। তখন স্থানীয় এক গোয়ালা শাহসুফীকে গোপন কথাটি শোনালেন। কি ? না, মহানাদে যিনি রাজা তাঁর রাজ্যে আছে এক পুষ্করিণী। তাতে বাস করেন কোটি কোটি দেবতা। আর জলের এমনই গুণ,—সে জলধারা মৃত মানবের পুনর্জীবন দান করে। রাজা তাই নির্ভয়। যত সৈন্য মরছে যুদ্ধে, তারা আবার বেঁচে উঠছে। অতএব উপায় হল, মহারাজাদের ঐ ‘জীয়ৎ-কুণ্ডটির’ জলের গুণ নষ্ট করতে হবে সর্বাগ্রে। ব্যস। শাহসুফী গোয়ালাটিকেই পাঠালেন মহানাদে। তিনি সাধুর ছদ্মবেশে ধর্মপ্রবণ রাজাকে সন্তুষ্ট করে স্নানে চললেন ‘জীয়ৎকুণ্ডের’ জলে। তবু তীরে প্রহরায় থাকল রাজার সৈন্য-সামন্ত। সাধু ডুব দিলেন, অমনি কি আশ্চর্য, ‘জীয়ৎকুণ্ড’বাসী কোটি কোটি দেবতা পালালেন পুষ্করিণী ছেড়ে। সৈন্যরা হতবাক। সাধু জটার

মধ্যে গোমাংস নিয়ে পুষ্করিণীতে নেমেছেন। কিন্তু সাধু পালাবেন কি করে এত প্রহরীর মধ্য থেকে? অতএব পক্ষীর দেহ ধারণ করে আকাশে উড়লেন। কিন্তু কি হবে? তীরন্দাজ প্রহরী তীর বিদ্ধ করে হত্যা করল তাঁকে। দৈব পুষ্করিণীর গুণও নষ্ট হল দেবতাদের পলায়নের পর। পাণ্ডু রাজার সৈন্যরাও মৃত্যু এড়াতে পারল না। অতএব হিন্দু রাজার পরাজয় এবং মুসলমান কর্তৃত্বের সূচনা।

যাই হোক, শাহসুফী বিজয়স্তম্ভ হিসেবে তৈরী করলেন মিনার, তৈরী হল মসজিদ। শেষে তিনি ফকির হয়ে গেলেন। রাজ্য ভোগ আর করলেন না।

এই হল কিম্বদন্তী। এতে ছেলে ভুলানো গল্প থাকতে পারে। নানান অশিক্ষিত লোকের মনগড়া কাহিনীর রং-এর পোঁচ পড়তে পারে। কিন্তু অতি সূক্ষ্মভাবেও কিছু ইতিহাস যে এতে যুক্ত হয়ে আছে, তা স্বীকার করতেই হবে। ইতিহাসই বলবে, এই সেই মুসলমান আধিপত্যের শতাব্দী; এখনও পাণ্ডুয়ার মিনারের কাছে চোখে পড়বে সেই তদানীন্তন সামন্ত রাজার অট্টালিকার 'বাইশ দরওয়াজার' ভগ্নাংশ, তার সিংহাসন ইত্যাদি। ইতিহাসের অনেক যুদ্ধ-বিগ্রহ গেছে এই সব অঞ্চলের উপর দিয়ে। যুদ্ধ যা আনে সেই ভাঙ্গন—পাঠান-মোগলের তরবারীর আঘাতে যুগের পর যুগ ধরে অনেক কীর্তিকে মিশিয়ে দিয়েছে মাটিতে। কালস্রোতে হয়ত হারিয়েও গেছে অনেক প্রাচীন চিহ্ন; মুছে গেছে জনপদ; নতুন এসে স্থান অধিকার করেছে পুরাতনের। আজও তবু পুরাতন দলিল হিসেবে যতটুকু স্থাপত্য কীর্তি বিজয়গর্বে দাঁড়িয়ে আছে পাণ্ডুয়ায় সেটুকুই মনে করিয়ে দিচ্ছে হারিয়ে যাওয়া কীর্তিকাহিনী—এক যে ছিল রাজা দিয়ে যে কাহিনীর শুরু। দরগার চাতালে পড়ে আছে হিন্দুর ভগ্ন বিষ্ণু মূর্তির উল্টোদিকে আরবী হরফে লেখা শিলালিপি।

পাণ্ডুয়ার পীরের মেলা হয়ত কারও তীর্থক্ষেত্র নয়। কিন্তু এক মাসব্যাপী তীর্থযাত্রীর বিরাম নেই ১লা মাঘ থেকে। ত্রিবেণীতে

মকরের মেলা শেষ হয় সংক্রান্তিতে, তার পরের দিন এখানে শুরু হয় শাহসুফীর নামাঙ্কিত মেলা। ফকির শাহসুফীর জীবনে পার্থিব সম্পদ হয়ত কোন দিন ছিল না,—আজও কিছু নেই। আছে কেবল লক্ষ লক্ষ তীর্থযাত্রীর অহৈতুকী শ্রদ্ধা; তাই নিয়ে ধন্য হয়ে আছেন পীর শাহসুফী।

মেলা—মেলা আর মেলা। বার মাসে তের পার্বণের বাংলাদেশে আবার মেলা বসবে দিকে দিকে। মাঘ শেষে আসবে রং-মাতাল ফাল্গুন। সেই ফাল্গুনের রং আনবে বাংলার অগণিত আদিবাসী সম্প্রদায়। বর্ধমানের সাঁওতালদের এ মেলায় দেখে তাই মনে হল। ওরা না কি সুদূর পুরুলিয়া থেকেও এসেছে আজ দলে দলে। সঙ্গে এনেছে কাঁধে ঝোলানো সারেঙের সুর, গলায় দোলানো সিঙ্গল রীডের হারমোনিয়ম; আছে মাদল আর মোটা বাঁশের বাঁশি। ওদের মাতাল কণ্ঠস্বরে স্খলিত 'লাগড়ে' আর 'দং' ধ্বনিত হচ্ছে। ওরা মদ খেয়েছে। যার যা সঞ্চিত আছে তা দিয়ে জামা কাপড় কিনেছে; কিনেছে মাঝিনের কানের দুল, খোঁপার রূপোর ফুল, আর পায়ের মল। এ মেলা শেষ করে ওরা যাবে ঘরে ফিরে, ফাল্গুনের শুক্লা দ্বাদশীতে আয়োজনে লাগবে 'বাহা' পরবের।

একটু দূরে খাবারের দোকানটার কাছে দুটো কুকুর ঘেউ ঘেউ করছে। আর যেন কোথাও কোন শব্দ নেই।

শীতের অবসন্ন সন্ধ্যা এসে বসেছে স্টেশনের চার চত্বরে।

দূরে শেডের তলে একটা ম্লান আলো জ্বলছে। তার তলে বসে অনেকগুলো সাঁওতাল মেয়ে গান করছে—

"সং ভাইকে সঙ্গে লিব
কোলের ভাইকে কোলে লিব
চল ভাই-রে কুলি বেড়াইতে।"

একটা কংক্রীটের বেঞ্চির ওপর ব্যাগটা মাথায় দিয়ে শুয়ে শুয়ে শুনছি। প্লাটফরমের ওদিকে একটা 'আপ' ট্রেন এসে গেল। অনেক লোক উঠল; নামল অনেকে। কিন্তু একবারও তো মনে হচ্ছে না কলকাতা যাবার ট্রেন কখন আসবে। মনে হচ্ছে, কোনদিকে কোন তাড়া থাকা আজ যেন স্বাভাবিক নয় আমার।

দেখতে দেখতে কোথা দিয়ে একটা বছর পার করে দিলাম আমি। একদিন সাতসকালে মনুমেন্টের ধারে জিউলী গাছটার শুকনো ডালে দার্শনিক কাকটাকে দেখে যাত্রা শুরু করেছিলাম। কোথায় গেল সেদিনকার রাজ নগরের বাঁড়ুয্যেমশাই? কোথায় আছে অন্নপূর্ণা [illegible]স-মিলের গদাধর নন্দী? মন থেকে মুছে গেছে? হারিয়ে গেছে?

মনে করতে বসলে মনে পড়ে যায়,—'কারও সম্বন্ধে অত করে ভাবিস নি। নিজের কথা ভাব।'

চলচ্চিত্রের যেন এক একখানা ছবি। একটার পর একটা চোখের সামনে সাজানো। ফুটে উঠছে সান্ত্বনা আর সুপ্রভাত সিংহরায়ের মুখদুটো। দুঃখ আর কৌতুক যেন পাশাপাশি। সিংহরায় বলেছিল, 'আসবেন। বাসে বসেই বলবেন রাজবাড়ি যাব। ব্যস্!' গর্বে ছেলেটার সারা শরীর কেমন নির্বাক হাসির গমকে গমকে কেঁপে উঠেছিল। কপালে ত্রিপুণ্ড্রক, গলায় হাতে রুদ্রাক্ষের মালা; বলেছিল, 'অশান্তি হ'তে দিব নি!' এখন মনে মনে হাসি। শান্তি সেদিন কত পেয়েছিলাম মনে আছে। কিন্তু কোথায়, কোথায় তারা হারিয়ে গেল আজ!

আছে। মন বলে কোথাও হারায় নি। হারায় নি জয়রামবাটির ই—'মা আছেন আর আমরা আছি'—মেঘনাদ দা! আবার চৈত্র-সংক্রান্তি এসে গেল; আবার কুড়মুনের ডাঃ চক্রবর্তীর বাড়ি রাত বারোটায় আমার মতন কোন অনাহারী অতর্কিতে রাতের আহার পাবে। সন্ন্যাসী এতদিন কত লোককেই হয়ত ওই প্রশ্ন শুধিয়ে

বেড়াচ্ছে—'আচ্ছা, বৃটিশ কবে আসবে?' আমতার মেলায় সেই প্রৌঢ়া মহিলাটির কণ্ঠস্বর আজও শুনছি, 'তা' তোমাদের আপিসে পাত্তর টাত্তর নেই বাবা? বরাভরণ, দানসামিগ্রী মিলিয়ে হাজার পনের দেবো।'

সব একদিন শুনে গেছি, দেখে গেছি নির্বাক নিঃসংশয় হয়ে ঘুরতে ঘুরতে। কিন্তু নিজের কাছে বার বার একই প্রশ্ন করেছি, 'আমি কোথায় পাব তারে!' কি জানি কে আমার মাথায় ঢুকিয়ে দিল এ কথা;—'তার বসত কোথায় না জেনে তায় গগন কেঁদে মরে—।'

আমি কি জানতাম, তাকে পাওয়া যাবে না—তাকে পাওয়া যায় না। কেঁদুলির কনকনে ঠাণ্ডা রাতে গোপাল দাস আমার কান দুটা ধরে, মাথার মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে গেল কথাটা; 'ঘরের পাশে আ[illegible] নগর—এক পড়শি বসত করে।' তাকে বাইরে খুঁজলে পা[illegible] কোথা? শুনে সারা শরীরে একটা বিদ্যুত তরঙ্গ বয়ে গেল। আমি এতই মূঢ়—এতই বোকা!

অতএব তার পরেই যেন আমার সব উৎসাহ কোথায় যেন হারিয়ে গেল। একটা অযাচিত সান্ত্বনার শীতল-পাটি সারা মন জুড়ে কে যেন বিছিয়ে দিয়ে গেল। আমি এতদিনের প্রশ্নের উত্তর প্রাণভরে পেয়ে গেলাম। মন আজ শান্ত হয়েছে। থেমে[illegible]! বলছে, 'পেয়েছি! আমার মনের মানুষটিকে পেয়েছি আমি। অনেক পরিক্রমার শেষে, অনেক সন্ধানের অন্তে, আমি খুঁজে পেয়েছি তাকে। সে পথে-বিপথে নেই—নেই নদ-নদী-মাঠ-বনে; আছে অন্তরের এক অদৃশ্য আরশি নগরে!—আমি তারেই খুঁজে বেড়াই যে রয় মনে—আমার মনে।'



